আলোচনা-প্রসঙ্গে

(পঞ্চম খণ্ড)

সঙ্কলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম-এ

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর, বিহার

প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা শ্রাবণ, ১৩৫৬

মুদ্রক ঃ
কৌশিক পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলিকাতা ৭০০ ০১২

নিবেদন

১৯৪৩ সালের ৯ই জানুয়ারী থেকে ১৯৪৪ সালের ২৯শে নভেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের যে-সব কথোপকথন লিপিবদ্ধ ছিল, সেগুলি পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। এই দু'টি বৎসর আশ্রমের উপর দিয়ে পারিবেশিক প্রতিকূলতার ঝড় ব'য়ে গেছে এবং তারই ফলস্বরূপ আশ্রমের দু'জনকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। এই সময়ে ঘটেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। আশ্রমের উপর তার দুরূহ চাপ এসে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম আদরের কন্যা সাধনা দেবী এবং আবাল্য লীলাসহচর কিশোরীমোহন দাস এই সময়ের মধ্যে পরলোক-গমন করেন। উপর্য্যুপরি এই ভাবের নানা বিপর্য্যয়ের ভিতর-দিয়ে দিনগুলি কেটেছে। এই ক্রূর, কুটিল, বেদনাময় সংঘাতের পটভূমিকায় দেখেছি তাঁর অভ্রভেদী শুভসুন্দর ব্যক্তিত্বের স্বরূপ – যা' নিয়ত করুণায় স্নিগ্ধ, মমতায় সজল, ব্যথায় টলমল, অথচ সমস্ত অমঙ্গলের মাঙ্গলিক নিয়ন্ত্রণে অমোঘ, দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বার। বিশ্বময় একাত্মতাবোধের মানুষী মূর্ত্তি কী, তা' আমরা প্রত্যক্ষ করেছি; প্রত্যক্ষ করেছি, আস্বাদন করেছি অখণ্ড-দিব্য প্রেম-বিগ্রহের অপরিমেয় সদা-সক্রিয় স্নেহ, প্রীতি, দয়া, মায়া, শাসন, তোষণ, ভৎর্সনা, ধারণ-পালনী সম্পোষণা—যা' মানুষের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত ক'রে তাকে মহৎ সাধনায় ব্রতী ক'রে তোলে—উর্জ্জনার অনির্ব্বাণ সম্বেগে। এইভাবে তিনি তাঁর সমগ্র জীবন-দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তিল-তিল ক'রে ভ'রে দিচ্ছেন প্রতিটি সত্তাকে—সুখে, সুধায়, মাধুর্য্যে, বলিষ্ঠ প্রেরণার অমর বীর্য্যে। ব্যষ্টি ও সমষ্টি আদর্শনিষ্ঠ চলনে, ধর্ম্ম, সাত্বত কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্যের অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্তি-অভিভূতির কলুষমুক্ত হ'য়ে জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে দক্ষ, দিগ্বিজয়ী ও দ্যুতিমান্ হ'য়ে উঠুক; সংহত, শক্তিমান্ ও উৎকর্ষ-সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠুক—পারস্পরিক সেবা-সম্প্রীতি নিয়ে,—এই তাঁর অন্তরের কামনা। এজন্য তাঁর প্রচেষ্টা ও উদ্বেগের অন্ত নাই। আলাপ-আলোচনাগুলি তারই অবিচ্ছিন্ন অঙ্গবিশেষ। সেগুলি সাধ্যমত ধ'রে রেখেছি বটে, কিন্তু তাঁ'র উদগ্র ব্যাকুলতা ও আন্তরিকতার অনুরণন পাঠকের প্রাণে পেঁ'ছে দেওয়া যায় কেমন ক'রে, তা' ভেবে পাই না, সে-সাধ্যও আমার নাই। শুধু পরম-পিতার চরণে প্রার্থনা করি—আমার অক্ষমতার দরুন মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়। যা'হোক, এ লেখাগুলিও শ্রীশ্রীঠাকুরকে শুনিয়ে তাঁর নির্দ্দেশমত সংশোধন ক'রে নিয়েছি—তাতে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করি।

বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন বলেন—গ্রন্থমধ্যে যে-সব ব্যক্তির নাম থাকে, তাঁদের নামের সঙ্গে পদবীটা দিলে ভাল হয়। তারপর থেকে পদবীগুলি প্রায় জায়গায়ই দিয়েছি। এই পদবীগুলি দিতে গিয়ে কিছু-কিছু ভুলভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, এক নাম, ভিন্ন পদবী—এমনতর অনেকে আছেন। তাই স্মৃতি থেকে পদবী সংযোগ করতে গিয়ে কোন-কোন ক্ষেত্রে ভুল হ'য়ে থাকতে পাবে। তা'ছাড়া প্রত্যেক বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র কতিপয়ের নাম উল্লিখিত আছে, অনেকের নাম বাদ পড়েছে। এই সব অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

এই পুস্তক প্রকাশের সময় সৎসঙ্গ প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে তো বিশেষ শ্রম স্বীকার করেছেনই, তা'ছাড়া শ্রীপঞ্চানন সরকার, শ্রীশরৎচন্দ্র হালদার ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রয়োজনমত সাহায্য করেছেন। এঁরা সকলেই আমার ধন্যবাদার্হ।—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

যতি-আশ্রম
সৎসঙ্গ (দেওঘর)
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

২৪শে পৌষ, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ৯।১।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পূজনীয় খেপুদার বারান্দায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন দক্ষিণাস্য হ'য়ে। রাজেনদা (মজুমদার), প্রকাশদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখার্জ্জী), দেবী (চক্রবর্ত্তী), জয়ন্তদা (বিশ্বাস), বৃন্দাবনদা (বসাক), ভোলানাথদা (সরকার), গোপেনদা (রায়), গুরুদাসভাই (ব্যানার্জ্জী), অমর ভাই (ঘোষ), সতীশদা (দাস), নগেনদা (বসু), উমাদা (বাগচী), জিতেনদা (রায়), যতীনদা (দাস), তারকদা (ব্যানার্জ্জী), বিজয়দার মা, সুরমা-মা, অমূল্যদার মা, মানদামা, সুকুমারীমা, তপোবনের শৈলমা, গৌরীমা, চারুমা, দুলালীমা প্রমুখ অনেকেই আছেন সেখানে।

নূতন জায়গায় যেয়ে কেমন ক'রে কাজে অগ্রসর হ'তে হয়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রত্যেক জায়গায়ই ২।৪ জন পরোপকারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি থাকেনই। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির আতিথ্য যদি গ্রহণ করা যায় এবং তাদের interested (অন্তরাসী) ক'রে তুলে, তাদের মাধ্যমে যদি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে introduced (পরিচিত) হওয়া যায়, তাহ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। কারণ, যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে, তার কথার উপর অনেকখানি গুরুত্ব দেয়। আর, নিজেদের আচার, আচরণ, চালচলন, কথাবার্ত্তা—এক-কথায়, সমগ্র ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধোদ্দীপী হওয়া চাই, যেন তোমাদের দেখে মানুষ একটা মধুর ও মনোহর আকর্ষণ বোধ করে। জনচিত্তে যতখানি শ্রদ্ধা create (সৃষ্টি) ও maintain (রক্ষা) করতে পারবে, ততই তোমাদের কাজের soil (ভূমি) steady (অনড়) হবে। কথাবার্ত্তা ব'লে শুধু সাময়িক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করলে চলবে না, সেটাকে বজায় রাখা চাই। বলা-মাফিক আচার-আচরণ যদি চরিত্রগত না হয়, তাহ'লে কিন্তু কারও প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বেশি দিন বজায় থাকে না। সেদিক্ দিয়ে খুব সাবধান হ'তে হয়। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তার ব্যাপারে পরিমাপ চাই। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তখন আর তার আগ্রহ থাকে না। মানুষ যত Ideal-এ (আদর্শে) actively enchanted (সক্রিয়ভাবে মুগ্ধ) থাকে, with all alert inquisitiveness to serve the environment

(পরিবেশকে সেবা করবার চকিত সন্ধিৎসা নিয়ে), তার চলন হয় তত balanced ও resourceful (সাম্যসঙ্গত ও উদ্ভাবনমুখর)। তার আলাপ-আলোচনা, সেবাচর্য্যা, লোক-ব্যবহার পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজন-অনুযায়ী নিত্যনূতন ভঙ্গীতে আত্ম-প্রকাশ ক'রে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার অভিসারে অগ্রসর হয়। আর, লোকে তা' যত দেখে, ততই মুগ্ধ হ'য়ে যায়। ভাবে—এর ভিতরের ঐশ্বর্য্য তো অফুরন্ত, অথচ এত নিরহঙ্কার ও নিরভিমান। এই দেখে সত্তাসম্বর্দ্ধনার রসদ্ পাবার আশায় মানুষ ভেড়ে তার কাছে। সত্তাসম্বর্দ্ধনার রসদদার যদি হ'তে পার, গাছতলায় ব'সে থাকলেও লোকে এসে ছেঁকে ধরবে তোমাদের। প্রকৃত যদি হও, প্রকৃতিই তোমাদের জয়গান করবে। ভাবনার কিছু নেই। Knock and it will open (টোকা দাও, খুলে যাবে)। যীশুখ্রীষ্ট কয়েকজন জেলে-মালো নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন; কেষ্টঠাকুরের প্রথম সঙ্গীসাথী ছিল সব রাখাল-বালক। ভক্তি, বিশ্বাস ও চরিত্রের সম্পদ্ থাকলে সাধারণরাই অসাধারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যাজনকাজের জন্য যেমন ভাল-ভাল কর্ম্মীর প্রয়োজন, এখানে ব'সে কাজ করার জন্য আবার কতকগুলি ভাল লোক দরকার। বিশ্ববিজ্ঞানে যন্ত্রপাতিতে মরচে ধ'রে যাচ্ছে, লোক-অভাবে কাজ হ'চ্ছে না। কেষ্টদা তো অবসরই পায় না। গোপালের ঝোঁক ছিল, গোপাল তো চ'লে গেল! এখন ভাল এম-বি, ভাল physicist (পদার্থবিৎ), ভাল physical chemist (পদার্থবিদ্যাগত রসায়নশাস্ত্রবিৎ) ইত্যাদি পেলে আমার মাথায় যেগুলি খেলে সেগুলি তাদের বলতে পারি এবং তারা সেই-অনুযায়ী research (গবেষণা) ক'রে দেখতে পাবে। বিজ্ঞানের প্রয়োগে রোগ, অভাব, অভিযোগ, দারিদ্র্য ইত্যাদির বহুল প্রতিকার হ'তে পারে। আমরা যদি নিজেদের চেষ্টায় এগুলি করি, মানুষ বুকে বল পাবে।

ভোলানাথদা—সৎসঙ্গ যে বাইরের কোন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয়, নিজেদের চেষ্টায় যা-কিছু করছে, এতে লোকে খুব ভাল বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকে ভাল বলুক না বলুক সেটা বড় কথা নয়। Out of nothing (শূন্যের ওপর দাঁড়িয়ে) নিজেদের কঠোর শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে সুষ্ঠু জীবন-চলনার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন, তা' যদি আপনারা গ'ড়ে তুলতে পারেন, তবে তার ভিতর-দিয়ে আপনাদের যে experience (অভিজ্ঞতা) ও self-confidence (আত্মবিশ্বাস) হবে, তাব একটা বিশেষ মূল্য আছে। আপনারা তখন অনেককে অনুপ্রাণিত ক'রে অনেক কিছু গজিয়ে তুলতে পারবেন। খারাপটা যেমন চারায়, ভালটাও তেমনি চারায়।…হ্যাঁ! আর, কাজকর্ম্মের জন্য একটা well-

equipped reference library (ভাল গ্রন্থাগার) দরকার। কেষ্টদার ওখানে যা' আছে সে কম নয়, কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে up-to-date (অধুনাতন) বইগুলি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ঐ লাইব্রেরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন একজন থাকা দরকার, যার নখদর্পণে থাকবে কোথায় কোন্ বই আছে এবং কোন্ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জন্য কোন্ বই ঘাঁটতে হবে। ভাল librarian (গ্রন্থাগারিক) না থাকলে এক জায়গায় একগাদা বই থেকেও কোন লাভ হয় না। আর, বইয়ের রক্ষণাবেক্ষণও কম দায়িত্বপূর্ণ কাজ নয়। এ পর্য্যন্ত বই তো কম আনাইনি, কিন্তু কত বই নষ্ট হ'য়ে গেছে। লাইব্রেরী থেকে নৌকো ভ'রে বই চালান হ'য়ে গেছে। আমাদের নজরও তীক্ষ্ণ না—কোথা দিয়ে যে কী ক্ষতি হ'য়ে যায়, সে-দিকে খেয়াল থাকে না। আসল কথা -interest (অন্তরাস)-ই কম, তাই পদে-পদে লোকসানের ভাগী হই।

যতীনদা—সবার সব দিকে নজর থাকবে এটা আশা করা যায় না। কিন্তু প্রত্যেকের duty (কর্ত্তব্য) ও responsibility (দায়িত্ব) যদি সুনির্দ্দিষ্টভাবে ভাগ ক'রে দেওয়া থাকে, এবং সেই কাজ বুঝে নেওয়ার লোক যদি থাকে, তাহ'লেই কাজগুলি সুশৃঙ্খলভাবে হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার দেখতে ইচ্ছে করে, out of love (ভালবাসা থেকে) auto-initiative responsibility-তে (স্বতঃস্বেচ্ছা দায়িত্ববোধে) কে কতখানি করে। অতখানি interest (অন্তরাস) যাদের আছে, তারাই হ'ল pivot (কীলক), তারাই আবার বিলি-ব্যবস্থা ক'রে সব ঠিক ক'রে নেয়। যার যেদিকে instinctive interest (সংস্কারগত অনুরাগ) আছে, সে সেদিকে না গিয়েই পারে না। তার স্বভাবই তাকে ঠেলে ঐ দিকে। গরুকে মারেন, ধরেন, সে ধানের ক্ষেত দেখলে তাতে মুখ দেবেই। বাতিকওয়ালা লোকগুলিও অমনি, তারা কাজ করে নেশায়। কে তাদের ডাকবে বা ব'লে দেবে, সে-অপেক্ষা রাখে না। রুচি ও পছন্দমত কাজের জন্য ছুঁক-ছুঁক ক'রে বেড়ায়। সেই কাজ করার সুযোগ পেলেই মহাকৃতজ্ঞ। পয়সা পাবে বা কেউ তারিফ করবে, তার ধার ধারে না। এমনকি, নিন্দা, অপযশ, দারিদ্র্য ও নানা প্রতিবন্ধকও তাকে রুখতে পারে না। নিজের গরজেই তার করা চাই ঐ কাজ। তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতিই তাকে ঘাড় ধ'রে প্রবর্ত্তিত করে তার প্রকৃতিসঙ্গত কাজে। অমনতর আগ্রহ যাদের থাকে, তারা আবার সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে নেয়। তারাপদ যে থিয়েটার করত, মণি যে থিয়েটার করে, এদের কেউ কোনদিন কি সভাসমিতি ক'রে ভার দিয়েছিল ? ক'রে ভাল লাগে, সেই তৃপ্তির জন্য করে ; না করলে অস্বস্তি লাগে, সেই অস্বস্তি এড়াবার জন্য করে। তবে, তেমনতর যদি না জোটে, তাহ'লে কাজ-চালাবার

মত একটা ব্যবস্থা ক'রে নিতে হয় বৈ কি ? মানুষের কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে হয়, আদায় ক'রে নিতে হয়—একথা ঠিকই। কিন্তু সেই কাজ যারা বুঝে নেবে, তাদের এমনতর হওয়া চাই যে তারা conscientiously (বিবেকিতার সহিত) to their maximum capacity (তাদের সাধ্যে যতদূর কুলায়) exert (চেষ্টা) না ক'রেই পারে না, তা' কেউ খবরদারি করুক বা নাই করুক, পুরস্কার বা তিরস্কার যা-'ই তাদের ভাগ্যে জুটুক। কেউ যদি আপনাকে ভালবাসে, যাতে-যাতে আপনার ভাল হয়, তার সাধ্যমত তা' করতে চেষ্টা করবেই ; কেউ তাকে নিয়োগ করবে, খবরদারি করবে তবে করবে, না হ'লে করবে না—এমনতর হয় না। আপনার ভাল করলে লোকে ভাল বলবে তাই করবে, আর লোকে নিন্দা করলে আপনার ভাল করা ছেড়ে দেবে তাও কিন্তু নয়।

যতীনদা—যেখানে বহুলোকে একজনকে ভালবাসে এবং প্রত্যেকেই তাঁর জন্য করতে ব্যস্ত, সেখানে কোথায় কী করতে গিয়ে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, সে সম্বন্ধে মানুষ একটু ইতস্ততঃ না ক'রে পারে না। ভাবে, ভাল করতে গিয়ে মন্দ না ক'রে বসি, আর লোকের সমালোচনার ভয় করতে মানুষ বাধ্য—যতদিন সে সমাজে বাস করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হাজার জনই আমাকে ভালবাসুক না কেন, আপনি যদি আমাকে ভালবাসেন, তাহ'লে আমার জন্য আপনার করণীয়টা তো লোপ পেয়ে গেল না। নিজের দায়িত্বজ্ঞানে আপনি আপনার বুদ্ধিমত খোঁজ তো নেবেন আমার সুবিধা-অসুবিধা কী আছে না আছে ! যে-সব দিক্ মানুষ দেখছে, সে-সম্বন্ধে তো কথাই নেই, যেদিকে অসুবিধা হ'চ্ছে, সে-দিক্ আপনি সামাল দিতে চেষ্টা করবেন—যদি আপনার সাধ্যে কুলায়। যদি না পারেন, যেমনতর লোক দিয়ে তা' হ'তে পারে, তেমনতর লোক জোগাড় করতে চেষ্টা করবেন। আদত কথা, যে ব্যবস্থা করলে সমস্যার সমাধান হয়, তা' আপনি করবেন। অনেকে আছে ব'লে যদি ব'সে থাকেন, তাহ'লে তো 'ভাগীর মা গঙ্গা পায় না'—এমনতর দশা হবে আমার। সে তো এক মস্ত ফ্যাসাদ। গল্প শুনেছিলাম—এক রাজা এক পুকুর কেটে প্রজাবৃন্দের মধ্যে খবর দিলেন, প্রত্যেকে এক ঘটি ক'রে দুধ যেন পুকুরে ঢেলে দিয়ে যায়। রাজা তো নিশ্চিন্ত। এক ঘটি ক'রে দুধ দিতে তো কারও কোন কষ্ট হবে না, অথচ সহজেই একটা দুধের পুকুর হ'য়ে যাবে। একটা অভিনব ব্যাপার হবে। কত দেশদেশান্তর থেকে লোকে দুধের পুকুর দেখতে আসবে। কল্পনা ক'রে রাজার মনে ভারী স্ফূর্ত্তি ! এদিকে প্রজাদের মধ্যে সবাই জনে-জনে ভাবল, সবাই তো দুধ নিয়ে যাবে, আমি যদি রাতের অন্ধকারে তার

মধ্যে এক ঘটি জল ঢেলে রেখে আসি, কে আর ঠিক পাবে? যেমন ভাবা, তেমনি করা। রাজা তো মহা আনন্দে আছেন, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতায় তাঁর রাজ্যে দুধ-সরোবরের সৃষ্টি হচ্ছে। শেষটা সবেজমিনে যেয়ে দেখেন, সেই পুষ্করিণীতে দুধ নেই এক ফোঁটাও, কেবল জল আর জল। মনের ক্ষোভে ফিরে এলেন রাজা। আপনারাও যদি তেমনি দশজনের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত দায়িত্ব এড়িয়ে যান, আমার ইচ্ছা ও পরিকল্পনাগুলির দশাও হবে অমনতর। তবে কেউ যদি আমার জন্য কিছু করছে দেখেন, এবং সে-করা যদি ত্রুটিপূর্ণও হয়, তবু তার সমালোচনা না-ক'রে তার সাহায্য যতখানি করতে পারেন তাই করতে চেষ্টা করবেন। বিরূপ সমালোচনা করা মানেই কতকগুলি লোককে বিরূপ ক'রে রাখা। আপনি কোন কাজ করতে গেলেও তারা তখন কেবল বিরুদ্ধতাই করতে থাকবে। সহৃদয়তার সঙ্গে সাহায্য আর করবে না। পরস্পরের মধ্যে এই-ই যদি চলে, তাহ'লে কেউই কি দাঁড়াতে পারে? 'ঘুঁটে পুড়বে, গোবর হাসবে', তার মানে, ঘুঁটেকে উপহাস ক'রে গোবর নিজেকেই হাস্যাস্পদ করবার ব্যবস্থা ক'রে রাখবে। আর, এ চলবে endlessly (অন্তহীনভাবে)। …মানুষের কাজে ত্রুটি-বিচ্যুতি ইচ্ছাকৃতও হয়, অনিচ্ছাকৃতও হয়। কে কী করছে না, সে-জন্য তাকে অনুযোগ না ক'রে যতটুকু করছে তার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে, তার সঙ্গে হৃদ্যতা ও সহযোগিতা ক'রে তার করাটা যাতে সুসম্পূর্ণ হয়, সেই চেষ্টা করা ভাল; সংশোধনও যদি করতে হয় তাও অন্তরঙ্গ হ'য়ে, বন্ধু হ'য়ে, তাকে যথাসম্ভব উৎক্ষিপ্ত না ক'রে। আর, এই সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রেও কাজের credit (সুনাম) কখনও নিজে নিতে নেই। Credit (সুনাম) দিতে হয় অন্যকে। আর, পরনিন্দা একেবারে জন্মের মত বিদায় দিতে হয়। কেউ যদি আপনার নিন্দাও করে, তাও তার প্রশংসা করবেন। ধৈর্য্য-সহকারে এমনতর যদি করতে পারেন, দেখবেন—প্রকৃতিই আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে দেবে সমাজে। মিথ্যা সমালোচনা আপনার কিছু করতে পারবে না। তবে, আপনার ভিতর সত্যিকার নিন্দনীয় যদি কিছু থাকে, আর লোকে যদি রূঢ়ভাবেও তার সমালোচনা করে, তাহ'লেও চটবেন না বা নিজের ভুল সমর্থন করতে চেষ্টা করবেন না। অকপটে নিজের ভুলত্রুটি স্বীকার করবেন এবং নিজেকে সংশোধন করতে চেষ্টা করবেন। যারা আপনার ভুল ধরিয়ে দেয়, তাদের ধন্যবাদ দেবেন। তারা দ্বেষবশতঃ আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাইলেও আপনি মুক্তকণ্ঠে বলবেন—আপনারা আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করলেন, ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেওয়াই তো বন্ধুর কাজ। আর, unprofitably (বিনা লাভে) কখনও রাগ করতে যাবেন না। তবে রাগ করবেন না কেন? বল্‌গা হাতে রেখে খুব করবেন, তবে দেখবেন, সেটা যেন আপনার ইষ্টের interest

(স্বার্থ)-কে enhance করে (এগিয়ে দেয়)। এই সামান্য তুকতাক ঠিক ক'রে চলতে পারলে দেখবেন, পরিবেশ যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আপনার ক্ষতি কিছু করতে পারবে না, বরং এই প্রতিকূলতা পাড়ি দিয়ে চলতে গিয়ে আপনি কতখানি বেড়ে উঠবেন।

যতীনদা—যাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করি, তাদের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেলে মনটা খিঁচড়ে যায়, তখন মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যেমনতর ব্যবহার আশা করেন মানুষের কাছ থেকে, আপনার কাছ থেকে প্রত্যেকে যেন তেমনতর ব্যবহার পায়। এ বিষয়ে কিছুতেই যেন ভুল না হয়। আর, অন্যের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পাবার জন্য সর্ব্বদাই নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন। শুধু দুর্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকা নয়, দুর্ব্যবহার পাওয়া সত্ত্বেও মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর হ'তে হবে। দুর্ব্যবহারের প্রত্যুত্তরে দুর্ব্যবহার করতে গেলে অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যাবে। তবে, সবার কাছ থেকে দুর্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত থাকার মানে এ নয় যে, সবাইকেই খারাপ ব'লে ধ'রে নেবেন। আপনার যেমন মেজাজ বিগড়ে যায়, অন্যেরও চাপের মধ্যে প'ড়ে মেজাজ যে-কোন সময় বেগড়াতে পারে—এটা ধ'রেই নিতে হবে। তাই ব'লে লোকটা যে খারাপ—তা' কিন্তু নয়। মানুষের কাছ থেকে খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকবেন ব'লে তার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন না কিন্তু। তাহ'লে কিন্তু নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দোষগুণ মিশিয়ে গোটা মানুষটাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করলে দেখবেন, বেশীর ভাগ মানুষই মোটের উপর ভাল। প্রকৃত খারাপ তারা, নানা সদ্‌গুণ সত্ত্বেও যারা ধর্ম্ম, ইষ্ট ও সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বিরোধী। আচরণে সবাই সব-কিছু একদিনে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, সাধারণ মানুষের ভুলত্রুটি থাকেই, কিন্তু যথাস্থানে নতি ও স্বীকৃতি না থাকলে সেইটেই সন্দেহযোগ্য।

যতীনদা—ঠাকুর! মানুষ খারাপ ব্যবহার করা সত্ত্বেও আপনি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে বলছেন, কিন্তু ওতে যে মানুষ পেয়ে বসে, তখন তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে ডাইনে-বাঁয় চায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ব্যবহার করতে হবে ব'লে যে প্রয়োজনমত সংযত, সংহত, ভদ্র অথচ সুদৃঢ় প্রতিবাদ করা যাবে না, তা' তো নয়। সেখানে বেশী কথার মধ্যে যেতে নেই, ব্যক্তিত্ব ও মর্য্যাদা-সমন্বিত মিতভাষণ অমিত ও অমোঘ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনে। সামাজিক জীবনে নিজের personality (ব্যক্তিত্ব)-ই হ'চ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় defence force (আত্মরক্ষণী শক্তি)। একজন রাগী হ'লে

তাকে মানুষ ভয়ে এড়িয়ে চলে, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে না; কিন্তু কেউ যদি মিষ্ট-স্বভাব অথচ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়, তাহ'লে তাকে লোকে শ্রদ্ধা, সমীহ দুই-ই করে। তবে একটা কথা স্মরণ রাখবেন। আপনার উপর কেউ যদি অবিচার করে, তা' বরং সহ্য করতে পারেন, কিন্তু অন্যের উপর আপনার সামনে যখন কেউ অন্যায় অবিচার করে, তখন কিন্তু ন্যায্য প্রতিবাদ করবেনই—যেখানে যেমনভাবে করা সমীচীন সেখানে তেমনভাবে। বিপদ-আপদের সময় আমরা যদি মানুষের পিছনে গিয়ে না দাঁড়াই, তাহ'লে কিন্তু কিছুতেই সংহতি আসতে পারে না। তবে কোন্‌টা অন্যায়, কোন্‌টা ন্যায় সেটা বোঝা চাই। আপনি হয়তো আপনার ছেলের সংশোধনের জন্য তাকে শাসন করছেন, বাইরে থেকে গায়ে প'ড়ে একজন গিয়ে তার প্রতি দরদ দেখিয়ে যদি বলে আপনি অন্যায় করছেন, তাহ'লে সেটা কি তার পক্ষে ঠিক হবে? তাই, হস্তক্ষেপ করবার আগে বোঝা চাই—কে কেন, কোন্‌ উদ্দেশ্যে কী করছে। নচেৎ ভাল করতে গিয়ে মন্দ হয়ে যেতে পারে।

যতীনদা—আপনি যেভাবে চলতে বলেন, সেভাবে চলতে গেলে অনেকখানি ধীর, স্থির হ'তে হয়, সংযম ও সহ্যগুণ লাগে। বেকায়দা দেখলেই তো মাথা গরম হ'য়ে যায়, পরে হয়তো বুঝি। তখন মনে-মনে ভাবি, আর এ-রকম করব না, কিন্তু কার্য্যকালে মাথা ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিকে বলে রিপু, রিপু মানে শত্রু। যে-প্রবৃত্তি আমাদের বশে থাকে না, যার বশে থেকে আমরা অবশভাবে পরিচালিত হই, তা' সত্য-সত্যই মহাশত্রুর মত কাজ করে। মহাশত্রুকে লাই দেওয়া কি ভাল? প্রশ্রয় দেওয়া কি ভাল? কোন্‌ সময় কী সর্ব্বনাশ করবে, তার কি কোন ঠিক আছে? তাই, যখনই মাথা চাড়া দিতে চায়, তখনই সাবধান হ'তে হয়। কিছুতেই ওর খপ্পরে যেয়ে পড়তে নেই। বরং জিভ কামড়ে চুপ ক'রে থাকা ভাল বা ও-জায়গা থেকে স'রে যাওয়া ভাল বা অন্যকাজে নিযুক্ত হ'য়ে অন্যমনস্ক হওয়া ভাল, কিন্তু কিছুতেই প্রবৃত্তিকে অবিহিতভাবে আমল দেওয়া ভাল নয়। প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে-দিতে যেমন প্রশ্রয় দেবার প্রবণতা বেড়ে যায়, স্নায়ু, পেশী ও মস্তিষ্ককোষ ঐ-ঝোঁকা হ'য়ে থাকে, এক-আধবার জয়ী হ'তে পারলে, তেমনি আবার মনে বল আসে, জয়ের নেশা বেড়ে যায়, শরীরের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা-গুলিও ঐ-মুখী হ'য়ে সাড়া দেয়, সাহায্য করে। শুভ-সঙ্কল্পের উদ্‌যাপনে শুধু মনের সাহায্য পেলে হবে না, শরীরের সাহায্যও অপরিহার্য্য। শরীর-বিধানের সাহায্য পাওয়া যায় বদভ্যাস প্রত্যাহার-রূপ সদভ্যাসের ভিতর-দিয়ে। আমার এক সময় রসগোল্লার উপর খুব লোভ ছিল। একবার অনেক টাকা বাকী হয়ে গেল। দোকানদার

খুব কড়া-কড়া কথা শোনাল। মনে বড় ধিক্কার আসলো তাতে। ভাবলাম—যে-রসগোল্লা খাওয়া নিয়ে এত অপমান সইতে হয়, তা' আর নাই বা খেলাম! রসগোল্লা না খেলে কী হয়? কতলোকে তো খায় না! যা'-হোক কোনরূপে টাকাটা শোধ ক'রে দিলাম। কিন্তু আবার একদিন রসগোল্লা খাওয়ার দারুণ ইচ্ছা হ'ল। হাতে সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা ছিল। তাই নিয়ে গুটি-গুটি দোকানের দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু তখনই মনে হ'ল, প্রতিজ্ঞা তো করেছি রসগোল্লা খাব না! আবার মনে হ'ল,—একদিন খেলে তো আর জাত যাবে না, রোজ-রোজ না খেলেই হ'ল। ভেবে দেখলাম—এ তো লোভের পরামর্শ, ওতে কান দেওয়া চলবে না। কিন্তু কান না দিলে কী হবে? আমার পা তো শুনছে না! সে তো এগিয়ে যাচ্ছে রসগোল্লার দিকে! তখন পাশের অড়হর ক্ষেতে ঢুকে অড়হর গাছের গোড়া ধ'রে শুয়ে থাকলাম। অড়হর গাছের গোড়া ধ'রে থাকলাম এই জন্য যে পাছে লোভ যদি আমাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে যায়। শুয়ে প'ড়ে আছি চোখ কান বুজে, তা'ও কি মনের মধ্যে কম দ্বন্দ্ব? একবার লোভ তার পক্ষে অকাট্য ওকালতি করে, আর একবার বিবেক বলে—'না, কিছুতেই ওঠা হবে না। লোভের এত ক্ষমতা যে সে আমার উপর জয়ী হবে?' আমি যেন একেবারে ঘেমে গেলাম। ঝোঁকটা যখন একটু কমলো, তখন ট্যাঁকের সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা দৌড়ে গিয়ে পদ্মায় ফেলে দিয়ে আসলাম। ভাবলাম, পয়সা কাছে থাকলে আবার লোভ হবে। সেদিনকার মত বাঁচলাম। তার পরদিন আবার ঐ-সময় লোভের নেশা চেপে বসল। তখন খামকা একজনের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিলাম। সে ঝগড়া করবে না, কিন্তু আমার যে না করলেই নয়! সময়টা তো কাটান চাই! ট্যাংলায়ে-ট্যাংলায়ে বাধায়ে নিলাম ঝগড়া। কিছু সময় কেটে যাবার পর রোখটা ক'মে গেল। দুই তিন দিন এইভাবে কাটবার পর কায়দাটা যেন হাতে পেয়ে গেলাম। দেখলাম ঝগড়া-টগড়া করবার তো দরকার করে না, দরকার হ'ল লোভের ঝোঁকটা যখন চাপে, সেই-মুহূর্ত্তেই এ-ঝোঁক নিয়ে otherwise actively engaged (অন্যথা সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত) হ'য়ে পড়া irresistible urge (অদম্য আগ্রহ) নিয়ে। যে-কোন প্রবৃত্তি হাতে আনার ব্যাপারে এই কৌশলটি প্রয়োগ করলে চলে। কত মাতাল পর্য্যন্ত মদের নেশা ত্যাগ করেছে এই তুক খাটিয়ে। তবে, ভিতরে একটু আন্তরিক ইচ্ছা চাই। তাহ'লে তিন তুড়ির ব্যাপার! কঠিন কিছু না। আমার দেখা আছে। আমিও তো গাছপাথর না। প্রবৃত্তির কী প্রবল সম্বেগ সে আমার বিলক্ষণ জানা আছে, আর ছোট্ট এই কৌশলটির প্রয়োগে তা' কত সহজে আয়ত্তে আসে তাও ভূরি-ভূরি দেখেছি। রসগোল্লা আমি আজকাল খেলেও তখন কিন্তু পুরো তিন বছরের মধ্যে রসগোল্লা ছুঁইনি। যখন

দেখলাম আগের মত কাবেজ করতে পারবে না, তখন থেকে আবার খাই। সত্তাসম্বর্দ্ধনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাত্ত্বিক, সম্পোষণী যে-কোন জিনিসই মাত্রামত ব্যবহার ও উপভোগ করলে তাতে কিন্তু ধর্ম্মের হানি হয় না। বরং ত্যাগের বাহানায় সত্তাপোষণী সহজ চলনাকে নিরুদ্ধ ও নিপীড়িত ক'রে তুললে তার প্রতিক্রিয়ায় সাত্ত্বিক সম্পোষণ ব্যাহত হয়, এবং তাকেই বলা যায় অধর্ম্ম। ধর্ম্মের কাজ হ'ল সত্তার ধৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখা। তাই, ধর্ম্মাচরণ যখন অজ্ঞতাবশতঃ ঐ ধৃতিকেই ক্ষুব্ধ ও ক্ষুণ্ন ক'রে তোলে, তখন কিন্তু তা' আর ধর্ম্মাচরণ থাকে না। Irrational, ignorant (অযৌক্তিক, অজ্ঞ) চলন ধর্ম্ম নয়কো।

হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে তামাক সেজে দিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খাচ্ছেন। তামাক খেতে-খেতে হাসিহাসি চোখে জনে-জনে প্রত্যেকের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন। ক্ষণিকের দৃষ্টিবিনিময় প্রত্যেকের অন্তরে অব্যক্ত আনন্দের গুঞ্জরণ তুলছে। তাঁর বচনে মধু, নয়নে মধু, মধুময় তাঁর সারা অঙ্গ। তাই, স্রেফ কাছে ব'সে থাকলেই অপূর্ব্ব সুখানুভূতি জাগে প্রাণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—লোকের কথা বলছিলাম। কিছু লোক এমন দরকার যারা ভাল লিখতে পারে। তপোবনের উপযোগী ক'রে কতকগুলি text book (পাঠ্য-পুস্তক) এমনভাবে লেখা দরকার যাতে তিন বছরে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে, অথচ জানার দিক দিয়ে কোন খাঁকতি না থাকে। ইতিহাস ইত্যাদি নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা লাগে যাতে আমাদের কৃষ্টি-সম্বন্ধে ছেলেদের অন্তরে শ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়। যারা এইসব বই লিখবে, তারা যদি সঙ্গে-সঙ্গে তপোবনে শিক্ষকতা করে, তবে ছাত্রদের ঐ-অনুযায়ী পড়িয়ে বুঝতে পারবে লেখাগুলি ছাত্রদের উপযোগী হয়েছে কিনা এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সমস্যাও অনেকখানি মিটবে। কতকগুলি ভাল নাটক লেখান প্রয়োজন। মুকুন্দ দাসের যাত্রার দল কিন্তু একসময় দেশে কম কাজ করেনি। ভাল-ভাল নাটক লিখে নিজেদের যাত্রার দল ক'রে যদি গ্রামে-গ্রামে ঘোরা যায়, তার ভিতর-দিয়ে জনশিক্ষার অনেকখানি সুবিধা হয়। একদল নতুন ধাঁচের কথকও সৃষ্টি করা লাগে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, ভাগবতের ব্যাপারগুলি rationally adjust (যুক্তিযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ) ক'রে modern problem (বর্ত্তমান সমস্যা)-গুলির সঙ্গে যোগসূত্র রেখে পরিবেষণ করতে হয়। কতকগুলি ভাল-ভাল গান রচনা ক'রে সারা দেশের মধ্যে চারিয়ে দিতে হয়। Slogan (আহ্বানধ্বনি)-গুলির ব্যবহার আগের থেকে যেন ক'মে যাচ্ছে। ওগুলি কিন্তু repeatedly (বারবার) চালান লাগে। ক্রমাগত মানুষকে সজাগ ক'রে না দিলে মানুষ ভুলে যায়। আর স্মরণ যেন থাকে,

আমরা যা'-কিছুই করি না কেন, তা করতে হবে শুভ-সম্প্রসারিণী লোকপরিচর্য্যায়—হাতে-কলমে—তেমনি আচার-ব্যবহার নিয়ে।

চুনীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—বর্দ্ধমানের তিলের খাজা পাঠাবি না ?

চুনীদা—হ্যাঁ!

প্রফুল্লর দিকে চেয়ে বললেন—কয়লা দিয়ে আশ্রম ছেয়ে ফেলতে পারি, এমন ব্যবস্থা করবি। যেন সবাই ইট কাটতে পারে, আশ্রমময় দালান হ'তে পারে। প্রত্যেকের ধানের জমি থাকবে, পাকা বাড়ী থাকবে, বাড়ীতে তরিতরকারী হবে, গরুতে দুধ দেবে, আর বাড়ীতে-বাড়ীতে কুটিরশিল্প কিছু-না-কিছু থাকবেই। তার আয়ে সংসারের খরচ-খরচা চ'লে যাবে। কারও যেন চাকরী করা না লাগে, পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকা না লাগে।...কয়লার ব্যবস্থা যেমন করবে, ওয়াগনের ব্যবস্থাও তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে করবে। যে-কোন অবস্থাই আসুক, আমার কয়লা পাওয়া যেন বন্ধ না হয়। এমনিভাবে কেউ কাঠ, কেউ সিমেন্ট, কেউ লোহা ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে—আস্তে-আস্তে সব হ'য়ে যাবে।

গৌরীমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা খাইছিস ?

গৌরীমা—কত খেয়েছি !

শ্রীশ্রীঠাকুর—বানাতে পারিস না ?

গৌরীমা—তা' শিখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তাহ'লিই তো খুব কাম করিছ।

সকলের হাস্য।

১৩ই চৈত্র, শনিবার, ১৩৪৯ (ইং ২৭। ৩। ১৯৪৩)

আশ্রমে মাতৃ-স্মৃতি-তর্পণ-উৎসব চলছে। কাল এই উপলক্ষে অগণিত লোক প্রসাদ পেয়েছে। আজ সন্ধ্যায় প্যাণ্ডেলে আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হবার কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। সুশীলদা (বসু), শচীনদা (গাঙ্গুলী), প্রমথদা (দে), শরৎদা (হালদার), কিশোরীদা (চৌধুরী) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মা'র কথা এমন-ক'রে আমার মন জুড়ে থাকে যে মনে হয়, ঐ স্মৃতি যেন আমার সাথের সাথী হ'য়ে আছে। ভাল কিছু করলে মনে হয়, অলক্ষ্যে থেকে মা তা' দেখে খুশী হচ্ছেন। মায়ের তর্পণ তাই আমার অবিরত চলে।...কাউকে যদি কেউ ভালবাসে, তাহ'লে সে কখনও মানতে চায় না যে তার দেহাবসানের সাথে-সাথে তার সব শেষ হ'য়ে গেছে। সে কোথাও-না-কোথাও আছে

এবং চিরকাল থাকবে—এই প্রত্যাশা যেতে চায় না মন থেকে। মা'র সম্বন্ধেও আমার মনে হয়, কোন-না-কোন form-এ (রূপে) তাঁর অস্তিত্ব আছে এবং তাঁর প্রীতিজনক কিছু করলে তিনি প্রীত হন নিশ্চয়ই। এই বিশ্বাস না থাকলে মানুষ চলতে পারে না।

সুশীলদা—জাতিস্মরদের ব্যাপার দেখে মনে হয়—মানুষ ম'রে গেলেও তার পূর্ব্বজন্মের প্রিয়জন যারা তাদের প্রতি একটা ঝোঁক থাকেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো থাকাই স্বাভাবিক!

এরপর সুশীলদারা উঠে পড়লেন, আরো অনেকে আসলেন। একটি মা এসে বললেন—সংসারে কেউ যদি অন্যায় করে, তাকে তা' বলতে গেলে বেজার হয়, আবার না-বললেও নিজের ভুল নিজে বুঝতে পারে না। বললেও যে বোঝে তাও না। অনেক সময় মনে করে, আমি কেবল দোষ ধরি। এ-রকম অবস্থায় কী করলে যে ভাল হয় তা' বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট-বড় সবারই অল্পবিস্তর অহঙ্কার ও অভিমান আছে। অহঙ্কার ও অভিমানে আঘাত না লাগে এমন-ক'রে বলতে হয়। কাউকে দশজনের সামনে বকাবকি করলেই সাধারণতঃ তার মন খিঁচড়ে যায়। সেই জন্য কাউকে কটু কিছু বলতে গেলেই তাকে আলাদা ক'রে ডেকে নিয়ে বলা ভাল। তিক্ত কথা বলতে গেলেই তার সঙ্গে আদর ও দরদের মেশাল চাই। নিজে যখন রেগে যাস, তখন কাউকে সংশোধন করতে যাস না। তখন মাত্রা ঠিক থাকে না। সংশোধনের জন্য কাউকে কিছু বলতে গেলেই নিজের মাথা ঠাণ্ডা রাখা চাই। ভুলটা, দোষটা বা অন্যায়টা তার মাথায় ধরিয়ে দেওয়া চাই। তা' যদি না ধরাতে পারলে, তাহ'লে কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ল না। তোমার উপর তার নেশাটা যদি ছুটে যায়, তাহ'লে কিন্তু যত সৎ-কথাই শোনাও, তা' কোন কাজে লাগবে না। তুমি নিজে যদি অন্যায় কর, তখন অন্যের কাছ থেকে কি-রকম ব্যবহার পেলে খুশী হও, সেইটে স্মরণ রেখে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার যদি কর, তাহ'লে আর অসুবিধা হবে না। ক্ষমালাভের পিপাসা প্রত্যেকের অন্তরেই আছে। তাই, তুমি কাউকে শাসন করলেও সে যেন বুঝতে পারে, ব্যক্তিগত-ভাবে তুমি তাকে ক্ষমা ক'রেই আছ। কিন্তু দোষ পুষে রেখে সে যাতে কষ্ট না পায়, সেইজন্যই তুমি তাকে সামাল ক'রে দিচ্ছ। এই বুঝটা যদি তার থাকে, তবে তোমার খুশীর জন্যই সে নিজেকে ঠিক ক'রে নেবে।

উক্ত মা—আপনি বললেন, রাগের সময় কাউকে সংশোধন করতে যাওয়া ভাল না, কিন্তু রাগ হ'লে তখন তো বগবগ না ক'রে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—বগবগ করলে বগবগই করা হয়, ছেলেপেলেরা ও সংসারের

আর পাঁচজন বোঝে যে তুমি রেগে গেছ। তাতে তো আর সংশোধন করা হয় না! সংসারে চলতে অনেক সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় চাই। দোষ যে করে সে কেন, কি-কি কারণে দোষ করে, সে-সম্বন্ধে যদি তোমার ধারণা থাকে, তাহ'লে ঐ দোষের জন্য তার উপর রাগ না হ'য়ে বরং সহানুভূতি হবার কথা। নামধ্যান খুব করতে হয়, তাতে সমাধানী বুদ্ধি খুব বেড়ে যায়। পরিবেশ যত খারাপই হোক, সমাধানী বুদ্ধি যদি থাকে, তাতে মানুষ উৎক্ষিপ্ত না হ'য়ে আরো ধীর-স্থির হ'য়ে অক্লান্তভাবে কাজ ক'রে চলে, যাতে অবস্থাটা আয়ত্তে আসে। কঠিন রোগী হাতে পড়লে ডাক্তাররা দেখনি কেমন শান্তভাবে উঠে-প'ড়ে লাগে রোগ-সারাবার জন্য? মানুষকে ভাল করতে গেলে তেমনি উঠে-প'ড়ে লাগতে হয়—মাথা ঠাণ্ডা রেখে। মনে-মনে ভাবতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করলে তার মনে ধরে। মাথা খাটিয়ে এৎফাঁক বের করতে হয়। আর, সেইভাবে চলতে হয়। এমনি ক'রে কায়দাটা হাতে এসে যায়। সাপুড়ে যেমন বাঁশী বাজিয়ে বা উপযুক্ত শিকড় দিয়ে সাপকে বশ করে, কুশল-কৌশলী ব্যবহারের যাদু দিয়ে তেমনি মানুষের বেয়াড়াপনা অনেকখানি বশ করা যায়। একটু লক্ষ্য করলে ও-সব কঠিন কিছু নয়। এমনি ক'রে-ক'রেই তো মানুষ শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে!

উক্ত মা—আমি তো লেখাপড়া জানি না। তা' জানলে বোধহয় আপনার কথাগুলি আরো ভাল ক'রে বুঝতে ও পালন করতে পারতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটুকু বোঝ ততটুকু যদি পালন কর, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে বোঝার ক্ষমতা আরো বেড়ে যাবে। আমি যা' বলি তা' মানুষের প্রাণের দিকে চেয়ে, জীবনের দিকে চেয়ে। জীবনকে যারা ভালবাসে, তাদের আমার কথা না-বুঝবার কথা নয়। আর, লেখাপড়া আমিই কি জানি? নিজের জীবন-দিয়ে যতটুকু দেখেছি, বুঝেছি, জেনেছি তাই বলি। তুই যদি ঠিকমত চলিস,—দেখবি, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে এতখানি জ্ঞান গজিয়ে উঠবে তোর যে তোকে দেখে পণ্ডিতদের পর্য্যন্ত তাক্ লেগে যাবে। তাই বলে—'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।'

মা'টি খুব খুশী হ'য়ে বিদায় নিলেন।

প্রফুল্ল ধানবাদ ইত্যাদি স্থানে কাজ ক'রে সম্প্রতি আশ্রমে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কেমন হ'ল?

প্রফুল্ল—দীক্ষা তেমন হয়নি। ওখানে লোকগুলিকে ধরাই মুশকিল, বিশেষতঃ যারা কোলিয়ারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এর মধ্যেও আমি ও চুনীদা যত জনের সঙ্গে পারি আলাপ-পরিচয় ও যোগাযোগ করেছি। আসবার আগে সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় নামক

একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী কোলিয়ারী প্রোপ্রাইটরের সঙ্গে ঠিক ক'রে এসেছি—আশ্রমের কাজের জন্য যত কয়লা প্রয়োজন তিনি বিনামূল্যে দেবেন, তবে ওয়াগনের ব্যবস্থা রেল-কর্তৃপক্ষকে ধ'রে আমাদের করতে হবে। সুশীলদা আমাকে লিখেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে লিখিয়ে আনতে যে এখনই আমাদের জন্য দুই ওয়াগনের মত কয়লা প্রস্তুত আছে, তিনি ওয়াগন পেলে দিতে পারেন। অমনতর চিঠি রেল-কর্তৃপক্ষকে দেখালে নাকি এখন দু'খানা ওয়াগন পাওয়া যেতে পারে। আমি সেই কথা তাঁকে বলায় তাঁর অফিসের প্যাডে তিনি ঐ-মর্ম্মে একখানি চিঠি টাইপ ক'রে, প্রোপ্রাইটর-হিসাবে নিজের নাম সই ক'রে দিয়েছেন। সুশীলদাকে সে-চিঠি দিয়েছি। তাই মনে হয়, ওয়াগনের ব্যবস্থা করতে পারলে কয়লার জন্য ভাবতে হবে না। ভদ্রলোক খুব ভাল। আপনার কথা খুব আগ্রহভরে শুনতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো ভালই হয়েছে। এদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। তুই যা' বললি তাতে তো মনে হয়, পঁচিশ ওয়াগন কয়লা বছরে পাওয়া কঠিন কথা নয়। সুশীলদা ওয়াগনের জন্য যা' করবার করবে, আর তোরা লক্ষ্য রাখবি কয়লার জোগান যাতে বন্ধ না হয়। এমনভাবে মানুষের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করা লাগে যাতে মানুষ তোমাদের দিতে পেরে ধন্য বোধ করে। আবার, তাদের জন্য যেভাবে যতখানি পার তা' করবেই। মানুষগুলিকে মুখ্য ক'রে ধ'রো, তাদের জিনিসগুলিকে নয়। তাহ'লে দেখবে, কিছুরই অভাব হবে না। অহরহ একটা জ্বলন্ত ক্ষুধা থাকা চাই প্রাণে যে প্রত্যেকটা মানুষের কতটা ভাল করতে পারি। এই অনুসন্ধিৎসা থাকলে কিন্তু করার অন্ত নেই।

প্রফুল্ল—করার সামর্থ্য আমাদের কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন মানুষই একক নয় পৃথিবীতে। তোমার হাত, পা ছড়ান রয়েছে চারদিকে। ভালবেসে, সেবা দিয়ে যতজনকে আপন ক'রে নিতে পারবে, তাদের প্রত্যেককে দিয়ে আবার পরস্পরের সেবা করতে পারবে। এ-কারবারে ফেল পড়বার ভয় নেই কখনও। পুঁজি তোমাদের অফুরন্ত। তবে, সে-পুঁজি হাতে আনতে হবে খেটেপিটে। অলস বা স্বার্থপর হ'লে আর পারবে না—ইষ্টার্থী ও অনলসকর্ম্মা হ'লে সব দরজা তোমাদের খোলা। পরমপিতা তোমাদের পূরণ করবার জন্য, যোগান দেবার জন্য তো উন্মুখ হ'য়ে আছেন, হাত বাড়িয়ে গ্রহণ না করলে তিনি কী করবেন?

প্রফুল্ল—সব রকমের স্বার্থপরতাই কি দোষের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-স্বার্থপরতার মধ্যে ইষ্টস্বার্থ ও বৃহত্তর পরিবেশের স্বার্থের স্থান নেই, যে-স্বার্থের সঙ্গে ইষ্টার্থ ও সামগ্রিক স্বার্থের যোগ-সঙ্গতি নেই, যে-স্বার্থ বিচ্ছিন্ন

ও স্বতন্ত্র রকমে চলতে চায় অন্যের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন ক'রে, সেই স্বার্থপরতা বা স্বার্থই দোষদুষ্ট। ইষ্টার্থী না হ'লে মানুষের স্বার্থ-সম্বন্ধে বোধই গজায় না। ইষ্টার্থী হ'লে মানুষের বুদ্ধি হয় ইষ্টের ইচ্ছাকে পূরণ করা, নিজের ও সবার সত্তার মঙ্গল যাতে হয় তাই করা। তাতে স্বার্থ পরমার্থে রূপান্তরিত হয়, অন্যকথায়—পরমার্থই স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়ায় মানুষের। 'আমি' মানে সবাই, সবাই মানে আমি,—প্রকৃত স্বার্থের গোড়ার কথা এইখানে। এটা শুধু তত্ত্ব নয়, সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হ'ল এইটে। পরিবেশ যতখানি দুর্ব্বল ও বিপন্ন হবে, আমিও ততখানি দুর্ব্বল ও বিপন্ন হব। কারণ, প্রত্যেকের বাঁচা ও ভাল থাকা নির্ভর করে পরিবেশের উপর। পরিবেশ যদি না বাঁচে, ভাল না থাকে, পরিবেশের উপযুক্ত পোষণ আমি পাব না, সেই পোষণ না পেলে আমিও টিক্‌তে পারব না। তাই, পরিবেশকে বাদ-দিয়ে নিজের স্বার্থের কথা ভাবা বোকামি। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে সে-গাছ কি কখনও বাঁচে?

কালিদাসদা (মজুমদার)—অন্যের ক্ষতি না ক'রে নিজের বাঁচার জন্য যা' করা যায়, তাতে তো কোন দোষ নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে দোষ কী? তবে, সব সময় মনে রাখতে হবে যে ইষ্টার্থী সেবাই একাধারে আমাদের বাঁচার উপায়ও বটে, উদ্দেশ্যও বটে। জীবনটা শুধু নিজের ভোগসুখের জন্য নয়, জীবনটা হ'ল তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজ-বৈশিষ্ট্যসম্মত পথে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকের সেবায় সার্থক হ'য়ে উঠবার জন্য। এর ভিতর-দিয়েই হয় মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মোপলব্ধি, ব্যাপ্তি ও বৃদ্ধি। কেন্দ্রায়িত অতন্দ্র কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে ছাড়া মানুষের জ্ঞান হয় না। ভাবা, বলা, হাতে-কলমে করা তিনটিই এর অপরিহার্য্য অঙ্গ। একটাকে বাদ দিয়ে আর-একটা হয় না। তাই আমি বলি—যজন, যাজন, ইষ্টভৃতির কথা। ফলকথা, আমাদের বাঁচাটা হবে ইষ্টার্থে, নচেৎ শুধু বেঁচে থাকার মধ্যে সার্থকতা কোথায়? মানুষের জীবন যদি ইষ্টার্থে উৎসর্গীকৃত না হয়, তবে পশুজীবনের সঙ্গে তার ব্যবধান কোথায়? মানুষ হোমরা-চোমরা যতই হোক, সে যদি ভক্তিমান না হয়, উৎসকেন্দ্রিক না হয়, তবে তার জীবন মরুভূমির মতন।

কিশোরীদা—কাজকর্ম্ম বাদ দিয়ে কেউ যদি শুধু নামধ্যান নিয়ে থাকে, তাতে কি তার পূর্ণ বিকাশ হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান কথা হ'ল নামীর প্রতি উর্জ্জী আনতি ও অনুরাগ। সেই আনতি ও অনুরাগ থাকলে তাঁর প্রীতি-কথা ও প্রীতি-কর্ম্মের প্রতিও ঝোঁক গজায়। নিজের সব শক্তি দিয়েই তাঁকে তুষ্ট-পুষ্ট করার বুদ্ধি হয়—চলন, চরিত্র তদনুগ ক'রে তুলতে ইচ্ছা হয় যাতে তিনি নন্দিত হন। আরো মনে হয়, সবাইকেই তদ্ভাবভাবিত

ক'রে তুলি। তদাকারাকারিত ক'রে তুলি—প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। তাই. নামধ্যান ঠিক-ঠিক হ'লে ঐ নামধ্যানই করা-বলার দিকে ঠেলে দেয় মানুষকে। আবার, করা-বলা বাদ দিয়ে নামধ্যানও ঠিক মত হয় কিনা সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। শুধু যদি খাওয়া যায়, আর হাগা যদি একদম না হয়, তাহ'লে যেমন বদহজম হয়—খাবার স্পৃহা থাকে না, শুধু sensory engorgement (বোধমুখী ভরণ) যদি হয়, আর motor outlet (কর্ম্মপ্রবাহী নিঃসরণ) যদি না থাকে, তাহ'লে তাতেও মনোরাজ্যে তেমনি একটা অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। ওতে মানুষ unbalanced (সাম্যহারা) হ'য়ে পড়ে। আমার সত্তার সব-কিছুর ভিতর তাঁকে যদি অনুপ্রবিষ্ট ক'রে তুলতে চাই, তবে আমার সবকিছুই সক্রিয়ভাবে তাঁর সেবায় লাগান চাই। যে-দিক্‌টা অসংলগ্ন থাকবে, সে দিক্‌টায় তাঁর ছাপ পড়বে না, অযুক্ত ও অনুজ্জ্বল থেকে যাবে, পূর্ণ বিকাশের পথে অতখানি খাঁকতি থেকে যাবে। আমাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত ও একপেশে ধারণার উদ্ভব হয়েছে। বৌ-ছেলেকে ভালবাসতে গিয়ে আমরা কিন্তু কখনও এ-কথা ভাবি না যে, শুধু তাদের কথা ভাবব, তাদের জন্য বাস্তবে কিছু করব না। তাদের বেলায়, সেটা যদি প্রযোজ্য না হয়, ভগবান্‌কে তথা ইষ্টকে ভালবাসার বেলায় সেটা প্রযোজ্য হবে কেন? ভালবাসার জনের জন্য মানুষের করণীয়ের অন্ত নেই। যত করা যায়, তত দেখা যায় আরো বহু-কিছু করবার আছে। আর, ভগবান্‌কে ভালবাসলে তাঁর খাতিরে প্রত্যেকটি সত্তাকে ভালবাসতে হয়, প্রত্যেকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সার্থকতার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হয়। কেউ যদি বাপ-মাকে ভালবাসে, তাহ'লে কি সে কখনও ভাই-বোনেদের সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে? ভক্তের করণীয়ের কি কোন লেখাজোখা আছে? এই কর্ম্ম কিন্তু তার সেবাযজ্ঞ, পূজা-পরিক্রমা, সাধনভজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নামধ্যান ও কর্ম্ম তার ওতপ্রোতভাবে জড়ান। আর, সব-কিছুই তার ইষ্টের জন্য। পরিবেশের সেবা যতই মহৎ কাজ হোক,—তা' যদি ইষ্টার্থে না হয়, তা' একটা unsolved complex-এর (অসমাহিত গ্রন্থির) মত থেকে যেতে পারে, এবং তাতেও মানুষের অকল্যাণ হ'তে পারে।

কিশোরীদা—এই কথাটা বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের এমন যদি কোন ইচ্ছা থাকে যা' ইষ্টের সঙ্গে অনন্বিত, তবে সেই ইচ্ছার প্ররোচনায় সে ইষ্টের পরিপন্থী চলনেও চলতে পারে। এককথায়, ইষ্ট যেমন তার master (প্রভু), ঐ ইচ্ছাও তেমনি তার master (প্রভু) হ'য়ে থাকে। দুই master (প্রভু)-কে serve (সেবা) করতে গিয়ে, তার ভিতর একটা bifurcation (দ্বিভাগ) এসে যায়। জীবনের কোন ভাগে ইষ্টের আধিপত্য

সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ ফাটলের ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তিপরায়ণতাই প্রাধান্য লাভ করতে পারে। ভাল কাজ করতে-করতেও সে কখন প্রবৃত্তির কবলে প'ড়ে যায়, তা' হয়তো ঠাওরই পায় না। আর, প্রবৃত্তিপরায়ণ কর্ম্ম কখনও মানুষকে ইষ্টার্থপরায়ণ তথা সত্তাপরায়ণ ক'রে তুলতে সাহায্য করে না—তা' কি নিজেকে, কি অপরকে। তাই, সব আয়োজন সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী সুফল কমই হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল বিয়ে, ভাল জন্ম ও ভাল শিক্ষা এই তিনটের সমাবেশ চাই। শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা যতই থাক্ না কেন, সুজনন যদি না হয়, জন্মগত সৎ-সংস্কার যদি না থাকে, তাহ'লে সে সৎশিক্ষা কমই গ্রহণ করতে পারে। 'মাতৃদোষেণ ছন্নতা, পিতৃদোষেণ মূর্খতা।'

আকুদা (অধিকারী)—বিয়ের ব্যাপারে আগে আমাদের দেশে যেমন ক'রে ছেলে ও মেয়ের বংশ ইত্যাদি দেখা হ'ত, এখন সেটাকে অনেকেই কুসংস্কার মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তা' তো করবেই, তা' না-হ'লে নিজেদের সর্ব্বনাশ করবে কি ক'রে? এটা যে কত বড় বিজ্ঞান, তা' আর বোঝে না। অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি না হ'লে মানুষ কখনও নিজেদের শুভ ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকে অবজ্ঞা করে না। এটা হ'ল inferiority (হীনত্ববুদ্ধি)-র লক্ষণ। এতে মানুষ কখনও বড় হ'তে পারে না। বড় হ'তে গেলেই চাই শ্রদ্ধা। যে নিজের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করে না, সে অন্যের ভালটাও গ্রহণ করতে পারে না। অনুকরণপ্রিয় হ'য়ে অন্যের খারাপটাই ধরে। যার নিজের কোন দাঁড়া নেই, আদর্শ নেই, ব্যক্তিত্ব নেই, অন্যের খোরাক হওয়া ছাড়া তার আর উপায় কী আছে? এই হ'ল পরাধীনতার আসল রূপ। এই servile attitude (দাস-মনোভাব) না যাওয়া পর্য্যন্ত মানুষ কখনও প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হতে পারে না।

আকুদা—আমরা যে কতবড় কৃষ্টির অধিকারী, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের ধারণা নেই বললেই চলে। তা' থাকলে এমন অবস্থা হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো যাজনের প্রয়োজন। আর, যাজন যারা করবে তারা শুধু মুখে বললে হবে না, তাদের কৃষ্টি-অনুযায়ী চলা চাই। না চললে, না করলে conviction (প্রত্যয়) হয় না। Conviction (প্রত্যয়) না থাকলে তারা কোন জিনিস চারাতে পারে না। তুই অনেক জানিস, বুঝিস কিন্তু করিস না। ওকালতি নিয়ে প'ড়ে আছিস, কিন্তু পরমপিতার ওকালতি যদি করতিস, তা'হলে দেখতিস—তোর নিজের জেল্লা কত খুলে যেত, আর মানুষেরও কত উপকার হ'ত!

২২শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৪৯ (ইং ৫ । ৪ । ১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে বকুলতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। মুখখানি তাঁর আনন্দে সমুজ্জ্বল। কাছে অনেকেই আছেন। তাঁর সান্নিধ্যে সকলেরই চিত্ত প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। এমন সময় একটি নবাগত ভাই এসে ক্ষুব্ধ চিত্তে আশ্রমের একজন প্রবীণ কর্ম্মীর বিরুদ্ধে কথাখেলাপ, দুর্ব্ব্যবহার ইত্যাদির অভিযোগ জানালেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে বললেন—আমি এমনতর অপমানজনক ব্যবহার কারও কাছ থেকে পাইনি। এই যদি হয় এখানকার বিশিষ্ট কর্ম্মীদের ভদ্রতার নমুনা, তাহ'লে আমার পক্ষে তা' সহ্য করা সম্ভব হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাকে যা' বলবার আমি বলব। এমন ক'রে থাকলে সে খুব অন্যায়ই করেছে। যাহোক, এতে সে নিজেই determined (নির্দ্ধারিত) হয়েছে। কিন্তু তুই এত দুর্ব্বল হ'তে যাবি কেন? অন্যের এতটুকু অপ্রিয় ব্যবহারে যদি মাথা খারাপ করিস, তাহ'লে সুখশান্তি পাবি কী ক'রে জীবনে? রাগ যাদের বেশি, অসুখ-অশান্তির তাদের কখনও অভাব হয় না। সইতে পারাই তো শক্তিমানের লক্ষণ। অন্যের ঠোকাটা যদি তোমার কাছে বড় হ'য়ে ওঠে, তুমি দাঁড়াবে কোথায়? একজনের কাছে আঘাত পেয়ে সেখান থেকে আর-এক জায়গায় যাবে, সেখানে আবার আঘাত খাবে; তখন আর এক জায়গায় যাবে, এইভাবে দানা বেঁধে তুলতে পারবে না কিছু।

ভাইটি সব শোনা সত্ত্বেও বললেন—আপনি নিজেই তো বলছেন, দাদা অন্যায় করেছেন। তিনি অন্যায় করেছেন এই কথাটাই আমার কাছে স্বীকার করুন। আমি এর প্রতিবিধান চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—সেই ব্যবস্থাই করছি দাঁড়া!

পরক্ষণে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই দাদাটিকে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি ওর কাছ থেকে দুটো টাকা ধার নিয়েছিলেন?

তিনি বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কবে দেবার কথা ছিল?

উক্ত দাদা—আজ। এবং ওকে ওর টাকা দেব ব'লে আমি যোগাড়ও ক'রে রেখেছি। কিন্তু আমি একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিলাম, সেই সময় টাকার তাগাদা করায় আমি বিরক্ত হ'য়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসময়ে বিরক্ত করুক বা যা'ই করুক, আপনার কাছে যখন ওর প্রাপ্য আছে এবং আজই যখন তা' দেবার কথা, কথা না বাড়িয়ে তখন-তখনই দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল, বিশেষতঃ ঐ টাকা যখন আপনার যোগাড় ছিল। আপনার ব্যবহারে ও

নাকি খুব অপমানিত হয়েছে। আপনি ব্রাহ্মণ-সন্তান না হ'লে ওর পা ধ'রে ক্ষমা চাইতে বলতাম। যা-হোক, আপনি এখনই সবার সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে ওর কাছে ক্ষমা চান এবং ওর প্রাপ্য টাকা দুটোও ওকে দিয়ে দেন।

দাদাটি আন্তরিকভাবে তাই করলেন।

ভাইটি নিজের জিদের জন্য একটু লজ্জিত হলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর— নিজের ব্যবহারে মানুষকে উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলে তাকে দুর্ব্যবহার করতে বাধ্য ক'রে, পরে আবার সেজন্য তাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করানর ভিতর-দিয়ে পেচোয়া অহং-এর পরিতৃপ্তি হ'তে পারে, কিন্তু সেই পরিতৃপ্তি বা উল্লাসের ভিতর জীবনীয় সম্পদ্ নেইকো, আছে জাহান্নমের জয়গান।

উক্ত ভাই—ঠাকুর! আমার ঐভাবে টাকার তাগাদা করা অন্যায় হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার চাইতে অন্যায় হয়েছে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন উদ্ধত ও দমনীয় মনোভাব পোষণ করায় যে, সে এসে ক্ষমা না-চাওয়া পর্য্যন্ত তুমি শান্ত হ'তে পারলে না। নিরখ-পরখ বাদ দিয়ে এইভাবে আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দিয়ে দেখো—দুনিয়ায় শেষপর্য্যন্ত ক'জন বান্ধব থাকে তোমার!

উক্ত ভাই—ঠাকুর! আমি এখন বুঝতে পারছি—সত্যই আমি দোষী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি বুঝেই থাক যে তুমি অপরাধ করেছ, তবে যার প্রতি অপরাধ করেছ, তাকে খুশী করাই তো মহত্ত্বের লক্ষণ।

ভাইটি তখনই যেয়ে সেই দাদার পা জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলে বললেন—দাদা! আপনি আমার সব অপরাধ ক্ষমা করুন।

দাদাটি তখনই তাকে উঠিয়ে নিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। বললেন—দূর পাগল! আমি কি তোর উপর রাগ ক'রে থাকতে পারি?

আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় উভয়েরই চোখ দিয়ে নীরব অশ্রুধারা বইতে লাগল, মিলনের সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেরই মনপ্রাণ উল্লসিত হ'য়ে উঠল। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখেও নেমে এল তৃপ্তিপ্রসন্ন হাসির উজ্জ্বলতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইন্দুদাকে বললেন—কৃষির দিকে নজর দিচ্ছিস তো?

ইন্দুদা (মিত্র)—একটু-একটু দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' করবি interest (অনুরাগ) নিয়ে করবি। Half-hearted (আগ্রহশূন্য) রকমে কোন কাজ করতে নেই, তাতে success (কৃতকার্য্যতা)-ও আসে না, life (জীবন)-টাও enjoy (উপভোগ) করা যায় না। Experience (অভিজ্ঞতা)-ও বাড়ে না। যা' করবি, খুব স্ফূর্ত্তি-সহকারে করবি। উৎসাহ-সহকারে যদি কৃষি

করিস, তাহ'লে দেখবি. তোর থেকে আবার কতজনের ভিতর চারিয়ে যাবে। যজন, যাজন ও ভরণ সব কাজেই লাগে। নিজে করতে হয়, করার আনন্দময় অভিজ্ঞতার কথা অন্যের কাছে বলতে হয়, আর ঐ কাজের অস্তিত্ব যাতে অবাধ হয়, তার জন্য সাধ্যমত তার পিছনে খরচ করতে হয়। এতখানি করার ভিতর-দিয়ে একটা favourable climate (অনুকূল আবহাওয়া) সৃষ্টি হয়। পরিবেশের মধ্যে যাদের ঐ ধাঁজ আছে, তারা তা' থেকে pick up (গ্রহণ) করবার সুযোগ পায়। আমরা যে scientific training-এর (বৈজ্ঞানিক শিক্ষার) কথা বলি, তার ভিত্তি পত্তন হ'তে পারে কৃষির ভিতর-দিয়ে। কৃষির ব্যাপারে একই সঙ্গে মাটির দিকে নজর পড়ে, জলের দিকে নজর পড়ে, বীজের দিকে নজর পড়ে, সারের দিকে নজর পড়ে, চাষবাসের দিকে নজর পড়ে, আবহাওয়ার দিকে নজর পড়ে, গরু, যন্ত্রপাতি, ফল-ফুল, পোকা-মাকড়, সূর্য্য, চন্দ্র সব-দিকেই নজর পড়ে। হাতে-কলমে করার ভিতর-দিয়ে সব জিনিসটা সম্বন্ধে একটা মমত্বপূর্ণ অনুসন্ধিৎসা গজায়। আবার কিসে কী হয়, কোনটায় কিসের প্রতিকার হয়, সে-সম্বন্ধেও খেয়াল হয়। প্রয়োজনীয় কিছু সৃষ্টি করার আনন্দও অনুভব করা যায়। হাত, পা, মাথা, মন একসঙ্গে তৈরী হয়। ছেলেদের বোধের জগৎই বিস্তারলাভ করে। লেখাপড়ার মধ্যে কৃষিটা ঢোকাতে আমার খুব ইচ্ছা করে। তাহ'লে বোধহয় শিক্ষাটা অনেকখানি জীবন্ত ও বাস্তব হয়।

প্রমথদা (দে)—অনেক বাড়ীতে তো ছেলেপিলেরা কৃষি করে, কিন্তু তাতে ছেলে-পিলেদের শিক্ষার দিক্ দিয়ে যে খুব সুবিধা হয়, তা' তো মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে কৃষির যোগসূত্র রচনা ক'রে দিতে হয়, আলাদা-আলাদা ক'রে রাখলে হয় না, আর কৃষি যাতে দায়িত্ব-সহকারে করে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। আধকাঠা জমির দায়িত্ব হয়তো একটা ছেলেকে দেওয়া গেল। একটা জিনিস ফলাতে গেলে জমি-তৈরি, বীজ বোনা ইত্যাদি থেকে সুরু ক'রে পর-পর যা'-যা' করা লাগে, সবই করবে দায়িত্ব-সহকারে। যদি পোকা লাগে, তাও কিভাবে তাড়াতে হবে, সে-ই ব্যবস্থা করবে। তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে সব-দিকে। সঙ্গে-সঙ্গে সে হিসাব রাখবে, এর পিছনে তার পয়সা ও শ্রম কত ব্যয় হ'ল। জিনিসটা যা' হ'ল বিক্রী করলে কত পাওয়া যেত, তাও হিসাব করবে। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য প্রয়োজন হ'লে তা' নিজে হাটে নিয়ে বিক্রয় করবে। অবশ্য, শ্রদ্ধার অবদান-স্বরূপ নিজের অর্জ্জন জিনিস যদি পাঁচ-জনকে দেয়, সেই-ই ভাল। কিন্তু সবটা যদি তার হিসাবের মধ্যে থাকে, তাহ'লে profitable management (লাভজনক পরিচালনা) জিনিসটা শিখবে। কোন-একটা কাজ যদি এইভাবে thoroughly ও responsibly

(পুরাপুরি ও দায়িত্ব-সহকারে) করতে শেখে, তার অনেক দাম আছে। ঐ practical experience-এর (বাস্তব অভিজ্ঞতার) উপর দাঁড়িয়ে সে নিজের জীবনে স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের পথ খুঁজে বের করতে পারবে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মানুষ যদি বেয়াড়া তর্ক করে, তখন তার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করা ভাল ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বিশেষ-বিশেষ complex (গ্রন্থি) থাকে, unconsciously (অজ্ঞাতসারে) তার support-এ (সমর্থনে) বহু অবান্তর যুক্তির অবতারণা করে ; তুমি উলটো যুক্তি যতই দেও না কেন, তাতে কিন্তু সে বুঝবে না। তাই, তার কাছে প্রশ্ন ক'রে ক'রে তার দৃষ্টিভঙ্গীর বাস্তব পরিণতি কী হ'তে পারে সেটা তার মুখ দিয়েই বের করা ভাল—যাতে তার সমর্থিত নীতির অসঙ্গতি সম্বন্ধে সে নিজেই বুঝতে পারে। অনেক সময় পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। কুতর্কের ভিতর যেতে নেই। বলতে হয়—আমি এই রকম বুঝি, বাস্তবেও দেখতে পাই এমনতর ; আপনি যেটা ভাল মনে করেন, তাই করবেন, ভাল হওয়া নিয়ে তো কথা। আপনিও ভাল চান, আমিও ভাল চাই। পরমপিতার কাছে প্রার্থনা করি, আমরা কেউ-ই যেন ভাল থেকে বঞ্চিত না হই। ধর্ম ও কৃষ্টির অবমাননাকর কথা যদি বলে, তেজবীর্য্যের সঙ্গে রুখেও দাঁড়াতে হয়। নটের মত চলতে হয়, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। ·· যাজনের প্রধান জিনিস হ'লো—ইষ্ট ও কৃষ্টি-সম্বন্ধে মানুষের অন্তরে একটা শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও অনুরাগ জাগিয়ে দেওয়া। কা'রও পাতলা রকম দেখলে বিহিত শৌর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও দরদে তা'কে মোড় ঘুরিয়ে ওখানে নিয়ে দাঁড় করাতে হবে। নইলে যত কথাই কও, তা' কিন্তু কাজে আসবে না। বাক্যের সঙ্গে-সঙ্গে যদি কুশল-কৌশলী নিয়ন্ত্রণী ব্যবহার না থাকে, তাহ'লে সে-বাক্য অনেকখানি নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

উমাদা (বাগচী)—মানুষের ইষ্টানুরাগের প্রধান পরখ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টের জন্য হাসিমুখে খুশি মনে কে কতখানি কষ্ট সইতে পারে ; কতখানি প্রবৃত্তির প্রলোভন ও উত্তেজনা এড়িয়ে চলতে পারে ; কতখানি খেয়াল-খুশী বিসর্জন দিতে পারে ; তাঁকে দিতে, তাঁর জন্য করতে কার কেমন ভাল লাগে ; তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ কে কতটুকু করতে পারে ; অহঙ্কার, অভিমান, স্বার্থ, দ্বেষ, হিংসা ও বৈরীভাব কতটা ত্যাগ করতে পারে—সেইটে দেখতে হবে। আমি যদি তোমাকে অত্যন্ত অনাদর করি এবং ঠিক সেই একই সময়ে তুমি যার প্রতি বিরূপ এমনতর কাউকে যদি খুব সমাদর করি, দিই-থুই, এবং তাতে যদি তোমার মনে এতটুকু ঈর্ষ্যার সঞ্চার না-হ'য়ে আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহ'লে বোঝা যাবে, তোমার অন্তরে

অনুরাগের জাগরণ হয়েছে। আবার, তুমি যদি আমাকে ভালবাস, এবং কাউকে যদি দেখ—তোমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন অথচ আমার প্রতি বিরূপ তাহ'লে কিন্তু তার লাখ বন্ধুত্বও তোমার কাছে প্রীতিকর লাগবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর উমাদাকে বললেন—লোকজন যাতে বেশী ক'রে আসে সেজন্য চিঠিপত্র দিচ্ছিস তো?

উমাদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঠি খুব লেখা লাগে, আর এদিকে ব্যবস্থা করা লাগে—যাতে লোকজন বেশি আসলে তাদের থাকার কষ্ট না হয়। আনন্দবাজারের জন্যও ব্যবস্থা করা লাগে।……আগে আমি যখন কুষ্ঠিয়া যেতাম, যে-বাড়ীতে থাকতাম, সে-বাড়ীতে এত জিনিসের আমদানি হ'ত যে অনেক সময় রাখার জায়গা হ'ত না। ……প্রত্যেকে যদি হাতে ক'রে কিছু নিয়ে আসে, তাহ'লে আনন্দবাজার ভেসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটা কাজের জন্য কয়েকজনকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে বলেছেন, তাদের আসতে দেরী দেখে উমাদাকে বললেন—দ্যাখ্ তো খোঁজ ক'রে মণি! ওরা আসে না কেন? যা'কে যে-কাজ দিই, সে-কাজ যদি তাড়াতাড়ি সমাধা না করে, তাহ'লে আমার ভাল লাগে না। কাউকে bluff (ধাপ্পা) দেবে না, অসন্তুষ্ট করবে না, go-between (কথাখেলাপ) করবে না, অথচ ক্ষিপ্রভাবে সংগ্রহ করবে, এমনটা দেখলে আমার ভাল লাগে।

উমাদা—এখনও বোধহয় সংগ্রহ হয়নি, সংগ্রহ হ'লে তো নিয়েই আসতো! যাহো'ক, দেখি গিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর--সংগ্রহ যে এখনও হয়নি সে তো আমিও বুঝছি। তবু তুই যেয়ে খোঁজ করলে সম্বেগ আরো বেড়ে যাবে, তা'তে সংগ্রহের speed (গতি) বেড়ে যাবে। ওদের experience (অভিজ্ঞতা) ও self-confidence (আত্মবিশ্বাস) বাড়বে, আমার সেইটেই লাভ।

দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত)—মানুষকে তাড়াতাড়ি ইষ্টের বিষয়ে interested (অন্তরাসী) করবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার প্রতি যদি interested (অন্তরাসী) না হয়, তাহ'লে কিন্তু আপনার ইষ্টের প্রতি interested (অন্তরাসী) হবে না। ইষ্টের প্রতি আপনার interest (অন্তরাস) যদি আপনাকে পরিবেশের প্রতি interested (অন্তরাসী) ক'রে তোলে, এবং ইষ্ট-বিধৃত ঐ interest (অন্তরাস) যদি exposition-এ (অভিব্যক্তিতে) glow ক'রে (উদ্ভাসিত হ'য়ে) একটা magnetic pull (আকর্ষণী টান)-

এর সৃষ্টি করে, তবে সবাই সহজে আকৃষ্ট হয়। ঐ ভাবটাকে স্বাভাবিক ক'রে নিতে হয়। তখন একটা জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলেও মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকবে আপনার দিকে। আপনার যাবতীয় যা-কিছুই মানুষকে সাত্ত্বিক তোষণ, পোষণ যোগাবে, শুধু মানুষকে কেন—জীবজন্তু, গাছপালাকে পর্য্যন্ত।

দক্ষিণাদা—এই ভাবটা স্বাভাবিক হয় কি ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিন্তায়, বাক্যে, কর্ম্মে সব-কিছুর ভিতর অনুশীলন করতে হয়—যা'তে ঐভাবে সব-সময় অভিষিক্ত থাকা যায়। আর, চলাফেরা, কাজকর্ম্মের ভিতরও নামটা চালাতে হয়। ঐ mood (ভাব) বজায় থাকে এমনতরভাবে গুনগুন ক'রে গান করতে হয়। ওর পরিপোষক আলাপ-আলোচনা ও সঙ্গ করতে হয়। ভাল-ভাল বই পড়তে হয়। মাঝে-মাঝে নিরিবিলিতে ব'সে নামধ্যান করতে হয়। বিচার-বিশ্লেষণ করতে হয়। আর, প্রতি পদক্ষেপে মেপে-মেপে চলতে হয়—আমার চলার ভিতর-দিয়ে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা কতখানি অক্ষুণ্ণ থাকছে। চলতে-চলতে মানুষের একটা নেশার মত এসে যায় ; তখন ঐভাবে মত্ত না থাকতে পারলে কিছুতেই যেন ভাল লাগে না, মনটা হুহু করে। সব সময় বুদ্ধি হয় ঐভাবে আত্মস্থ থাকবার। কাজকর্ম্ম থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে শুধু ভাবালুতা নিয়ে থাকলে কিন্তু ভাবটা পাকা হয় না। কঠোর কর্ম্ম, সংগ্রাম ও সংঘাতের ভিতরও ইষ্টের ভাবে ভরপুর থাকতে অভ্যস্ত হ'তে হবে, নইলে ভাবটা মজ্জাগত হবে না—বাইরের জগতের বিক্ষেপে ভেঙ্গে যাবে। চিন্তা ও কর্ম্মের সমতা চাই। তা না-হ'লে চরিত্র অনুরঞ্জিত হবে না। নিরন্তর ইষ্টমনন ও অতন্দ্র ইষ্টকর্ম্ম—এই দুই নিয়ে চলা চাই। এর ফাঁকে-ফাঁকে আলগা হ'য়ে নামধ্যান-ভজনে ডুব দিতে হবে। মনটা প'ড়ে থাকা চাই ইষ্টের কাছে। 'সে মুখ কেন অহরহ পড়ে মনে।' কাজের মধ্যেও সব-সময় বোধকরা চাই যে তাঁর তৃপ্তি ও তুষ্টির জন্যই যা-কিছু করছি। তখন, যখন যেভাবে থাকি—তাঁতেই থাকি, তিনিই সমগ্র মন অধিকার ক'রে থাকেন। যাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা যায়, তাঁর স্মৃতি-চেতনা লেগেই থাকে মনে। ওইটে হয় মনন-সূত্র। এর ফলে, চলন-চরিত্রও ইষ্টের গুণাবলীতে অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে। এ-সব নূতন কিছু নয়। বৌকে ভালবাসলে কেমন হয় তা' বোঝেন তো ? ঐ একই রকম ব্যাপার। মন তো আমাদের কত জায়গায় মজে, ইষ্টে মজাতে পারলেই হ'ল—তা যেমন ক'রেই হোক। আন্তরিক ইচ্ছা নিয়ে অভিনয় করতে-করতেও মন মজে যেতে পারে তাঁতে।

কিশোরীদা (চৌধুরী)—সাধনার পথে 'নামে রতি' নাকি একান্ত প্রয়োজন ? সেই 'নামে রতি' আসে কি-ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রতি মানে অনুরাগ। নাম করতে-করতে নামীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। নামীর প্রতি যত অনুরাগ বাড়ে, নামের প্রতিও তত অনুরাগ বাড়ে। কারণ, নাম করলে নামীর কথাই মনে পড়ে। যাকে ভালবাসা যায়, তাঁর চলন-চরিত্র, চেহারা, গুণাবলী ও লীলা-কথা স্মরণ-মনন করতে ভাল লাগে। ঐ ভাল-লাগার সঙ্গে-সঙ্গে ইচ্ছা হয় নিজের চলন-চরিত্রকে নিজ বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ত'দনুগ ক'রে তুলতে। এর ভিতর-দিয়ে আসে নিরখ-পরখ। নিজের দোষগুণ যেমন যেমন বোঝা যায়, তেমন-তেমন আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করে। মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণ যতই করে, ততই দেখে যে এর শেষ নেই। এই প্রয়োজনবোধের থেকে মানুষ আবার নিরন্তর নাম করবার প্রয়োজন বোধ করে। তাছাড়া, ইষ্টের অফুরন্ত চাহিদা ও ইচ্ছাপূরণ করতে গিয়ে মানুষ সর্ব্বদাই নিজের শক্তির অসম্পূর্ণতা-সম্বন্ধে সচেতন হয়। ঐ শক্তির সন্ধানে মানুষ তখন নামের শরণাপন্ন হয়। যত নাম করে ও তাঁর পথে চলে ততই বোধ করে—ভিতর থেকে কে যেন অনবরত শক্তি ও বুদ্ধি জুগিয়ে যাচ্ছে। তাই, ইষ্টের সম্বন্ধে actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) হ'লে নামে রুচি আপনা থেকে আসে। নামীর সঙ্গে প্রণয় বাদ দিয়ে শুধু mechanically (যান্ত্রিকভাবে) নাম করলে বেশী কিছু হয় ব'লে আমার মনে হয় না। তবে, নাম করতে গেলে নামীর দিকে নজর পড়েই। আর, নামের সঙ্গে আছে আমাদের সত্তার যোগ। তাই, নাম করতে-করতে মন সত্তামুখী হয়, কারণমুখী হয়, উৎসমুখী হয়। নাম যত করা যায়, তত নামের উপর লোভ বাড়ে,—সে দুর্নিবার আকর্ষণ ত্যাগ করা যায় না, ক্রমাগত আরো গভীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে। ইষ্টচিন্তা, ইষ্টকথা, ও ইষ্টকর্ম্ম এই নিয়ে মগ্ন থাকতে ভাল লাগে। তখন আসক্তির বিষয়ই হন ইষ্ট। এই আসক্তি প্রবৃত্তি-আসক্তির থেকে অনেক প্রবল। তবে, মাঝে-মাঝে একটা নীরস ভাবও আসে, ভিতরটা যেন শুকিয়ে যায়, নামে রস পাওয়া যায় না। তখনও কিন্তু জোর ক'রে নাম চালাতে হয়, লেগে থাকতে হয়, লেগে থাকতে-থাকতে আবার ঠিক হ'য়ে আসে। Depression (অবসাদ)-এর পর অনেক সময় বন্যার মত আবেগ আসে। তাই, পোঁ ধ'রে থাকতে হয়। কারণ, তাঁকে যে আমার চাই-ই, তাঁকে বাদ দিয়ে জীবন যে অচল! মানুষ জীবনে যত যা-ই করুক, কোনটাই সার্থকতা লাভ করে না, যতদিন সে ইষ্টকে কায়মনঃপ্রাণে ভালবাসতে না পারে। ভালবাসার ধাঁজে চলতে-চলতে ভালবাসাটা স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। সেই বুদ্ধিই সার বুদ্ধি—যে-বুদ্ধি মানুষকে ইষ্টে একান্ত ক'রে তোলে। একেই বলে অব্যভিচারী ভক্তি। ইষ্টকে যদি আমার সুখ-সুবিধার জন্য ডাকি, আমার সুখ-সুবিধার জন্য ভালবাসি, তাহ'লে সেটা হ'ল ব্যভিচারী ভক্তি। তাঁর জন্য তাঁকে

যে ভালবাসে, সে ধন্য হ'য়ে যায়, পবিত্র হ'য়ে যায়। তার ভিতর আর কোন কলুষ বা মালিন্য থাকে না। তাই গীতায় আছে, 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্য-ভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবসিতো হি সঃ'। অনন্যভাক্ বলতে আমি বুঝি —একমাত্র তাঁকেই ভজনা করে যে এবং সে শুধু তাঁরই জন্য। প্রাণ যার কেঁদে ওঠে তাঁর জন্য, সে-ই এটা পারে। কত সাধু-পুরুষ পারে না, আবার হয়তো পাপী-তাপী লহমায় পেরে যায়। যে পারে সে-ই ভাগ্যবান্।

২৩শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫০ (ইং ৭।৫।১৯৪৩)

ইদানীং আশ্রমের উপর বিরুদ্ধ পরিবেশের নিদারুণ অত্যাচার চলেছে। অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, আততায়ীর আক্রমণ, গৃহদাহ ইত্যাদি নানা উপায়ে তারা আশ্রমবাসীদের জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলছে। আবালবৃদ্ধবনিতাকে দিবারাত্র সন্ত্রস্ত থাকতে হয়—কখন কোন্ আপদ্ ঘটে। পুরুষ-ছেলেদের সারারাত জেগে আশ্রম পাহারা দিতে হয়। মায়েরাও শিশুসন্তানদের নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন। ভয়ে ও উদ্বেগে তাদের ঘুম আসে না। দিনের পর দিন এইভাবে চলেছে। সম্প্রতি তপোবনের একটি দুঃস্থ ছাত্রকে (তার নাম জ্ঞান, বাড়ী ফরিদপুর জিলায়, বিধবার একমাত্র সন্তান) সন্ধ্যার অন্ধকারে জনৈক আততায়ী গুরুতরভাবে ছুরিকাঘাত করে। তার এখন জীবন সংশয়, পাবনার সরকারী হাসপাতালে আছে। নিরাপরাধ, নিরীহ, নিরাশ্রয় আশ্রম-বালকের এই জীবনমরণ-সন্ধিক্ষণে আশ্রমের সকলেই আজ অপরিসীম বেদনা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় অস্থির। শ্রীশ্রীঠাকুর যে কী অব্যক্ত যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত অতিবাহিত করছেন, তা' ব'লে বোঝান যায় না। তাঁর মুখখানি বিষাদ-মলিন। বার-বার হাসপাতালে লোক পাঠাচ্ছেন আর জ্ঞানের খবর নিচ্ছেন। বিকালে প্রমথদা (দে) এসে খবর দিলেন—জ্ঞানের অবস্থা খারাপ! শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় ব'সে ছিলেন। মুখখানি মুহূর্ত্তে যেন পাণ্ডুর হ'য়ে গেল। একটুক্ষণ চুপ ক'রে থাকলেন। পরমুহূর্ত্তে সুরেন ডাক্তারদাকে ডেকে বললেন—দেখ্, যদি কোনরকমে বাঁচাতে পারিস। দরকার হ'লে হাসপাতালের অনুমতি নিয়ে বাইরের বড় ডাক্তার হাসপাতালে নিয়ে যাবি। যমে-মানুষে টানাটানি ক'রে কোনভাবে ওর জীবনটা যদি রক্ষা করতে পারিস, তাহ'লে একটা মস্ত কাজ হয়। ওর যদি এমন-তেমন হয়, ওর মাকে আমি কী বুঝ দেব? কত আশা ক'রে আশ্রমে রেখেছে ছাওয়াল মানুষ হবে ব'লে! আর আজ তার এই অবস্থা ক'রে দিল! নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আবার আর্ত্তভাবে বলতে লাগলেন—ভগবান্, আমি কী পাপ করেছি, যার ফলে এত

কষ্ট পাচ্ছি !…সবাই নিজের দাঁড়ায় দেখে, নিজের দাঁড়ায় ভাবে, নিজের দাঁড়ায় বোঝে। আশ্রমের জমিজমা, লোক-লস্কর বাড়ছে দেখে আশ্রমকে হিংসা করে, আশ্রমকে হতবল করতে চায় অত্যাচার ক'রে। যেন আশ্রম তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। আশ্রমের উন্নতি হ'লে যেন তাদের ক্ষতি হবে। কিন্তু আশ্রম যা' করে তা' যে সবার অস্তিত্বের দিকে চেয়ে, এ-কথাটা আর বোঝে না।…আশ্রমকে যারা বিপন্ন করতে চেষ্টা করছে, তারা যে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মারছে, সে-কথাটা তারা আজ না বুঝলেও বুঝবে একদিন, কিন্তু যখন বুঝবে তখন হয়তো আর কোন প্রতিকারের পথ থাকবে না। কী জন্য যে কী করতে চাই, কেউ বোঝে না। সঙ্কীর্ণ স্বার্থে দৃষ্টি আচ্ছন্ন থাকলে farsightedness (দূরদৃষ্টি) খোলে না, আর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে যে ব্যক্তিগত স্বার্থের কী যোগ তাও ধরতে পারে না। মানুষ নিজেই নিজ-জীবনের বিরুদ্ধে শত্রুতা করলে তাকে বাঁচাবে কে? আর, দেশ-কাল-পরিস্থিতি যা' তাতে সব কথা খুলে বলায়ও বিপদ্ আছে। কী বিপর্য্যয় যে সারা দেশের উপর অশনি-সম্পাতের মত অনিবার্য্য বেগে এগিয়ে আসছে. আর তার প্রতিকারই বা কী, তা' বললেও মানুষের মাথায় ধরে না, নিজেদের প্রবৃত্তি-অনুযায়ী একটা কুটিল, বিকৃত উদ্দেশ্য আরোপ ক'রে কাজ পণ্ড করার চেষ্টা করে। মন্ত্রগুপ্তি ছাড়া কাজও হয় না। আমার হয়েছে মহাজ্বালা। জেনে-বুঝে যদি প্রতিকারের চেষ্টা না করি, তাহ'লেও মর্ম্মপীড়া বোধ করি, আর প্রতিকার করতে যা' করতে হয় তা' করতে গেলেও, যাদের ভালর জন্য করতে চাই, তারাই শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। সেইজন্যই বোধহয় গীতায় আছে—'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব'। অর্থাৎ মানুষ যদি নিজ কর্ম্ম দিয়ে নিজের মৃত্যুজাল রচনা করে এবং তা' ভেদ করার পথ পেয়েও যদি তার সুযোগ গ্রহণ না করে, তাতে বিধাতার বিধিবশে মৃত্যুই তাদের অবধারিত হ'য়ে থাকে। এই সব কথা ভেবে মনে আর কিছুতেই শান্তি পাই না। দেখছি—যেভাবে চলছে, এইভাবে যদি চলে, মানুষের সুবুদ্ধির উদয় যদি না হয়, তাহ'লে শেষপর্য্যন্ত লোকসান আমারই।

এতক্ষণ কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখের ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হয়েছে। জ্ঞানের সম্পর্কে আবার বললেন—অনেক সময় বেশী হ'য়ে আবার ভালর দিকে যায়। কি বলব ডাক্তার? অনেক সময় এইরকম হয় না?

কিশোরীদা (দাস) জোরের সঙ্গে বললেন—খুব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজেকে প্রবোধ দেবার ভঙ্গীতে বললেন—হয়তো এরপর ভাল হ'য়ে যাবে। তোমারা সবাই চেষ্টা কর।

কিশোরীদা—চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন আপনার দয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা মুখ তুলে চান, তাহ'লে তো হয় !

এরপর পাশের গ্রামের কয়েকজন লোক এসে জানাল, তারা গত দু'দিন ধ'রে খেতে পায়নি, ছেলেপিলেরা বাড়ীতে অর্দ্ধাহারে আছে, মায়েদেরও প্রায় উপোস চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে তখন-তখনই কিশোরীদাকে একটা ব্যবস্থা করতে বললেন।

আজকাল প্রায়ই এইরকম বুভুক্ষু লোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে হানা দিচ্ছে। এদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কিশোরীদাও আশ্রম থেকে ভিক্ষা ক'রে যতদূর পারেন ঠেকাচ্ছেন। কিন্তু আশ্রমের সব বাড়ীতে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ে না।

তাই কিশোরীদা বললেন—আশ্রমের মধ্যে বাড়ীতে-বাড়ীতে আমি তো বার-বার ক'রে যাচ্ছি, আর যাবও। কিন্তু অনেক বাড়ীর খবর আমি যা' জানি, তাতে সে-সব বাড়ীতে যাওয়া চলে না। তাই, বাইরে থেকে সাহায্য আনার ব্যবস্থা না হ'লে শুধু আশ্রমের লোকের উপর দাঁড়িয়ে সব ঠেকান যাবে না। আর, সবার একটা ধারণা—আশ্রমে এসে আপনার কাছে দাঁড়াতে পারলে অন্ততঃ কিছু সাহায্য পাবেই ; তাই অন্য কোথাও না যেয়ে এখানেই চ'লে আসে। অনেকের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর ঘরে ধানচালের অভাব নেই, কিন্তু সেখানে যাবে না, আসবে এখানে। আশ্রমের লোক কী অবস্থার ভিতর থেকে যে দেয়, তা' আর বোঝে না। শুধু আপনার মুখ চেয়ে দেয়। তাদের অবস্থা কম সঙ্গীন নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাব-অভিযোগ ও কষ্ট সত্ত্বেও যে অভাবীকে দেয়, এটা একটা কম কথা নয়। পরিবেশকে বাঁচাবার বুদ্ধি যাদের এত প্রবল, তারা পরমপিতার দয়ায় টিকে থাকবেই ! ঐ আগ্রহই তাদের চেষ্টাশীল ক'রে রাখবে, সক্ষম ক'রে তুলবে। সম্পদ্ তো চারিদিকে ছড়ান আছে, যাদের চেষ্টা আছে তারা তা' কুড়িয়ে নিতে পারে। তাই, আমি মানুষকে শূন্য করে রাখি, যাতে আমেজ পেয়ে আলসে হ'য়ে না পড়ে, অনবরত করার তালে থাকে। নিশ্চিন্ত আরামে থাকতে মানুষের ভাল লাগতে পারে, কিন্তু তাতে ভাল হয় না। আদর্শাভিমুখী সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাশীলতা ও কর্ম্মতৎপরতা যত বাড়ে, ততই মানুষ লাভবান্ হয়। ক্ষমতা থাকলে মহা-দুর্দ্দৈবের মধ্যে প'ড়েও মানুষ অক্ষত থাকে, এমন কি তার ভিতর-দিয়ে আরো পটু ও পারগ হয়ে ওঠে।...... বাইরে থেকে চাল সংগ্রহের কথাও তো আমি ভাবছি। এই-সব হাঙ্গামা না হ'লে এতদিনে তো অনেকখানি ক'রে ফেলতে পারতাম। কিছু কি আমার করবার জো আছে ? Profitable (লাভজনক) কিছু করতে গেলেই নানা হাঙ্গামা শুরু ক'রে দেয়। আমার যে কী জ্বালা সে আমার অবস্থায় না-পড়লে কেউ বুঝবে না। যাদের ভালর জন্য এগিয়ে যেতে চাই, তারাই চলার পথ বন্ধ ক'রে দেয়। তাই ব'লে এ-কথা

কখনও বলতে পারি না—তোরা যখন আমাকে করবার সুযোগ দিলি না, তখন আমি আর কী করব? যখনই ভাবি, সবাই মিলে বেকায়দায় পড়বে, তখন তার প্রতিবিধান না করতে পারলে আমাতে যেন আর আমি থাকি না। যাক্, কাল হীরালালের আসবার কথা আছে কলকাতা থেকে। হীরালাল আসুক। চাল পরমপিতার দয়ায় জুটে যাবিনি। তুমি ভা'বো না ডাক্তার! এই ক'টা দিন চালায়ে দেও কোন রকমে।

কিশোরীদা (স্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে)—চালানেওয়ালা যে সেই চালাবি, আমার ভাবনা কী? আমি ক'রে যাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জয়গুরু জগন্নাথ! এইবার লাঠি বগলে ক'রে বারায়ে পড়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রমুখকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—বড় খোকার যে এতখানি ক্ষমতা আছে তা' আমার জানা ছিল না। পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার জন্য ও যেমন বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও কৌশলের সঙ্গে অগ্রসর হ'চ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সুফল ফলা অসম্ভব নয়। এই-সব কাজ করতে গেলে আবার ভাল hands (সহকারী) লাগে। না হ'লে কাজের সুবিধা হয় না। ব্যাপারগুলি সুরাহার দিকে এসেও আবার কেঁচে যায়। সর্ব্বত্র নিজে গেলেও ভাল হয় না। সবাইকে আবার নিজের কাছে পাওয়াও যায় না। তাই দৌত্য করবার জন্য ধীর, স্থির, চতুর, মিষ্টভাষী অথচ উদ্দেশ্যে অমোঘ এমনতর লোক চাই। শয়তান-প্রকৃতির লোক যারা, তাদের tactfully deal (সুকৌশলে পরিচালনা) করতে পারে, এমন ধরনের লোকের খুব অভাব। কিন্তু শয়তান আসন বিছিয়ে রয়েছে সর্ব্বত্র, ভাল করতে গেলেও অনাহূত বিপদ্-আপদ্, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা অনিবার্য্য। এগুলিকে অবশ্যম্ভাবী ধ'রে নিয়ে প্রতিকারের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত হওয়া লাগে। পরিবেশের থেকে কী কী বাধা, বিঘ্ন ও আঘাত আসতে পারে এবং ভবিষ্যতেও বা কী অবস্থা দাঁড়াতে পারে, তা' আমি আগে থেকেই ভাল করে এঁচে নিতে পারি। এবং তা' অনেকখানি minimise করা (কমান) যায় কিভাবে, তাও বুঝি। তবে, সেই কাজের জন্য যে-ধরনের লোকের প্রয়োজন, সেই ধরনের লোকই আমাদের মধ্যে বিরল। পরাধীন অবস্থায় দীর্ঘদিন পরের protection-এ (রক্ষণে) আরামে ও শান্তিতে আছি; যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ, অরাজকতা, ষড়যন্ত্র, সঙ্গীন ও সঙ্কটজনক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদিকে কৌশলে আয়ত্তে আনার কায়দা অনুশীলন করবার দরকার আমাদের হয়নি, আর সে training (শিক্ষা)-ও আমরা পাইনি। প্রকৃতি বুঝে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ইত্যাদির প্রয়োগে কেমন ক'রে

লোককে সুশৃঙ্খল, সংযত ও বাধ্য ক'রে রাখতে হয়—সে অভিজ্ঞতাও আমাদের নেই। তাই, আমরা পদে-পদে ঠেকে পড়ি। দুষ্ট প্রকৃতির লোক সমাজে আছে ও থাকবেই। তারা আবার নিরীহ লোকদের বিভ্রান্ত ক'রে তাদের ক্ষেপিয়ে নিজেদের অসদুদ্দেশ্য হাসিল করে। এমন ব্যবস্থা ক'রে রাখা লাগে যাতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকগুলি সমাজের ক্ষতি করতে না পারে। অর্থাদির ব্যবস্থা ক'রে বা কাজকর্ম্মে engaged (ব্যাপৃত) রেখে, বা টের না পায় এমনতরভাবে চারিদিকে বেড়াজালের সৃষ্টি ক'রে যদি তাদের ক্ষতি করার প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব ক'রে রাখা যায়, এবং তাদের মধ্যে ভাল যা' ছিটেফোঁটা আছে তা' বাড়িয়ে তোলা যায়—তাতে সমাজের প্রভূত উপকার হয়। কতরকম কাণ্ড যে করা লাগে, তার কোন লেখাজোখা নেই। বড় খোকার রকম যা' দেখি, তাতে মনে হয় ওর ঐ instinct (সংস্কার) আছে।……আমার ছেলেবেলা থেকে কেমন একটা ঝোঁক—মানুষ সাধারণতঃ যা' অসম্ভব মনে করে, তাকে কেমন ক'রে সম্ভব ক'রে তোলা যায়। একজন হয়তো অত্যন্ত বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাকেই বন্ধু ক'রে তোলা চাই আমার। এ-সব যে আমি কত করেছি, তার ঠিক নেই। এতে কোন কষ্টই আমার কষ্ট মনে হয় না। এটা যেন একটা sport (খেলা), জিততেই হবে আমাকে। এ জেতা জোরের জেতা নয়, ভালবাসার জেতা। সেও সুখী হবে, আমিও সুখী হব। তবে, এক-একজন থাকে অত্যন্ত বেয়াড়া প্রকৃতির, কুকুরের লেজ সোজা করার মত, সব সময় তোয়াজ ক'রে ধ'রে রাখতে হয় তাদের। পানের থেকে চুন খসলে হয়তো ছোবল মারবে। শুধু বাইরেই যে এমনতর লোক আছে তা' নয়, ভিতরেও এমনতর লোকের অভাব নেই। আপনারা এইগুলি বুঝে-সুঝে চক্ষুষ্মান হ'য়ে চলতে শেখেন, তাহ'লে আমি একটু স্বস্তি পাই। সবাই নাবালকের মত হ'য়ে থাকলে মুশকিল আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আর-একবার জ্ঞানের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। বঙ্কিমদা বললেন—যারা হাসপাতালে গেছে, তাদের কেউ এখনও ফেরেনি।

২৪শে বৈশাখ, শনিবার, ১৩৫০ (ইং ৮। ৫। ১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-নিবাসে আছেন। হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী) এসেছেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুরকে খবর দেওয়া হ'ল। বললেন—এখানেই নিয়ে আয়, এখানেই কথা বলার সুবিধা হবে।

হীরালালদা এসে প্রণাম করতেই সস্নেহে বললেন—তুমি এসে গেছ, খুব ভালই হইছে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, এই-ই কাজ করার খুব ভাল সময়। আশপাশের কিছুলোক যা' উৎপাত আরম্ভ করিছে, তাতে তেষ্ঠানই দায়। আশ্রমের জীবনে এ

নূতন নয়। এ লেগেই আছে। কিন্তু বহুলোক না খেতে পেয়ে নিত্যই তোমাদের দ্বারস্থ হ'চ্ছে, একদিকে অত্যাচার, আর-একদিকে দলে-দলে ক্ষুধার্ত্ত ও নিরন্নের ভিড়। এতে বোঝা যায়—কিছুলোক ঈর্ষ্যাপীড়িত হ'য়ে তোমাদের উৎখাতের জন্য চেষ্টা করলেও, সাধারণ লোক তোমাদের বান্ধব ব'লেই মনে করে এবং বিপদে-আপদে তোমাদের কাছেই সাহায্যের প্রত্যাশা রাখে। এই সময় তাদের বাঁচানই লাগে—সে যেমন ক'রেই হোক। এখানকার অবস্থা তো জান, আমার তফিল হ'লে তোমরা। তোমরা সবাই বেঁচে-বর্ত্তে থাকলে, সুস্থ থাকলে, কর্ম্মঠ থাকলে, চলৎশীল থাকলে কিছুরই অভাব নেই। তাই মণি! আমি কই, হাজার মণ চাল তুমি তাড়াতাড়ি যোগাড় ক'রে পাঠায়ে দেওগে।

এই দুর্দ্দিনে হাজার মণ চাল সংগ্রহের কথা শুনে হীরালালদা একটু ভাবতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই উৎসাহ দিয়ে বললেন—মাথায় দায়িত্ব নিয়ে চেষ্টা করতে পারলে —হ'য়েই আছে। তুমি নেমে পড়। করব, করতেই হবে—এই বুদ্ধি মাথায় আসলে করার পথ খুলে যাবে।

হীরালালদা—আপনি যখন বলেছেন, করতে হবে—এটা ঠিকই। কিন্তু কিভাবে কী করব তাই ভাবছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষিত হোক, অদীক্ষিত হোক, ভাল-ভাল লোকের কাছে যাবে। আলাপ-ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠবে। মনে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না রেখে আত্মীয়ের মত আবদার ক'রে চাইবে। তুমি যদি আপন ক'রে নিতে জান, তাহ'লে দুনিয়া কিন্তু তোমার আপন হবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আছে। আমরা মানুষকে পর ভাবি, তাই তারাও পর হ'য়ে থাকে। আপন ভাবতে হয় মানুষকে, আপনের মত ব্যবহার করতে হয়, আপনজন যেমন করে, তেমনি করতে হয়—সম্মান-যোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে। যেই তুমি কোন মানুষকে আপন ক'রে নিলে, যেই তুমি তার আপন হ'য়ে উঠলে, সেই তোমার আবদার পূরণ ক'রেও তার তৃপ্তি। ভাই যে ভাইয়ের কাছে আবদার করে, ছেলে যে বাপের কাছে আবদার করে, এতে কিন্তু উভয়ের ভাল লাগে। আর, তুমি যে মানুষের কাছ থেকে নেবে, তাতে তাদেরও কল্যাণ। শ্রেয়ার্থে, লোকের অস্তিত্ব-রক্ষার্থে মানুষ যদি কিছু দেয়, তাতে সে নিজেই উপকৃত হয় সব চাইতে বেশি। বৃহত্তর পরিবেশকে বাদ-দিয়ে কেউ একক নিজের অস্তিত্ব বেশিদিন বজায় রাখতে পারে না। ঘরে-ঘরে গিয়ে মানুষকে এই কথাটাই বোঝাতে হবে যে, তুমি যদি বাঁচতে চাও, তবে তোমার পরিজন, পরিবেশকে বাঁচাবার ব্যবস্থা কর আগে।

প্রফুল্ল—যারা অনাহারের সম্মুখীন হয়, তাদের নিজেদের তো দোষ থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-দোষের প্রতিকার যদি করতে হয়, তবে তাকে দু'টো খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তারপর করতে হবে। গোড়ায়ই যদি বিচার করতে বস, তাহ'লে তার জান টিকবে না। সে যদি প্রাণেই না বাঁচে, তবে কার সংশোধন করবে? আর, আমি নিজে ঐ অবস্থায় পড়লে আমি কী চাই তাই দেখতে হয়। সবটা নিজের উপর ফেলে ভাবতে হয়। আমার হাতে উপায় থাকতেও আমি যদি আমার সামনে কোন-একটা মানুষকে সাবাড় হ'য়ে যেতে দিই, তাহ'লে কিন্তু আমার সাবাড় হওয়ার পথও অতখানি প্রস্তুত ক'রে রাখলাম। পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা ছাড়া কেউই কিন্তু ভাল থাকতে পারে না। পরিবেশের পাপেও মানুষ কম দুর্ভোগ ভোগে না। তোমাদের উপর আজ যে অযথা উৎপীড়ন চলেছে, তাতে যদি কেউ মনে করে—এর পিছনে ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে, চলুক এমনতর—তাহ'লে কি তোমাদের ভাল লাগে? সংহতি, দরদ ও পরাক্রম—সবই জাতির ভিতর-থেকে ধীরে-ধীরে উবে যাচ্ছে। তাই, প্রত্যেকটা মানুষই আজ নিজেকে মনে করে অসহায় ও একক। এইরকম অবস্থায় মানুষ হতাশ হ'য়ে পড়ে, কেউই বুকে বল পায় না। আগে অসৎরা সতের উপর পীড়ন করলেও বাইরের দশজন সৎলোক মিলে তার প্রতিবিধানের জন্য রুখে দাঁড়াত। এখন একজন নিষ্পেষিত হ'য়ে গেলেও আর পাঁচজনে দাঁড়িয়ে মজা দেখে—কথা কয় না। যারা একটু ভাল, তারা বড় জোর আহা-উহু করে, কিন্তু কাজে কিছু করে না। আর করবেই বা কী। ভাল লোকগুলি যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, তাই হীনবল,—কিছু করণীয় ব'লে বুঝলেও করতে সাহস পায় না। ভাবে, দুষ্ট লোকদের ঘাঁটিয়ে পরে বিপদে প'ড়ে যাব, চুপচাপ থাকাই ভাল। নিজেরা যদি সংহত না হয়, তাহ'লে প্রত্যেকেই যে সাবাড় হ'য়ে যাবে, এ-কথাটা আর ভাবে না।

হীরালালদা—টাকা বরং যোগাড় হ'তে পারে, কিন্তু এই বাজারে কলকাতায় চাল যোগাড় হওয়া তো মুশকিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা টাকা দেয়, তাদের কাছ-থেকে টাকাই নেবা। সেই টাকা দিয়ে চাল কিনে পাঠাবা।

হীরালালদা—টাকা যদি এখানে পাঠিয়ে দিই, এখান থেকে যদি চাল কিনে নেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি বোঝ না, ওখান থেকেই চাল পাঠান লাগে। সব কথা ভেঙ্গে বলা ভাল না, ওখান থেকে চাল আসলে তার একটা আলাদা effect (ফল) হয়। তোমরা যে অসাধ্যসাধন করতে পার, সে কথাটা মানুষের জানায় লাভ আছে। হাজার

মণ চাল কলকাতা থেকে আমদানী ক'রে ফেল, তারপর দেখো কাণ্ডটা কী হয়! শত-শত অভাবী লোক খেয়ে তো বাঁচবেই, তাছাড়া local situation (স্থানীয় পরিস্থিতি)-ও পালটে যাবে। কতকগুলি মানুষ অন্ততঃ স্বার্থের খাতিরেও আপাততঃ নিরস্ত থাকবে।

হীরালালদা—আপাততঃ কেন বলছেন? এই দুর্দ্দিনে মানুষকে যদি আপনি খাইয়ে বাঁচান তাহ'লে তারা চিরকালই তো তা' স্মরণ করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল instinct (সংস্কার)-ওয়ালা মানুষ যা'রা, তাদের পক্ষে তাই স্বাভাবিক। কিন্তু অনেকেরই instinct (সংস্কার) খারাপ। তারা লাখ পেলেও সে-কথা ভুলে যায়। কোন্ মুহূর্ত্তে যে কে বেঁকে দাঁড়াবে তার কিছুই ঠিক নেই। তবে, আশু এটার সমূহ প্রয়োজন আছে, এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় তাই ভাল। তুমি কলকাতায় যেয়ে টাকাও যোগাড় কর, আর কোন চালের আড়তদারের সঙ্গে এমন ব্যবস্থা কর যাতে ন্যায্য মূল্যে সে তোমাকে প্রয়োজনমত চাল সরবরাহ করে। তাকে ব'লে-ক'য়ে যতখানি সুবিধা ক'রে নিতে পার তার চেষ্টাও করবা। দেরি হ'লে কিন্তু ফসকে যাবে, আর পারবা না। চালই অমিল হ'য়ে যাবে। তুমি কলকাতায় যেয়ে সবারই সাহায্য ও সহযোগিতা নেবা, কিন্তু দায়িত্ব জানবা তোমার একার উপর। দশ জনে মিলে যতটুকু পারলাম ততটুকু করলাম, এইরকম irresponsible responsibility (দায়িত্বজ্ঞানহীন দায়িত্ব) হ'লে কিন্তু হবে না। আর, চাল-আনার পারমিট ও ওয়াগন-যোগাড় ইত্যাদিও করবা সঙ্গে সঙ্গে। সব দিক্ নজর থাকে যেন। আটঘাট বেঁধে কাম করবা। উপায়, অপায়, সব-দিক্ চিন্তা করবা, কোন দিক্-দিয়ে ফাঁক যেন না থাকে। পরে যেন এ-কথা না-শুনি—ও যা! এইজন্য হ'ল না। এইটে হাসিল কর, দেখ—এর ভিতর-দিয়ে তুমি কতখানি বেড়ে উঠবে। আর, সব নিজে করলেও বাহবা দেবে কিন্তু অন্যকে। তোমার কৃতিত্ব যেন সবাই নিজের কৃতিত্ব ব'লে উপভোগ করতে পারে, তাহ'লে তোমার দায়িত্বকেও মানুষ নিজের দায়িত্ব ব'লে ভেবে তা' উদ্‌যাপনে উদ্যমী হ'য়ে উঠবে।

হীরালালদা—আমার ছুটি নিতে পারলে সুবিধা হ'ত, কিন্তু অফিস থেকে ছুটি দেবে কি না সন্দেহ। তাই, অন্ততঃ প্রফুল্লদা ও কিরণদাকে যদি আমাকে কিছুদিনের জন্য দেন, তাহ'লে আমার কাজের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা যদি ছাড়ে, যাবে। কিন্তু ওরা যদি না-ও যেতে পারে, তুমি যেমনভাবে পার, করবাই কিন্তু! কারও অপেক্ষায় থাকবা না। কি বল, আমার কথা বুঝলে তো?

হীরালালদা—আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার আশীর্ব্বাদে পারব ব'লেই ভরসা রাখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মহাখুশী হ'য়ে)—এই তো কথা! সোনামুখে চাঁদের কথা! বামুনের পোর মত কথা! ঋত্বিকের মত কথা! 'জয়গুরু দয়াল' ব'লে হাত দু'খানি জোড় ক'রে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মনে-মনে কি যেন বললেন।

হীরালালদা আবেগবিহ্বল হ'য়ে প্রণাম করলেন।

২৬শে বৈশাখ, সোমবার, ১৩৫০ (ইং ১০।৫।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে নিভৃত-নিবাসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কাল বিকালে বিশ্ববিজ্ঞানে আশ্রমের অনেককে নিয়ে একটা বৈঠকমত করা হয়েছিল। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয়-সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হবে—সে-সম্বন্ধে সকলেই একমত ও সংকল্পবদ্ধ। আপনি যে কতদিন আগে থেকে স্বস্তিসেবকের কথা বলছিলেন, অবস্থার চাপে প'ড়ে এবার যেন সবাই সে-সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠেছে। সঙ্ঘ-চেতনাও দানা-বেঁধে উঠছে। এখন এই ভাবটা থাকলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপদও আমাদের সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলতে পারে—যদি আমরা সেটাকে কাজে লাগাতে পারি। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প'ড়ে শিখজাতি কেমন দুর্দ্ধর্ষ হ'য়ে উঠেছিল, সে তো জানেন। তবে, সবাইকে একতাবদ্ধ করতে যেয়ে,—ওদের ভিতর-থেকে যে বর্ণাশ্রম তিরোহিত করা হয়েছিল, তার ফল কিন্তু ভাল হয়নি। যা' শুনি তা'তে মনে হয়, আজকাল ওদের মধ্যে অনেকখানি deterioration (অধঃপতন) এসে গেছে। আপনাদের যে স্বস্তি-সেবকদল সংগঠনের কথা বলেছি, সেটা কিন্তু কোন reactionary (প্রতিক্রিয়ামূলক) ব্যাপার নয়। নিজেদের ও পরিবেশের নিরাপত্তার জন্য নিজেরা যদি প্রস্তুত না হই, ও-ব্যাপারে যদি পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকি, তাহ'লে অতখানি খাঁকতি থেকে যায়। জাতির মধ্যে প্রয়োজনীয় কোন-রকম গুণ বা দক্ষতার অনুশীলন যদি না হয়, তবে ঐ রন্ধ্র দিয়ে শনি ঢুকে যেতে পারে। অনেক গুণ থেকেও সামান্য গুণের অভাবে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হ'য়ে যেতে পারে। তাই ক্ষাত্র-গুণের চর্চ্চার উপর আমি জোর দিতে বলি। ক্ষাত্রিয়োচিত সংস্কার-সম্পন্ন যারা, তারা এটা বেশি ক'রে করবে। কিন্তু অন্যেরাও বাদ দেবে না। প্রত্যেক বর্ণ নিজেদের বর্ণোচিত গুণের অনুশীলনটাকে প্রধান রেখে,—অন্যান্য বর্ণের গুণের অনুশীলন যদি কিছু-কিছু করে, তাহ'লে চৌকস হ'য়ে ওঠার পক্ষে সুবিধা হয়। তাছাড়া সাহস, পরাক্রম ও বীর্য্যের অভ্যুদয় যদি না হয়, মানুষ যদি ভীতু ও কাপুরুষ হ'য়ে থাকে, অত্যাচার,

অবিচারের বিরুদ্ধে যদি রুখে না-দাঁড়াতে পারে, তবে তার মনুষ্যত্বই অনেকখানি ম্লান হ'য়ে যায়। সেইজন্য স্বস্তিসেবকদের কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় সেবার জন্য যেমন প্রস্তুত হ'তে বলেছি, নিরাপত্তামূলক সেবার জন্যও তেমনি প্রস্তুত হ'তে বলেছি। এটা যে শুধু একটা সাময়িক প্রয়োজন তা' নয়, এটা চিরন্তন প্রয়োজন।

কেষ্টদা—বহু ব্যাপারে আমরা continuity (ক্রমাগতি) বজায় রাখতে পারি না। এর প্রতিকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন সদভ্যাস মজ্জাগত না-হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য অনুশীলন করতে হয়, একটা দিনও বাদ দিতে নেই। অভ্যাস একবার শিকড় গেড়ে গেলে তখন আর না-ক'রে পারা যায় না। তার আগ-পর্য্যন্ত ভাল লাগুক আর না-লাগুক, জোর ক'রে করলেও রোজ করতে হয়। রোজ শোবার আগে ভাবতে হয়—আজ এই-এইগুলি করেছি কি না। যদি দেখা যায়, বিশেষ কোন-একটা করা হয়নি, তখন তার যতটুকু করা সম্ভব করতে হয়। বাদ দিলেই ঢিলে হ'য়ে যায়। পরে মন থেকেই উবে যায়। নূতন কোন অভ্যাস করতে গেলে—সেটা খাতায় লিখে রাখা ভাল যে এটা আমার নিত্য অবশ্যকরণীয়। রোজ খাতা খুলে মিলিয়ে দেখতে হয়, যাতে অবশ্যকরণীয়ের কোনটা বাদ না-পড়ে। ভাল সঙ্গী যদি কেউ থাকে, তাকেও ব'লে রাখতে পারেন স্মরণ করিয়ে দিতে। হয়তো সুষমা-মা বা সুধাকে ব'লে রাখলেন। ঐগুলি বজায় রাখতে যেয়ে আবার আগন্তুক করণীয়গুলি বাদ দেবেন না। যত করবেন, ততই nerve (স্নায়ু)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে। হাজারো রকমের কাজের মধ্যে থেকেও বিব্রত বোধ করবেন না মোটেই। মানুষের capacity (ক্ষমতা) যে কী-পরিমাণ বাড়ান যেতে পারে,—তার কোন ইয়ত্তা নেই। একটা মানুষ ৫০ জন মানুষের কাজ করতে পারে। দক্ষতা যেমন বাড়ে, ক্ষিপ্রতাও তেমনি বাড়ে। শুধু আপনার একার এমন হ'লে হবে না,—আপনার আশপাশের যারা তাদেরশুদ্ধ এমন হওয়া চাই। যে-যে বিষয়ে নিত্য culture (অনুশীলন) করবার, সে-সব বিষয়ে তারা নিত্য culture (অনুশীলন) করছে কিনা, এবং progress (উন্নতি) কেমন হ'চ্ছে, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখবেন। আপনি নিত্য শ্যেন দৃষ্টি না-রাখলে—তাদের continuity (ক্রমাগতি) হয়তো break ক'রে (ভেঙ্গে) যাবে। সবার possibility (সম্ভাব্যতা) সমান নয়। যাকে দিয়ে যতটুকু হয়, ততটুকুই লাভ। তবে, নিজে খুব অতন্দ্র থাকা লাগে। নিজে ষোল আনা করলে,—সঙ্গের যারা, সেই আওতায় প'ড়ে কিছু-না-কিছু না-ক'রেই পারে না।

কেষ্টদা—অনেকেরই নিজেকে গঠন করবার বালাই নেই। খেয়ে-প'রে সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই খুশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unfoldment of the being (সত্তার বিকাশ) না-হ'লে সুখ কোথায় ? মানুষ যত অনুরাগমুখর তপস্যায় ব্যাপৃত থাকে, ততই তার ভিতরের অজ্ঞাত কন্দর উদ্ভাসিত হ'য়ে বোধের রাজ্যে ধরা দেয়। এই যে নিত্যনূতন আত্ম-পরিচয়, এতেই তো মানুষের সুখ। এই সুখের কাছে খাওয়া-পরার সুখ কোথায় লাগে ? তপস্যার মধ্যে ফেলে এই সুখের স্বাদ যদি ধরিয়ে দিতে পারেন,—তখন right instinct (খাঁটি সংস্কার)-ওয়ালা যারা, তারা অন্ততঃ নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইবে না। তবে মানুষকে চেতিয়ে রাখাই লাগে,—নইলে অজ্ঞাতসারে তামসিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করে।

কেষ্টদা—অনেককে তো আওতার মধ্যেই পাওয়া যায় না ; মনে হয় যেন এড়িয়ে থাকতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তা' অসম্ভব না। জড়তা যাদের ভাল লাগে, তারা সাধারণতঃ নিজেদের এমনতর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চায় না—যেখানে কঠোর কর্ম্ম অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ওতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করে। এক সময় ছিল,—অনেকে মহারাজের কাছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তত্ত্বকথা শুনত, কিন্তু আমার কাছে বেশি ভিড়ত না ; কারণ, ভয় ছিল—আমার কাছে আসলে কোন-না-কোন সক্রিয় দায়িত্বের মধ্যে প'ড়ে যেতে হবে ; অলস উপভোগে ব্যাঘাত ঘটবে। লোকে ধর্ম্মের নামে অনেক সময় একটা নিথর, নিষ্ক্রিয় তত্ত্বচিন্তার বিলাস নিয়ে থাকতে চায় ; কিন্তু তাতে মানুষের চরিত্রের গায় কতটুকু হাত পড়ে, এবং পরিবেশেরও বা কতটুকু কী হয় তা' বুঝতে পারি না। তত্ত্বটা জীবনের সর্ব্বস্তরের আচরণে নেমে আসা চাই। নচেৎ সে-তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধি না হ'লে তা' চরিত্রগত হয় না। চরিত্রগত না-হ'লে তা' চারায় না। তাই, আজ মানুষের মুখের বুলিতে ধর্ম্ম আছে, কিন্তু জীবনের চলনে তার কমই সাক্ষাৎ মেলে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর চাল-সংগ্রহ সম্পর্কে বললেন—আমি হীরালালকে সব ব'লে দিয়েছি। তা' সত্ত্বেও আপনি মাঝে-মাঝে তাকে এবং অন্য-সবাইকে চিঠি দেবেন। এখনই এনে ফেলা দরকার, এই কথাটা জোর দিয়ে লিখবেন। লিখে দেবেন—মন্তরের মত কাম ক'রে ফেলা চাই !

কেষ্টদা হেসে বললেন—আচ্ছা !

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুশীলদার কলকাতায় যাবার কথা আছে, সুশীলদা গেলে সুশীলদাও অনেকখানি করতে পারবে।

পরক্ষণেই জ্ঞানের খবর জিজ্ঞাসা করলেন।

কেষ্টদা—চেষ্টার তো ত্রুটি হচ্ছে না, এখন পরমপিতার দয়াই একমাত্র ভরসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবস্থা যখন ক্রমশঃ খারাপের দিকে যাচ্ছে, তখন কী হয় কওয়া যায় না।

কেষ্টদা—এমনিতেই তো খুব দুর্ব্বল। তা' সত্ত্বেও যেভাবে যুঝছে, সে কম কথা নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যমনস্ক হ'য়ে সম্মুখে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে বাইরে এসে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চিতে বসলেন। ভোলানাথদা (সরকার), পঞ্চাননদা (সরকার), সুবোধদা (সেন), রাজেনদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), ইন্দুদা (বসু), শশধরদা (সরকার), ঈষদা-দা (বিশ্বাস), জিতেনদা (চ্যাটার্জী), নিবারণদা (বাগচী), হরিদা (গোস্বামী) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন।

সুবোধদা—ঠাকুর! আপনি ভালবাসার উপর দাঁড়াতে বলেন, কিন্তু তাতে তো আত্মরক্ষা করা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা কখনও দুর্ব্বল নয়। ভালবাসা কখনও আত্মরক্ষায় অপারগ নয়। ভালবাসার সঙ্গে থাকে প্রবল পরাক্রম। একটা গরু তার বাছুরকে ভালবাসে। সেই বাছুরের কোন ক্ষতি যদি তুমি করতে যাও, তাহ'লে কিন্তু সে তোমাকে ছেড়ে দেবে না। আবার, তুমি তোমার ছেলেছে ভালবাস ব'লে তাকে কি শাসন কর না ? যাকে ভালবাসা যায়, তার ভালর জন্যই মানুষ তার উপর কঠোর হয়। যে-ভালবাসা দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিতে জানে, অথচ প্রয়োজনমত শাসন করতে পারে না— সে ভালবাসা ক্লীবত্বদুষ্ট। অবশ্য, মানুষের নিয়ন্ত্রণের জন্য খানিকটা প্রশ্রয়ও সময়-সময় দিতে হয়, কিন্তু দুর্ব্বলতাজনিত প্রশ্রয় দান এবং নিয়ন্ত্রণী কৌশল-হিসাবে সচেতনভাবে মাত্রামত প্রশ্রয় দান —এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে।

পঞ্চাননদা—ছেলেদের পড়াতে গিয়েও এ-ব্যাপারটা দেখা যায়। কোন-কোন শিক্ষক হয়তো একটু দুর্ব্বল প্রকৃতির, ছেলেরা ক্লাসে গোলমাল করলেও বেশী-কিছু বলেন না ; ভাবেন, বলতে গেলে কথা শুনবে না, গোলমাল আরো বেশী করবে, এই ভয়ে চুপ ক'রে থাকেন। শিক্ষকের এই দুর্ব্বলতা থাকলে ছেলেরা কিন্তু তা' টের পায় এবং তার সুযোগ নিতে ত্রুটি করে না। কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অনেক শিক্ষকও ক্লাসে একটু-আধটু গোলমাল অনেক-সময় হ'তে দেন ; তিনি জানেন—গম্ভীরভাবে একবার তাকালেই তো এ-গোলমাল থেমে যাবে, ছেলেদের সহজ চাঞ্চল্য একেবারে নষ্ট ক'রে দিয়ে লাভ কী ? আর যখনই বোঝেন, মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তখন সাবধান ক'রে দেন, এবং ছেলেরাও তাতে হুঁশিয়ার হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হয়ই। ব্যক্তিত্ব এমন একটা জিনিষ যে মানুষ তা' বোধ না ক'রে পারে না। আমি যে সচেতনভাবে প্রশ্রয় দেওয়ার কথা বলছিলাম, তার প্রধান জিনিষ হ'ল মানুষের ভালবাসা আকর্ষণ করা। একজন যদি অপরাধীও হয়, তবুও তার পরিবর্তন হ'তে পারে—যদি সে উপযুক্ত কাউকে ভালবাসে। আপনার সহানুভূতি ও সহনশীলতার ভিতর-দিয়ে আপনার প্রতি যদি তার ভালবাসা গজায়, তাহ'লে একদিন হয়তো এমন কাজ করতে চাইবে না—যাতে আপনি দুঃখিত বা ব্যথিত হন। ভয় দেখিয়ে হয়তো কোনভাবে দাবিয়ে রাখা যায়, কিন্তু তাতে পরিবর্ত্তন হয় না। অবশ্য, প্রশ্রয় দেওয়া মানে yield (আত্মসমর্পণ) করা নয়, উসকিয়ে তোলা নয়—স'য়ে-ব'য়ে মিষ্টিভাবে বুঝিয়ে দেওয়া।

হরিদা—যাদের কোনভাবেই পরিবর্ত্তন হবার নয়, তাদের যদি অন্ততঃ ভীতি-প্রদর্শনে দাবিয়ে রাখা যায় যাতে মানুষের ক্ষতি করতে না পারে, তাহ'লে সেইটুকুও তো লাভ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো করাই লাগে। যেখানে ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করার মত সুবিধা না থাকে, সেখানে মাঝে-মাঝে কিছু দান করতে হয়। পাবে—এই প্রত্যাশায় কিছুটা নরম থাকে। এরই সঙ্গে-সঙ্গে যদি profitable nurture (লাভজনক পোষণ) দেওয়া যায় ও ভাল environment-এ (পরিবেশে) actively engaged (সক্রিয়-ভাবে ব্যাপৃত) রাখা যায়,—তাহ'লে hardened criminals (পাকা অপরাধী) যারা নয় তাদের পরিবর্ত্তন আশা করা যেতে পারে। Sympathetically deal (সহানুভূতির সঙ্গে পরিচালনা) করলে দেখা যাবে, অনেকে অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপে এবং প্রলোভন ও উসকানির মধ্যে প'ড়ে অপরাধ করে। এবং যারা স্বভাবতঃই অপরাধ করে, তাদের ক্ষেত্রে ঐ অপরাধ-প্রবণতা একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মত হ'লেও তা' যে নিরাময় হবার নয়, তা' কিন্তু নয়! বিচারক যে, তার শুধু অপরাধের বিচার করলে হবে না, অপরাধী কেন অপরাধ করে তাও বিচার করতে হবে। অপরাধীর সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করা লাগবে—যাতে তার মনে অনুতাপ জাগে, এবং সে নিজেই নিজের দোষ স্বীকার করে ও দণ্ডগ্রহণ বা প্রায়শ্চিত্ত ক'রে শান্তি পেতে চায়। সংশোধনটাই কাম্য, শাস্তি কাম্য নয়।

নিবারণদা—শাস্তি কাম্য না হ'তে পারে, কিন্তু অপরাধী যদি শাস্তি না পায়, তাহ'লে অন্যে তো অপরাধ করতে উৎসাহিত হ'য়ে উঠবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সামাজিক ও পারিবেশিক ব্যবস্থাই এমনতর করা লাগবে যাতে মানুষ অপরাধ করবার সুযোগই কম পায়। সমাজে বিয়ে-থাওয়া যদি ঠিকমত হয়, মানুষের

শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবিকার ব্যবস্থা যদি সুষ্ঠু হয়, অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি যাদের ভিতর লক্ষ্য করা যায়, তাদের যদি এমনতর কাজকর্ম্ম দিয়ে এমনতর পরিবেশের ভিতর ফেলে রাখা যায়—যেখানে তারা ঐ প্রবৃত্তি-পরিচালনার সুযোগ কমই পায়, তাহ'লে কিন্তু শাস্তি না-দিয়েও তাদের সংশোধন হ'তে পারে। সমাজের কোন-একটা মানুষও বেওয়ারিশ মাল নয়, প্রত্যেকের জন্য সমাজের যথেষ্ট করণীয় আছে। রাষ্ট্র ও সমাজের তরফ থেকে যা'-যা' করলে মানুষ সুস্থ হয়, স্বাভাবিক হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তা' না-ক'রে শুধু শাস্তির ব্যবস্থা করলে একপেশে কর্ত্তৃত্ব করা হবে। আমার তো মনে হয়—জন্মগতভাবে অপরাধপ্রবণ ও অযোগ্য যারা, তাদের বংশবিস্তার করবার সুযোগ না-থাকা ভাল। সুবিবাহ ও সুজনন যদি না হয় দেশে, তাহ'লে সারা দেশটাকে জেলখানা করলেও নিস্তার মিলবে না। আর, ঋত্বিক্-আন্দোলন খুব চালাতে হয়। ঋত্বিক্‌রা মানুষের বাড়িতে-বাড়িতে যাবে, আবালবৃদ্ধবনিতাকে সদাচারে ও সদভ্যাসে অভ্যস্ত ক'রে তুলবে। Positively (বাস্তবভাবে) সৎচলনে অভ্যস্ত না হ'লে কোন মানুষই কিন্তু নিরাপদ নয়। যে মন্দও করে না, ভালও করে না, গতানুগতিক চলনে চলে,—সে যে পরিবেশের পাল্লায় প'ড়ে কখন খারাপের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তার কিন্তু কোন ঠিক নেই। সেইজন্য আমি কই যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচারের কথা। যজন মানে নিজে ইষ্টবিষয়ক ভাবনা-চিন্তা করা, যাজন মানে অন্যকে প্রবুদ্ধ করা, ইষ্টভৃতি ও সদাচার মানে ইষ্টপোষণী আচার-অনুষ্ঠান হাতে-কলমে করা। সৎচলনে এতখানি ব্যাপৃত থাকলে তবে ব্যক্তিত্বের উপর তার ছাপ পড়ে। সে অসৎপথে তো ঝোঁকেই না, বরং অন্যকে অসৎপথ থেকে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে পারে। এটা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের অবশ্যকরণীয়। এই আত্মসংশোধনী অবশ্যকরণীয়গুলি যাতে প্রত্যেকের অভ্যাসগত হয়, তার কোন ব্যবস্থা সমাজ বা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হবে না, দোষ করলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে, সে তো কোন কাজের কথা নয়। তাতে নৈতিক মানের বাস্তব উন্নয়ন হবে না। অবশ্য, অনিবার্য্যক্ষেত্রে সংশোধনমুখী শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সুবোধদা—আপনি তো যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ও সদাচারের কথা বলছেন, কিন্তু বহু পিতামাতা আছেন যাঁরা নিজেরা তো দীক্ষা নেনই না, এমন-কি ছেলেপিলেরা যদি দীক্ষা নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাতে বাধা দেন। তারপর সেই ছেলেপিলেরা হয়তো কুসঙ্গে মিশে খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীরামকৃষ্ণঠাকুর বলেছেন, চারাগাছ বেড়া দিয়ে রাখতে হয়। চারাগাছ বলতে আমি বুঝি—যাদের ব্যক্তিত্ব এখনও সুস্পষ্ট হয়নি। আর, বেড়া বলতে আমি

বুঝি সদ্‌গুরু, সৎনাম ও সৎসঙ্গ। মানুষ যদি অল্পবয়স থেকে সদ্‌গুরু গ্রহণ ক'রে সৎ-নামের অনুশীলন নিয়ে সৎসঙ্গে অর্থাৎ জীবনবৃদ্ধিদ ভাল পরিবেশের ভিতর বাস করে, তাহ'লেই তার জীবন অনায়াসে সংগঠিত হ'তে পারে। মানুষের জীবন যদি কোন জীয়ন্ত সতে সুনিবদ্ধ না হয়, তাহ'লে সে যে নানা আবর্ত্তে প'ড়ে হাবুডুবু খাবে, সে-বিষয়ে কি আর কোন সংশয় আছে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—তোমরা বস, আমি বড়-বৌকে একটা কথা ব'লে আসি। ক'ব-ক'ব ক'রে ভুলে যাই, পরে আর মনে থাকে না। এখনই না-ক'লে পরে আবার হয়তো ভুলে যাবোনে।

বাড়ির ভিতর-থেকে কথা ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর দুই-তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসলেন।

ফিরে এসে দেখেন, প্রায় সবাই আছেন। বললেন—সুধীরকে (দাস) ডাক্ তো।

একজন সুধীরদাকে ডেকে আনলেন।

সুধীরদা আসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কাজের কতদূর ?

সুধীরদা—করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি ক'রে ফেলো, লক্ষ্মী ! সময়মত না হ'লি কি সুখ হয় ?

সুধীরদা—যত তাড়াতাড়ি হয় দেখছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, মানুষের mental deficiency-র (মানসিক অপূর্ণতার) সঙ্গে জড়িত থাকে তার physiological deficiency (শারীরিক অপূর্ণতা)। Nervous system (স্নায়ুবিধান) ও brain cell-এ (মস্তিষ্ক কোষে) defect (ত্রুটি) থাকে। উপযুক্ত খাদ্য, ওষুধ ও প্রক্রিয়ায় এর অনেকখানি প্রশমন হ'তে পারে ব'লে মনে হয়। বিধিমত নামধ্যানে অনেক error (ত্রুটি) corrected (পরিশুদ্ধ) হ'তে পারে। আর্য্যদের যা-কিছু বিধান বৈজ্ঞানিক কৌশলে ভরা।

কালিদাসদা—শোনা যায়, মহাপুরুষরা সাধারণ মানুষের ভিতর শক্তি-সঞ্চার ক'রে দেন এবং তার ফলে তাদের জীবনে অসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, এবং তারা অসাধারণ কাজ করতে পারে। এ-ব্যাপারটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাপুরুষের সান্নিধ্যে মানুষ নিত্যনূতন প্রেরণা পায়, সেই প্রেরণা-অনুযায়ী যারা চলে ও করে, তাদের ভিতরের শক্তিও ধীরে-ধীরে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। প্রত্যেকের ভিতর পরমপিতা অফুরন্ত শক্তি দিয়ে দিয়েছেন। যতই তার সদ্ব্যবহার করা

যায়, ততই তা' আরো জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। এইভাবে মানুষ অসাধ্য সাধন করে। কিন্তু প্রধান জিনিষ হ'ল—তাঁর প্রতি একটা দুর্নিবার টান। সেই টান একবার গজালে, তার পরিপন্থী কোন টানকে প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা করে না। বরং সব টানকে উপেক্ষা ও অতিক্রম ক'রে আরো তীব্র সম্বেগে ঈপ্সিত পথে এগিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রবল হয়। তাই, বাধা আসলেও তাতে বিভ্রান্ত না হ'য়ে সাধনার পথে আরো জ্বলন্ত হ'য়ে ওঠে। যাঁর প্রেরণায় ও যাঁর প্রতি টানে মানুষের চলন এমন দুর্বার হ'য়ে ওঠে, মানুষ মনে করে—তিনিই শক্তি-সঞ্চার ক'রে দিয়েছেন। Libido (সুরত) যাদের ঠিক আছে, তাদের পক্ষেই এটা সম্ভব হয়। অনেকের আছে damaged libido (বিধ্বস্ত সুরত)। গিরীশ ঘোষের তো বদভ্যাস কম ছিল না। শেষটা রামকৃষ্ণদেবকে ব-কলমা দিলেন। ভাবলেন—তাঁর উপর যদি সব ভার তুলে দিই, তাহ'লে তো আর কোন ভাবনা থাকবে না। যেভাবে পারি চলব, সব ভারই তো বহন করবেন তিনি। পরে খারাপ-কিছু করতে গেলেই মনে হ'ত—আমি খারাপ কিছু করলে তার ফল ভোগ করতে হবে তো ঠাকুরকে। যিনি এত দয়া ক'রে আমার সব পাপের ভার মাথায় তুলে নিয়েছেন, তাঁকে আরো কষ্ট দেব ? সেও কি সম্ভব ? অহরহ তাঁর মুখখানাই মনে পড়ত। চলনা তাঁর আপনা থেকেই শুধরে গেল। ভালবাসায় এমনটি হয়। তাই, শক্তি-সঞ্চারই বল আর যাই বল, মূল ওখানে। তবে, তিনি হলেন প্রেম-স্বরূপ। আর, আমাদের সত্তা যুগ-যুগ ধ'রে তাঁকেই খুঁজছে। তাই, তাঁর সান্নিধ্যে এসে অন্তর্নিহিত সত্তা আপনা থেকেই নেচে ওঠে। ভাবে, এই তো আমার বাঞ্ছিত ধন—এই তো আমার চিরকালের চাওয়া জিনিষ। সত্তা জেগে উঠলেও প্রবৃত্তি চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু টানের দৌলতে মানুষ সেগুলি adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে richer experience (সমৃদ্ধতর অভিজ্ঞতা) নিয়ে becoming-এর (বৃদ্ধির) দিকে এগিয়ে চলে। তাই, অন্তরে ব্যাকুলতা নিয়ে মহাপুরুষ-সংস্রব-লাভ অত্যন্ত ভাগ্যের কথা। প্রবৃত্তির দাপটে সত্তা যাদের অত্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন, তারা মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেও তাঁর প্রতি উন্মুখ হয় কম।

রাজেনদা—প্রবৃত্তি-অভিভূত যারা, তাদের কেউ-কেউ মহাপুরুষকে পেয়ে তাঁকে নিয়ে মেতে ওঠে, আবার অনেকে ফেরে না, তার কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি-অভিভূতির মধ্যে থেকেও অনেকের তা' ভাল লাগে না ; অন্তরে কী যেন একটা জ্বালা ও অভাব বোধ করে ; কী যেন খোঁজে, তা' পায় না, অথচ অভ্যস্ত সংস্কারকেও এড়াতে পারে না। তাই, স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের আশায় বার-বার প্রবৃত্তি-সেবায় রত হয় ও ব্যাহত হয়। এমনতর রকম যাদের, তাদের কিন্তু মহাপুরুষ-সান্নিধ্যে

এসে সহজেই পরিবর্ত্তন হ'তে দেখা যায়। তারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে যে সাত্ত্বিক তৃপ্তি পায়, বিচার ক'রে দেখে যে তেমনটি তার আগে কখনও পায়নি, তাই নিবিষ্ট হ'তে চেষ্টা করে। কিন্তু প্রবৃত্তির সঙ্গে identified (একাকার) হ'য়ে যারা সুখে থাকে, তাতে মনে যাদের কোন অতৃপ্তি বা হাহাকার জাগে না,—তাদের ফিরতে একটু দেরী হয়।

রাজেনদা—তাহ'লে যাজনের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাবোধে যারা যতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত, তাদের যাজনে মানুষের স্তিমিত সত্তাবোধ আবার ততখানি জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। নূতন ক'রে ক্ষুধা জাগে ও তারা উন্মুখ হ'য়ে ওঠে।

৭ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩৫০ (ইং ২১।৫।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। পরম কৌতুকভরে কয়েকটা বানরের খেলা দেখছেন। চোখে তাঁর করুণ, কোমল, মমতা-মাখান দৃষ্টি। বানরগুলি যেন তাঁর কতবড় স্নেহের ধন। আপনমনে বললেন—ওগুলি বেশ আছে সুখে।

দুলালীমা বললেন—বানরগুলির পুণ্য আছে, তা' না হ'লে আপনার কাছে থাকবার সুযোগ পাবে কেন? খুব ভাগ্য না থাকলে কারও আপনার কাছে থাকা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূরে থেকেও অনেকে আমার কাছে থাকে; আবার, কাছে থেকেও অনেকে আমার থেকে দূরে থাকে।

দুলালীমা—সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাছে থেকে যদি কেউ টাকা-টাকা করে; টাকা, সুখ-সুবিধা যদি তার কাছে প্রধান হয়, তাহ'লে কি তার আমার কাছে থাকা হয়? তার মন তো আমাতে থাকে না, মন থাকে অন্যত্র। আবার হয়তো কেউ কাজকর্ম্মের জন্য বাইরে থাকে, কিন্তু তার মনটা যদি আমার কাছে প'ড়ে থাকে, তাহ'লে দূরে থেকেও তো তার আমার কাছে থাকা হয়! সে সব-সময় ফাঁক খোঁজে কখন আমার কাছে আসবে, এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই চ'লে আসে। যখন দূরে থাকে, ঐ স্মৃতি বুকে ক'রেই থাকে, আবার কাছে আসার সুখ-কল্পনা নিয়ে থাকে। আমার দায়িত্ব নিয়ে লিপ্ত যদি থাকে, তাহ'লে তো কথাই নেই। তবে, কাছে থাকা সার্থক হয় তাদের যারা আমাকেই মুখ্য ক'রে থাকে, এবং আমার দায়িত্ব বহন ক'রে চলে।

দুলালীমা—ভগবান্ যখন আসেন, তখন তাঁকে যারা ধরে, তাদের একটা-না-একটা গতি নাকি হয়ই !

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর জন্য করা যার যেমন, ধরাটাও তেমন, আর গতিও হয় তেমনতর। তাঁর চালচলন, হাবভাব, কথাবার্ত্তা, আচরণ, কায়দাকরণ শ্রদ্ধাবান্ মানুষের অন্তরে একটা ছাপ ফেলেই। ঐ লোকপাবন চরিত্রের ছাপ যার চলার ভিতর যতখানি ফুটে ওঠে, সে ততখানি উন্নতির অধিকারী হয়। এক কথায়, আমাদের গতির ভিতর তিনি যতখানি জেগে ওঠেন—আমাদের বিশিষ্ট রকমে,—আমরা ততখানি সদ্‌গতি লাভ করি। তাঁর চরিত্রটা যতটা পারা যায় আমাদের ক'রে-ফেলা চাই, তাহ'লে আর ভাবনা নেই।

দুলালীমা—যারা ঐ রকম পারে না, তাদের কী হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরে ও চেষ্টা করে, তাদের তার ভিতর-দিয়েও অনেকটা কাজ হয়। ঐ ঝোঁক নিয়ে আবার আসে, আবার চেষ্টা করে, এইভাবে এগিয়ে যায়। অনেকে আছে আসুরিক ভাবাপন্ন। তারা এমনি হয়তো হোমরা-চোমরা, কিন্তু জীবন্ত মহাপুরুষের প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'তে পারে না। তাঁকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করে। ধরা-করার ধার ধারে না। এই যে চলন, এই চলনের ফলে তাদের ভিতর আত্মবিচার বা আত্মবিশ্লেষণ জিনিসটাই আসে না। বৃত্তির সঙ্গে লেপ্টে থাকে। বৃত্তির তাড়নায় কতকগুলি কাজ করে, যার ফলে হয়তো বাইরের কিছুটা জলুস দেখা যায়। আবার, ঐ বৃত্তি তাদের ঘাড় ধ'রে এমন বহু অপকর্ম্ম করায়, যার ফলে জাহান্নমের রাস্তাই সাফ হয়। তাই, খেয়ালী চলনে শেষ পর্য্যন্ত ফয়দা হয় না। একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে যদি চাপ, সে এই মুহূর্ত্তে হয়তো রাজপথ দিয়ে চলছে, পরমুহূর্ত্তে হয়তো তোমাকে ভাগাড়ে ঠেলে নিয়ে যাবে। বৃত্তিকে সার ক'রে চলে যারা, তাদেরও কতকটা ঐ রকম হয়। বৃত্তিকে আর বৃত্তি ব'লে চিনতে পারে না, তাই সত্তার দিক্ থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু মহাপুরুষকে যারা ধরে, তারা যদি ঠিকপথে চলতে নাও পারে, তবু তাদের মনে একটা খচখচানি লেগে থাকে। কারণ, তারা বৃত্তিকে বৃত্তি ব'লে চিনতে পারে। বৃত্তিকে বৃত্তি ব'লে চিনতে পারা কম ভাগ্যের কথা নয়। অনেক বড়-বড় সাধকের ভাগ্যে তা' ঘ'টে ওঠে না। মনের ঘানিতে ঘোরে আর ভাবে, খুব সাধন-তপস্যা করছি।

দুলালীমা—মনের ঘানিতে ঘোরা জিনিষটা কী বাবা ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজের মন-গড়া খেয়াল-খুশি ও ভালমন্দের ধারণা নিয়ে মানুষ যতদিন চলে,—ইষ্টের ইচ্ছা ও খুশিকে যতদিন আমল দেয় না, ততদিন মনের ঘানিতে ঘোরা হয়। তিনি যা' বলেন, ভাল লাগুক-না-লাগুক জোর ক'রে তাই করতে হয়।

তিনি এমনভাবে চলতে বলেন, যাতে আমাদের বৃত্তির সঙ্গে ঠোক্কর লেগে যায়। তাই, তাঁকে বলে ঠাকুর। ঐ-সব ঠোক্কর না খেলে মানুষের জ্ঞান-চৈতন্য খোলে না।...... মনের ঘানিতে ঘোরার হাত থেকে রেহাই পাবার সোজা পথ হচ্ছে, সদ্‌গুরু পাকড়ান ও নির্ব্বিচারে তাঁর আদেশ পালন ক'রে চলা। 'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলে কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।' আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় মানুষ যা' করে, তাতে মনের ঘানিতে ঘোরা হয়। আর, কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছায় যা' করে, তাতে ঐ বন্ধন থেকে মুক্তি হয়। এই হ'ল সোজা কথা। তাই, সদ্‌গুরুর কাছে মাথা বিকিয়ে না-দিলে, মানুষের সাধন-ভজন সুরুই হয় না। নিজের খুশির জন্য মানুষ যদি ত্রিভুবন ওলট-পালট ক'রে দিতে পারে, এবং সারা জগৎ তাকে যদি সেজন্য ধন্য-ধন্যও করে, তাতে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি আদৌ নাও হ'তে পারে। আবার, সে গুরুর প্রীতির জন্য যদি সামান্য কাজ নিয়েও থাকে, এবং মানুষ তাকে যদি ঘৃণার চক্ষেও দেখে, তাতেও তার যথেষ্ট আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'তে পারে।

নগেনদা (বসু)—যে-কোন রকমে ষড়্‌রিপু দমন করতে না-পারলে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জোর ক'রে রিপু দমন করতে গেলে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অসুখ-বিসুখ, বিকৃতি, অস্বাভাবিকতা, স্নায়ুদৌর্ব্বল্য, অস্থির-মতিত্ব, বুদ্ধি-বিবেচনার হ্রাস ইত্যাদি কতরকমের বিপর্য্যয়ই যে দেখা দেয়, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সহজ রকম আর থাকে না। বাইরে সাধুত্বের ভড়ং, অথচ ভিতরে-ভিতরে জটিল ও কুটিল রকমে গুপ্তপথে কাম-কামনার সেবার যে কত রকমারি এৎফাঁকের আমদানী হয়, তার অন্ত নাই। প্রবৃত্তিগুলি কখনও দেবে' থাকে, কখনও উত্তাল হ'য়ে ওঠে, কখনও মনের অতলে তলিয়ে গিয়ে বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের ছলাকলা ধরতে পারা যায় না। এমনতর মানুষগুলি নিজেদের কাছেই নিজেরা এক-একটা মস্ত হেঁয়ালির মত হ'য়ে ওঠে। কেন যে তারা কী করে, তা' নিজেরাই ঠাওর পায় না। তাদের চলা, বলা, করার মধ্যে সঙ্গতি তো থাকেই না, বরং দেখলে বহুরূপীর মত মনে হয়। ক্রমাগত রূপ বদলাচ্ছে। কোন্ রূপের যে স্থায়িত্ব কতখানি, তাও জানে না। এত যে অসঙ্গতি অথচ সে অসঙ্গতি-সম্বন্ধে কোন খেয়াল নেই। এই মুহূর্ত্তে যেটা বলে, পরের মুহূর্ত্তেই ঠিক তার উল্টোটাই সমান জোরের সঙ্গে বলে। কত অনিশ্চিত, বিরুদ্ধ ও বিপরীত রকমে যে এরা চলতে পারে তা' আঁচ করা যায় না। এদের বর্ণনা যদি দিতে বসি, তাহ'লে একখানা মহাভারত হ'য়ে যাবে। তবে এইটুকু বলতে পারি, complex (বৃত্তি)-কে suppress (নিরুদ্ধ) করলে তার solution (সমাধান) হয়

না। বরং সব-কিছু নিয়ে ইষ্টকে ভালবাসতে হয় এবং তাঁকে নিয়ে কাজে-কর্ম্মে মেতে থাকতে হয়। যে-যে বৃত্তি তাঁর সেবায় যতটুকু লাগে, ততটুকু নিঃসঙ্কোচে লাগাতে হয়। আর, যেখানে তাতে ব্যাঘাত জন্মায় সেখানে সেগুলিকে উপেক্ষা করতে হয়। ওদের হুলবুলিতে নাচতে হয় না। ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামূলক প্রীতিজনক কোন কাজে নিযুক্ত থাকতে হয়। আবার, ভাল-লাগার বস্তু যদি হন ইষ্ট, আর নানাভাবে তাঁকে নিয়ে ব্যাপ্ত ও ব্যাপৃত থাকার অভ্যাস যদি আমি ক'রে ফেলতে পারি, তাহ'লে আমাকে আর পায় কে? মানুষ রসগোল্লার আস্বাদ যদি একবার পায়, তাহ'লে তার চিটেগুড়ের দিকে কি আর লোভ থাকে?

আশুদা (দত্ত)—গৃহস্থের সংযত জীবন যাপন করা খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে training (শিক্ষা) নিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করতে হয়, সে training (শিক্ষা)-ই যে আমাদের নেওয়া হয় না। মানুষ গুরুগ্রহণ না-করলে, নিষ্ঠাসহকারে গুরুসেবা না-করলে ইন্দ্রিয়গুলি আয়ত্তে আসে না। সেই অবস্থায় বিয়ে করলে বৌ-মুখী হ'য়ে পড়ে। স্বামী যেখানে স্ত্রী-মুখী, স্ত্রী সেখানে স্বামী-মুখী হওয়ার দরকার বোধ করে না,—বরং খেয়ালমুখী হয় এবং স্বামীকেও নিজের খেয়ালের ইন্ধন ক'রে নেয়। তাতে সংসাবে সুখ হয় না, ছেলেপিলেরাও ভাল হয় না। সংসার ভাল ক'রে করবার জন্যই পুরুষদের প্রবৃত্তি-ঝোকা থেকে ইষ্ট-ঝোঁকা বেশি হওয়া দরকার। কোন জিনিসের above-এ (ঊর্দ্ধে) না থাকলে তা' control (নিয়ন্ত্রণ) বা enjoy (উপভোগ) করা যায় না!

আশুদা—সে কী-রকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, তুমি সাঁতার কাটতে জান না, বেশি জলের মধ্যে পড়লেই তুমি ডুবে যাও, তাতে কি তুমি অথৈ জলের মধ্যে প'ড়ে আনন্দ পাও? সাঁতার জানলে কিন্তু গভীর জল পেলে তোমার আনন্দ আর ধরে না। কারণ, তখন জল তোমার অধীন, তুমি জলের অধীন নও। ইষ্টকে আঁকড়ে ধ'রে থেকে তুমি যতখানি প্রবৃত্তির উপর থাকতে পারবে, ততই সংসার তোমার অধীন থাকবে, আর তুমি সংসারে থেকেও খানিকটা তার ঊর্দ্ধে থাকতে পারবে। সংসার নিয়ে তখন তুমি বিব্রত হবে না, অথচ যা' করণীয় তা' করার কোন ব্যাঘাত হবে না।

যতীনদা (দাস)—এটা সম্ভব হয় কী ক'রে? এর বাস্তব পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে রাখতে হবে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান ক'রে জীবনে। আর যা-কিছুর স্থান থাকবে তার পরে। তখন যা-কিছুই হবে ইষ্টার্থে। সংসার করতে গিয়েও লক্ষ্য থাকবে—তার ভিতর-দিয়ে ইষ্টার্থ কতখানি পরিপূরিত হচ্ছে,—তা'

কতখানি ইন্টেব হ'য়ে উঠছে। সংসারের ভিতর-দিয়ে যদি ইন্টার্থ-সাধন না-হয়, তাহ'লে সে-সংসার করা তো ভূতের বেগার খাটা। জীবনই বলি, সংসারই বলি, সব-কিছুর স্বার্থও ইন্ট, পরমার্থও ইন্ট। আমরা জানি বা না জানি, বুঝি বা না বুঝি—এই হ'ল fact (বাস্তব তথ্য)। এইটে লেহাজে থাকলে আর কোন ভাবনা নেই।

দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে কাছে বসেছিলেন, একটি মায়ের কোলে একটি ছেলে ছিল। সে বার-বার মুখের ভিতর আঙ্গুল দিচ্ছিল। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কলতলায় গিয়ে ওর হাত ধুইয়ে আন্। আর, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল যে যখন-তখন মুখের ভিতর আঙ্গুল দিতে নেই। মুখের ভিতর আঙ্গুল দিতে গেলে যে হাত ধুয়ে দিতে হয়, এবং দিলে পরে যে হাত ধুয়ে ফেলতে হয়, তা' বুঝিয়ে দিতে হয়। এবং এটা কেন করতে হয়, তাও বলতে হয়। এইভাবে ছেলেবেলা হ'তে সজাগ থেকে ছেলেপিলেদের সদাচার ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হয়, আর শিক্ষা-অনুযায়ী নিজেরা আচরণ করতে হয়। শৈশবশিক্ষা ভাল না হ'লে পরে মানুষের বড় কষ্ট হয়।

মা-টি ছেলেটিকে হাত ধোয়াতে নিয়ে গেলেন।

হরেনদা (বসু)—অনেকে বলে, তোমার ঠাকুরের কথার মধ্যে ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা নেই, আছে কেবল ভোগের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই তার উত্তরে কী বলিস ?

হরেনদা—আমি কই, তোমরা বোঝ ভারি! ভূতের মুখে রামনাম শোভা পায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর -হয়তো তাদের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না ব'লে তা'রা বুঝতে পারে না। তাদের বুঝিয়ে দিবি তো! মানুষের আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে এমনতর কথা বলা ভাল না। ওতে মানুষ অযথা শত্রু হ'য়ে থাকে।·····প্রধান কথা হ'চ্ছে—আমাদের কাম্যটা যদি নির্দ্ধারণ হয়, তাহ'লে ত্যাগ-বৈরাগ্যের বিষয় কোনটা বুঝতে আর কষ্ট হবে না। আমাদের কাম্য হ'চ্ছে বাঁচাবাড়া, আর সেটা পরিবেশকে নিয়ে, আরো আরো ক'রে, অমৃত-উপভোগের পথে, আর তা' ঈশ্বর-পরায়ণতা নিয়ে, ইন্টানুরাগের ভিতর দিয়ে। তাঁকে যত অনুরাগের সঙ্গে অনুসরণ করা যায়, ততই ঐ সসীমের ভিতরই অসীমের অনুভূতি জাগে। এমনি ক'রেই সচ্চিদানন্দময় সত্তাকে উপলব্ধি ও উপভোগ করা যায়। আমি যদি ভোগের কথা বলি, তবে সেটা এই ভোগ। এই উপভোগ যদি না থাকে, তাহ'লে বিবর্ত্তন বা ভগবত লীলা ব'লে তো কোন কথা থাকে না! সবই একটা শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। আর ত্যাগ-বৈরাগ্য অবলম্বন করতে হবে সেই বিষয় সম্বন্ধে—যা' এতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে! গীতায়

আছে যুক্তাহারবিহারের কথা। কথাটা একেবারে মাপা কথা। আমার তেমনভাবে আহার-বিহার করতে হবে, যাতে ইষ্টের সঙ্গে আমার যোগটা অবিচ্ছিন্ন থাকে। ইষ্ট হলেন সত্তার প্রতীক। তাঁর সঙ্গে যোগ যদি আমার অক্ষুণ্ণ থাকে, সেখানে যদি আমি অচ্যুত থাকি, তাহ'লে সচ্চিদানন্দময় সত্তার অনুভূতিও আমার অব্যাহত থাকবে। তবে, আমি এ-কথা বিশ্বাস করি না যে ভোগ মাত্রেই দোষের। সত্তার অবিরুদ্ধ যে-ভোগ তা' দোষের হ'তে যাবে কেন? আমি যদি একটা রসগোল্লা খাই, এবং তাতে যদি আমার শরীর-মনের ক্ষতি না-করে, এবং এই রসগোল্লা খেতে যেয়ে যদি পরিবেশের কাউকে বঞ্চিত না-করা লাগে, তাহ'লে রসগোল্লা খাওয়াটা দোষের হবে কেন, তা' আমি বুঝতে পারি না। কেউ হয়তো বলবে—এটা ইন্দ্রিয়জ পরিতৃপ্তি, কিন্তু আমার কথা হ'চ্ছে, কেউ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সংযমের বাঁধ ঠিক রেখে যদি উপভোগ করতে পারে, তাতে দোষ কী? এই সত্তাসঙ্গত উপভোগকে যদি নিষিদ্ধ করা হয়, তাহ'লে পোষণবঞ্চিত হ'য়ে মানুষ দিন-দিন শুষ্ক, নীরস ও নিরেট হ'য়ে উঠতে থাকে। তাদের ভিতর থাকে না কোন মাধুর্য্য, থাকে না কোন আনন্দ,—অবরোধ-জনিত বিকৃতি ও আক্রোশে তারা পরিবেশের জীবনকেও দুর্ব্বহ ক'রে তোলে। তাই, ধর্ম্মের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে মানুষের যাবতীয় জীবনীয় প্রয়োজন আরো সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণভাবে পরিপূরণ করা যায়। তাই, ধর্ম্ম স্বতঃই ডেকে নিয়ে আসে শিক্ষা, শিল্প, কলা, কৃষি, বাণিজ্য, বিজ্ঞান। ধর্ম্ম যদি জীবনকে ভিতরে-বাইরে উভয় দিকে সমৃদ্ধ না করে, তাহ'লে সে-ধর্ম্ম জীবনের ধর্ম্ম নয়, মরণের ধর্ম্ম।

শরৎদা (হালদার)—মৃত্যুর পর মানুষের তো পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই থাকে না, অথচ জীবিতকালে পারিপার্শ্বিক ছাড়া মানুষ অচল। জীবন-চলনার প্রয়োজনে ছাড়া মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিকের উপযোগিতা কতটুকু?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চেতন থাকি পারিপার্শ্বিকের সংঘাতের ভিতর দিয়ে। পারিপার্শ্বিক আমাদের যেমনতর সাড়া দেয়, আমাদের চেতনাও সাধারণতঃ সক্রিয় হ'য়ে ওঠে তেমনতরভাবে। পারিপার্শ্বিককে যদি উন্নত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলি, এবং পারিপার্শ্বিকও যদি আমাদের উন্নত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে, তাহ'লে চেতনা উচ্চস্তরেই বিরাজ করে। এর ভিতর-দিয়ে সত্তা আনন্দ পায় অর্থাৎ বৃদ্ধির দিকে চলে। আধ্যাত্মিক চলন হ'ল সেই সুকেন্দ্রিক চলন, যার ভিতর-দিয়ে মানুষ বৃদ্ধির দিকে নিরন্তর গতিশীল হ'য়ে ওঠে। তাই, তার জন্য সৎ-পারিপার্শ্বিকের উপযোগিতা কতখানি, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? সেইজন্যই তো শাস্ত্রে অত ক'রে কয়

সাধুসঙ্গের কথা। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য অপার। পরিবেশকে বাদ দিয়ে যখন চলা সম্ভব নয়, তখন পরিবেশকে উপেক্ষা করা চলে না। তাই, পরিবেশ যদি সৎ না হয়, তবে নিজের আচরণ ও যাজনের সাহায্যে পরিবেশকে সৎ ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টা নিয়ে যদি থাকা যায়, তাতেও মানুষ বৃদ্ধির দিকে চলে। তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ইচ্ছাশক্তি ও ইষ্টানুরাগ সবই বেড়ে চলে। তাই, মানুষ যদি ইষ্টপ্রাণ ও যাজনমুখর হয়, এবং পরিবেশ যদি খারাপও হয়, তাতেও সে আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরিবেশের ভালমন্দ কোন সংঘাত যদি না থাকে, তবে তার চেতনা ধীরে-ধীরে সঙ্কীর্ণ ও স্তিমিত হ'তে থাকে, মনের অবান্তর আবিল্যও অনেক সময় বৃদ্ধি পায়। পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভিতর-দিয়ে যে স্ফুরণ ও বিকাশ—তাও হয় না। আর, পারিপার্শ্বিক বলতে গুরু বা ইষ্টও তো একজন পারিপার্শ্বিক। ইষ্টরূপ পারিপার্শ্বিক ও ইষ্টছাড়া অন্য যে বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক—দুইয়ের সঙ্গেই যোগাযোগ থাকা চাই। ইষ্টের কাছ থেকে যে-সাড়া আমরা পাই, তা' কতখানি আত্মস্থ করলাম, তার পরীক্ষা চলে পরিবেশে। এইভাবে বাস্তব সংঘর্ষ ও সংঘাতের ভিতর-দিয়ে ইষ্টানুগ চলন আয়ত্ত হয়। তাই, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ অপরিহার্য্য প্রয়োজন। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে কে কতখানি ভাল থাকতে পারে, সেই-ই তো ভালত্বের আসল পরখ। অবশ্য, কোন-কোন সময়ে সাময়িক কারও-কারও নির্জ্জনে থাকা প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু নির্জ্জনবাসের পর আবার ফিরে আসতে হয় লোকালয়ে।

এরপর খেপুদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলতে লাগলেন। অন্য সবাই স'রে গেলেন।……

দুপুরে ঘুম থেকে উঠে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার এসে মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে বসেছেন। হরিপদদা (সাহা) তামাক, জল, সুপারি ইত্যাদি দিচ্ছেন। কাছে অল্প দু'চারজন আছেন। আজ খেপুদা, শরৎদা প্রমুখ কয়েকজনের বাইরে যাবার কথা। যাঁরা যাবেন তাঁদের মধ্যে একজন কোন কারণে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সংবাদ পেয়ে তাঁকে ডাকিয়ে বললেন—আমি যদি আপনাকে অমুকের assistant (সহকারী) ক'রে দিই, তাতেও আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে কেন? আপনি আপনি। আপনার চলনা যতদিন ঠিক আছে, ততদিন আপনার কৃতিত্ব ও মর্য্যাদা কোন অবস্থায়ই লাঘব হবার নয়। সামান্য কারণে যদি মনে করেন যে আপনার মর্য্যাদার হানি হ'ল, তাহ'লে সেটা কিন্তু আপনার খাঁকতিরই লক্ষণ। ধরলাম—আপনার উপর লাখ injustice (অবিচার) করা হয়েছে, তবু আমার সম্মতি নিয়ে যে-জিনিস বেরিয়েছে,

সে-সম্বন্ধে আপনার কথা থাকবে কেন ? আমার সব নেবেন, অথচ আমি যদি হেগে ফেলি, আমার বাহ্যেটা কি সইতে পারবেন না ? তার জন্যই আমি পচে যাব ?…… আমি কি না দেখে-শুনে কিছু করি ? প্রত্যেকটা জিনিসই আমি step by ste- (পদে-পদে) দেখি। আর, আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। আমি কোন্ considera-tion-এ (বিবেচনায়) কখন কী করি, পরে কী করব, আগে তো তা' বলা যায় না ! আপনাকে যদি আগে থাকতে ব'লে দিই—পরশুদিন আপনাকে একটা চুমো খাব, তখন কি সেই চুমোয় কোন রস থাকে ? সব বলা চলে না। ……আর আপনি কি ভাবেন—আমি অন্যের কথায় চলি ? তাই যদি হ'ত, তাহ'লে তো আর কথা ছিল না ! তবে খেপু বা কেষ্টদার যে-কথা আমার সঙ্গে tally করে (মেলে), সেটাও কি উল্টোতে যাব ? · …আমার তো মনে হয়, আপনাদের interest (স্বার্থ) আমি আপনাদের চাইতে ভাল বুঝি এবং বেশি ক'রে দেখি —আপনারা যে আমার মাল, আমার জিনিস, আমার হাত-পা ! এইটুকু কি আপনারা বোঝেন না। দুঃখে আমার বুক ফেটে যায়, এ-কথা ক'ব কাকে ? গম্ভীর কণ্ঠে আদেশের সুরে বললেন—আপনি মন ঠিক না-ক'রে বের হবেন না, better stop here (বরং এখন যাত্রা স্থগিত রাখুন) ! ও-অবস্থায় গিয়ে আপনার শরীর-মন খারাপ হবে। আপনার মুখে আমি নেই। যেখানে যাবেন আমাকে মাথায় নিয়ে যাবেন, তবেই তো কাজ হবে। Like a soulless body (আত্মাহীন দেহের মত) গিয়ে লাভ নেই।……আর আপনি তো আমার জন্য কম করেননি। আপনার তো টাকার অভাব ছিল না। একমাত্র আমাকে চেয়েই তো এসেছেন। তা' না হ'লে কি এতদিন ধ'রে প্রত্যেকটা কাজ অমন-ক'রে করতে পারতেন ? আপনার তো অন্য কোন ধান্ধা নেই ! I am dearer to you than anything in the world (জগতের যে-কোন জিনিসের থেকে আমি আপনার কাছে প্রিয়তর)। Money-complex (অর্থাসক্তি) আপনার নেই, আর সে consideration-এ (বিবেচনায়) আপনি এখানে আসেনওনি। যখন এসেছিলেন, তখন কি এ-সব কিছু ছিল ?

উক্ত দাদা—আজ্ঞে না !

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমি বুঝেছি, ব্যাপার ও নয়। আপনার অভিমানে আঘাত লেগেছে। কিন্তু অভিমানই হো'ক আর যা'ই হো'ক, কোন প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না। যে-কোন একটা প্রবৃত্তিও অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তাই-ই মানুষকে বেহাল ক'রে দিতে পারে। অবস্থার মধ্যে না-পড়লে তো বোঝা যায় না। খুব সাবধান ! এইবার ভাল ক'রে ঝেড়ে দাঁড়ান। মেঘ কেটে যাক। আরো জ্বলজ্বলে হ'য়ে ওঠেন।

দাদাটির বেদনাবিহ্বল মুখখানি সত্যই মুহূর্ত্তে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। দাদাটি গড় হ'য়ে প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

৩২শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫০ (ইং ১৭।৭।১৯৪৩)

আজ থেকে একবিংশতিতম ঋত্বিক্-অধিবেশন সুরু হ'ল। নানা-জায়গা থেকে দাদারা এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় তক্তপোষে ব'সে আছেন। সবাই এসে প্রণাম করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্ন হাসিতে সকলকে আপ্যায়ন করছেন। কারও-কারও কাছে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করছেন। জানকীদা (দে) অনেকগুলি কাঁঠালের বীচি নিয়ে এসেছেন। তাই দেখে বললেন—'জবর মাল নিয়ে আইছিস তো! মুগের ডালের মধ্যে কাঁঠালের বীচি দিলে আর কথা নেই। কাঁঠালের বীচিতে আমার অরুচি কমই ধরে।' চোখের ইঙ্গিত করতেই জানকীদা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে নিয়ে গেলেন কাঁঠালের বীচিগুলি।

একটি দাদা তার নানারকম দুঃখ-ব্যথার কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব সহানুভূতি ও ধৈর্য্য-সহকারে শুনলেন, শুনে বললেন—পরমপিতাকে ডাক আর প্রতিকার যাতে হয় সেই পথে চল। দুঃখের সময় মানুষের মন নরম থাকে, ভাল সংস্কার থাকলে মানুষ তখন ভাবে—নিশ্চয়ই আমার কর্ম্মের দোষ আছে, তা' না-হ'লে দুঃখ পাব কেন? তাই, আত্মবিশ্লেষণ ক'রে নিজের চলনা ঠিক করতে চেষ্টা করে। নিজের শক্তি যথেষ্ট নয় জেনে ভগবানের দিকে চায়। তার ভিতর-দিয়ে মনে আবার অনেকখানি শক্তি ও সান্ত্বনা পায়। তাই ভক্তিমান্ যারা তারা কখনও একেবারে হতাশ ও নিরাশ্রয় হ'য়ে পড়ে না। দুঃখের ভিতর-দিয়ে কত লোকে আরো পবিত্র ও উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে ওঠে। তুমিও যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি ভাল ক'রে কর, আর তোমার সঙ্গে যে যেমনতর ব্যবহারই করুক না কেন, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহারই ক'রো। পরিবেশের প্রত্যেকের সঙ্গে এমনভাবে চ'লো যাতে তারা তোমার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে। পরমপিতার দয়ায় দেখো এ-অবস্থা কেটে যাবে। এ-অবস্থা কেটে গেলেও এ-দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ রেখ। মানুষ বিপন্ন যখন হয়, আর্ত্ত যখন হয়, তখন কিন্তু সে ভগবান্ ও মানুষের দয়ার জন্য হাহাকার করে, কিন্তু পরে সুদিন পেয়ে সেদিনের কথা ভুলে যায়, তখন হয়তো বিপন্ন বা আর্ত্তকে পরাঙ্মুখ করতে দ্বিধাবোধ করে না। এতে পরমপিতার দয়া হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়। আমি জীবনে দারিদ্র্য ও অভাব-অভিযোগে চরম কষ্ট পেয়েছি। কলকাতার রাস্তায় ফুটপাথে শুয়ে ও কলের জল খেয়েও আমার দিন কেটেছে। অতখানি কষ্ট পাওয়ার একটা সুফল দেখি এই যে অভাবপীড়িত

বা ক্ষুধার্ত্ত কোন মানুষ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে আমি তৎক্ষণাৎ তার অবস্থাটা অনুভব করতে পারি, এবং কোন ব্যবস্থা না-করা পর্য্যন্ত সোয়াস্তি পাই না।… …বিশেষ ক'রে দুর্দ্দিনে যাদের কাছ-থেকে কোনরকম সাহায্য পাও, তাদের কথা কখনও ভুলো না। কৃতজ্ঞতাই মানুষকে বড় ক'রে তোলে।

উক্ত দাদা—ঠাকুর! আমি অন্যের কাছে শুনে ভাল হবে মনে ক'রে এক-একটা কাজে হাত দিই, কিন্তু শেষপর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হ'তে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে না-ভেবেচিন্তে পরের কথা শুনেই কোন কাজে ঝাঁপ দিতে নাই। নিজের সুবিধা, সুযোগ, সম্ভাবনা, রুচি, ক্ষমতা, পরিবার, পরিবেশের অবস্থা, সম্ভাব্য বাধাবিঘ্ন ও তা' প্রতিকারের পথ ইত্যাদি সুসংগত ও সামগ্রিকভাবে ভেবে দেখতে হয়। একপেশে চিন্তার ভিতর-দিয়ে যে সিদ্ধান্ত হয়, প্রায়ই তা'তে ভুল থাকে। আবার, সিদ্ধান্ত ঠিক হ'লেও সেই সিদ্ধান্তকে বাস্তবে সফল ক'রে তোলবার একটা কার্য্যক্রম আছে, সেই ক্রম-অনুযায়ী যদি না-চলা যায়, তা'হলে সাফল্য আসে না। এখন, তোমার ভাল-ক'রে ভেবে দেখা দরকার—তোমার ত্রুটি কোথায়—সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারে, না সিদ্ধান্ত উদ্‌যাপনের ব্যাপারে। যেখানে যে পর্য্যায়ে ত্রুটি আছে, সেইটে শোধরান লাগে। ভুলও আমাদের কৃতকার্য্যতার পথ পরিষ্কার ক'রে দিতে পারে, যদি ভুল-সম্বন্ধে বোধ থাকে। জ্ঞান ও বোধ চাই, আর সেই জ্ঞান ও বোধ-অনুযায়ী চলা চাই। ভাল ক'রে ধ্যান-ধারণা করলে ব্যাপারগুলি সব দিক্ দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা হয়। ধ্যান-ধারণায় বাস্তব চলনও নিখুঁত হয়। ধ্যান মানে মনন, চিন্তন, আর ধারণা মানে ব্যাপাবগুলিকে সংগতিশীল ক'রে রাখা—ভালমন্দ বেছে নিয়ে।

উক্ত দাদা—মাঝে-মাঝে দুঃখ-কষ্টে মন যেন বিকল হ'য়ে পড়ে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—দুঃখ-কষ্টে সাময়িক ওরকম সবারই হয়। ও কিছু না। সব সত্ত্বেও তো তুই চলছিস্। আর চলাও লাগবে, করাও লাগবে। অবসাদে গা ঢেলে দিলে তো বাঁচার তাগিদ পূরণ হবে না! তাই ওকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কী? আর, তুমি যদি সব সময় দুঃখের চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাক, এবং অন্যের কাছেও নিজের দুঃখের কথা বল, তাহ'লে কিন্তু মানুষ তোমাকে এড়িয়ে চলতে চাইবে। দুঃখের সময় তোমাকে সহানুভূতি দেখাবারও কোন লোক পাবে না। তার চাইতে নিজের দুঃখ-কষ্ট সত্ত্বেও চেষ্টা ক'রো—মানুষকে সুখী ও তৃপ্ত করার জন্য কতখানি করতে পার—ত্বরিতকর্ম্মা হ'য়ে সাফল্যে সম্বৃদ্ধ হ'তে ও করতে। সেই করার ভিতর-দিয়ে মানুষ তোমার আপন হবে। মানুষকে যত আপন করতে পারবে, ততই তোমার লাভ। পরমপিতা চান না

যে আমাদের কোন অমঙ্গল হোক, আর তিনি আমাদের ভিতর সেই শক্তিও দিয়ে দিয়েছেন যাতে প্রত্যেকটা অবস্থাকে মঙ্গলপ্রসূ ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। ঘাবড়ে যেও না লক্ষ্মী! ভগবান্ যাদের বড় করেন, তাদের অনেক তাফালের ভিতর দিয়ে নেন। দুঃখ, কষ্ট, বাধা, বিঘ্নকে জয় না-করলে শক্তি বাড়বে কি ক'রে? চল, স্ফূর্তি ক'রে চল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে দাদাটি উৎসাহিত হ'য়ে বললেন—এখন আমার মনে হ'চ্ছে, দুঃখ-কষ্ট আর আমাকে কাবু করতে পারবে না। মনের এই অবস্থাটা যেন সব সময় বজায় থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেন বজায় থাকে বললে বজায় থাকায় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। বজায় রাখব এমনতর সঙ্কল্প করতে হয়। তবে, মনের ওঠাপড়া আছেই ; ওদিকে খেয়াল না-দিয়ে যা' করণীয় ক'রে যেতে হয়। মনটা ঢেউয়ের মত—একবার ওঠে, একবার নামে। ঢেউয়ের ভিতর দিয়ে পান্‌সি চালিয়ে তর্‌তর ক'রে এগিয়ে যেতে হয়।

রবিদা (ব্যানার্জ্জী), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), স্মরজিৎদা (ঘোষ), উপেনদা (সেন), হরিচরণদা (গাঙ্গুলী), পশুপতিদা (দত্ত), রাধা-বিনোদদা (বিশ্বাস), জগজ্জ্যোতিদা (সেন), শ্রীভূষণদা (মিত্র), জিতেনদা (মিত্র), জগৎদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), হরিশদা (গুণ), হেমদা (মুখার্জ্জী), আশুদা (ব্যানার্জ্জী), গৌরদা (দাস), মধুদা (সান্ন্যাল), তারাপদদা (রায়), মদনদা (দাস), শম্ভুদা (সাহা), শিবকালীদা (সাহা), কানাইদা (গাঙ্গুলী), নেপালভাই (পাল), বিশুভাই (মুখার্জ্জী), বিভুদা (ব্যানার্জ্জী), করুণাদা (মুখার্জ্জী) প্রমুখ কলকাতা-অঞ্চলের দাদাদের দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লাস-সহকারে বললেন—এবার তো তোমরা একটা কামের মত কাম করিছ। তোমরা যে চাল পাঠাইছ কলকাতা থেকে, তা' খেয়ে কত লোক বেঁচে যাচ্ছে। হাজার মণ পাঠাতে পারলে আরো ভাল হ'ত, কিন্তু যা' করিছ, সেও এই সময় অসাধারণ ব্যাপার।

রবিদা—বিশেষ ক'রে হীরালালদার চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হীরালাল তো তোমাদের বাদ দিয়ে নয়।

হীরালালদা—মাষ্টারমহাশয় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকেই যথেষ্ট করেছেন। তা' না হ'লে যতটুকু করা হয়েছে, তাও সম্ভব হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখ, নেংটেরা একত্তর হ'লে কী করতে পারে। তোমরা যদি লাগ, তোমাদের অসাধ্য কাণ্ড নেই দুনিয়ায়। তবে, তোমাদের যে দম থাকে না।

কিছুদিন উৎসাহ সহকারে কাজকাম ক'রে আবার ঢিল দাও বা ডুব মার। কিন্তু active continuity (সক্রিয় ক্রমাগতি) ছাড়া কিছুই কিন্তু হবার নয়।

কানাইদা —আমাদের continuity (ক্রমাগতি) থাকে না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Continuity (ক্রমাগতি) নেই কে বলে ? কাম-কাঞ্চনের সেবায় আমাদের যে আগ্রহ তাতে তো continuity (ক্রমাগতি)-র অভাব দেখা যায় না। আমরা যে-বিষয়ে যেমন interested (আগ্রহান্বিত) সে-বিষয়ে আমাদের continuity (ক্রমাগতি) তেমনি।······আর, আমাদের অনেকের স্বভাবের মধ্যে থাকে আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা। ওগুলি সদভ্যাসের সঙ্গে শত্রুতা সুরু ক'রে দেয়। রোজই হয়তো সন্ধ্যায় যাজন করতে বেরোচ্ছি। একদিন হয়তো আলস্যবশে মনে হ'ল—আজ আর যেযে কাজ নেই। আলস্যের প্ররোচনায় হয়তো গেলামই না। তার পরের দিন সন্ধ্যায় যখন বেরোবার কথা মনে হ'ল, তখন হয়তো ভাবলাম —একটু পরে গেলেও তো চলবে। এখনই যে যেতে হবে এমন তাড়া কী আছে ? এইভাবে কিছু-সময় হয়তো গড়িমসি করলাম। তারপর সেদিন আর যাওয়া হ'ল না। ক'দিন যদি এইরকমভাবে বাদ যায়, তারপর হয়তো সন্ধ্যাবেলায় বেরোবার কথাই মনে পড়বে না। এইভাবে ছোট-ছোট বদভ্যাসগুলি বাদ সাধে। সদভ্যাস-গুলিকে ধ'রে রাখতে দেয় না। কিন্তু দুর্ব্বলতার প্রতি যদি নির্ম্মম না-হওয়া যায়, তাহ'লে পারা যায় না। শুভসঙ্কল্পের খেলাপ হ'তে দিতে নাই—এক অনিবার্য্য কারণ ছাড়া।

জগজ্জ্যোতিদা—নিবার্য্য যা' তাকে যদি অনিবার্য্য ব'লে ধরি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে যদি ফাঁকি দিতে চাও, তবে সে-পথ তা এন্তার খোলা। নিজেকে নিজে ফাঁকি দেবে না, নিজেকে নিজে ক্ষমা করবে না, এই সঙ্কল্প অটুট ক'রে তোলা চাই। আর, পরস্পরের পরস্পরকে lovingly (ভালবাসার সঙ্গে) চেতিয়ে তোলা লাগে। একজন যদি ঝিমিয়ে পড়ে, আর-একজনের তখন তাকে সজাগ ক'রে দেওয়া লাগে। পারিপার্শ্বিকের সেবা বলতে এটা একটা প্রধান সেবা। তুমি তো ইষ্টচলনে জাগ্রত থাকবেই, আবার, তোমার আশপাশের গুরুভাই ও সহকর্ম্মী যারা, তাদের সবাইও যাতে জাগ্রত থাকে সে-বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে।

হীরালালদা—সবাইকে ইষ্টকাজে আগ্রহশীল ক'রে তোলা যায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই যে আগ্রহশীল হয়, তা' হয় না। Instinct (সংস্কার) না-থাকলে তুমি লাখ বোঝাও, কিছুতে বুঝবে না। তবে, যাকে দিয়ে এই কাজ করাতে চাও, তার কাছে এটা উপভোগ্য হওয়া চাই। এই-সম্বন্ধে তার একটা প্রকৃতিগত চাহিদা

চাই। অন্য কোন লোভের বশে যদি এ-কাজ সুরু করে, তাহ'লে টিকে থাকতে পারে না। থাকলেও আপ্রাণতা থাকে না, আর আপ্রাণতা না-থাকলে মানুষকেও মজিয়ে তুলতে পারে না।

হরিচরণদা—কারও কাছে আপনার কাজের কথা বলায় সে উৎসাহিত হয়, আবার কেউ-কেউ বিরক্ত হয়—এর কী করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক জনের এক-এক রকম চাহিদা, ঝোঁক ও বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকের কাছে তার রকমে কথা বলতে হয়—আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে। কারও হয়তো রাজনীতির দিকে ঝোঁক, কারও হয়তো সংগঠনের দিকে ঝোঁক, কারও হয়তো শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে ঝোঁক, কারও হয়তো ভাল লাগে সাহিত্যকলা, কারও হয়তো ভাল লাগে জ্ঞান-গবেষণা, কারও হয়তো ভাল লাগে সমাজসেবা, কারও হয়তো ভাল লাগে সাধন-ভজন। যার যে-দিকে ঝোঁক, যার যেমন ভাললাগা, তার সঙ্গে সেইভাবে কথা বলতে হয়। আমার কাজ বলতে তো একটুখানি না! এর নানাদিক্ আছে, এর মধ্যে সবকিছুই আছে। যাকে যেভাবে কাজে লাগান যায়, তাকে সেইভাবে কাজে লাগাবেন। এতে নিজের অনেকখানি training (শিক্ষা) হবে। যার কাছে পাঁচটা টাকা চেয়ে পাবেন না, তাকে যদি বলেন—ঠাকুরের লাইব্রেরীর জন্য এই পাঁচখানা বই আপনি সংগ্রহ ক'রে দেন, তাহ'লে সে হয়তো খুশি মনে দেবে। যে হয়তো যাজন করতে এগোয় না, তাকে যদি বলেন—সৎসঙ্গের কাজকর্ম্মের খবরগুলি কাগজে যাতে বেরোয়, তার ব্যবস্থা ক'রে দেন, তাহ'লে সে হয়তো মাথায় পগ্গ বেঁধে হাঁটলো। যাকে যেখানে লাগান যায়, তাকে সেখানে লাগান, এবং পরস্পরের মধ্যে সংযোগ, সমাবেশ ও সম্প্রীতিস্থাপন -একেই তো বলে organisation (সংগঠন)। খুব কম মানুষই আছে একেবারে অকর্ম্মা। তবে, অনেকেই মাথা খাটিয়ে কাজ করতে পারে না। তার যে কোন্ দিকে কী যোগ্যতা আছে, তাও ভাল ক'রে বুঝতে পারে না, বুদ্ধিমান্ সেই—যে রকম-সকম দেখে সেইটে বুঝে নিয়ে তাকে profitably use করতে (লাভজনকভাবে কাজে লাগাতে) পারে। কোন মানুষকে তাই নিরুৎসাহ করতে নেই, কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে নেই। কে যে কোন্ সময় কোন্ কাজে লেগে যায়, তার কোন ঠিক নেই। দোষত্রুটি যার যা' থাক্, তা' সত্ত্বেও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুধাবন করতে হয়—কার ভিতর কী বিশেষ গুণপনা আছে। সেই দিক্-দিয়ে তাকে উসকে তুললে সে দিন-দিনই ফুটে উঠবে। সাধারণতঃ মানুষ দেখলেই আমার ভাল লাগে। ভাবি, পরমপিতার দান। তবে, বিশ্বাসঘাতক প্রকৃতির যারা, তাদের নিয়ে খুব সাবধানে চলতে হয়। চোখ কান খোলা না-রাখলে বিপদ আসতে পারে।

হরিশদা—একটা মানুষ বিশ্বাসঘাতক কিনা, কী-ক'রে বোঝা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাবার্ত্তা, চালচলন, আচার-আচরণ লক্ষ্য করতে হয়। দেখতে হয়—মানুষটার শ্রদ্ধা প্রবল, না inferiority (হীনম্মন্যতা) প্রবল; কৃতজ্ঞতা ও ও সন্তোষ বেশি, না অনুযোগ-অভিযোগ ও অসন্তোষ বেশি; স'য়ে-ব'য়ে অন্যের সংশোধনে তৎপর, না দোষের কথা ব'লে তাদের লোকের সামনে হেয় করতে ব্যস্ত; কেউ ভাল আছে দেখলে সুখী হয়, না ঈর্ষ্যান্বিত হয়; অন্যকে বাহাদুরী দেয়, না নিজের বাহাদুরীর কথাই বলে; অন্যের সুখ-সুবিধা ক'রে নিজের সুখ-সুবিধা চায়, না নিজের সুখ-সুবিধার খাতিরে বেপরোয়াভাবে অন্যের স্বার্থ ব্যাহত করতে পারে; উপকারীর দুঃখ-বিপদের সময় তার পাশে এসে দাঁড়ায়, না পাশ কাটিয়ে যায়; —তার অসতর্ক মুহূর্ত্তের চালচলন ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে এইগুলি লক্ষ্য করতে হয়। একটু নজর করলেই ধাঁজ টের পাওয়া যায়।

একটি মা এসেছেন বাইরে থেকে। তিনি পুত্রশোকের পর খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ হ'য়ে পড়েছেন। খুব বেশি কথা বলেন। তিনি বললেন—ঠাকুর! আমার অনেকগুলি কথা আছে আপনার সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকমত বলিস।

মা-টি বললেন—বাবা! আমার এখন বলতে পারলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে বল্।

বলতে সুরু ক'রে তিনি অনেক অসংলগ্ন কথা বলতে লাগলেন, তাতে অনেকেই বিরক্ত হচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিন্তু ধৈর্য্য-সহকারে শুনছেন। পরে বললেন—তোর ছেলের কী হইছিল ?

ছেলের কথা তুলতেই খুশি হ'য়ে ছেলের সম্বন্ধে নানাকথা বলতে লাগলেন। কিছু-সময় পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সুরে বললেন—এইরকম ছেলের কথা কি ভোলা যায় ?

এতে মা-টি কেঁদে আকুল হ'য়ে বললেন—সত্যি বলেছেন ঠাকুর। ওর কথা ভুলতে পারি না—ভোলা যায় না। সবাই বলে ভুলে যেতে। কিন্তু আমি যে পারি না তা' বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর ভোলার দরকার কী ? তার কথা বলতে ভাল লাগে তো বলবি, তার জন্য কাঁদতে ইচ্ছা করে তো কাঁদবি, তার কথা ভাবতে ভাল লাগে তো ভাববি। কিন্তু সে যেখানে থাক্, তার মঙ্গল যাতে হয় তাই তো চাস! তাই পরমপিতাকে খুব

ডাকবি আর তার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করবি। তোর কোলে না-হয় আজ নেই, কিন্তু কোথাও-না-কোথাও সে আছেই; পরমপিতার নাম করবি আর বলবি—সে যেখানেই থাক্, ভাল থাক্, শান্তিতে থাক্।

মা-টি বললেন—এতে কি তার ভাল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যেখানেই থাক্, পরমপিতার এলাকার বাইরে তো নেই! তাই, পরমপিতার দয়ায় সবই হ'তে পারে। তাই, পরমপিতাকে ডাকার কথা বলছি।

মা-টি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বললেন—সবাই আমাকে নাম করার কথা বলে, কিন্তু এইভাবে বুঝিয়ে কেউ বলেনি। ওর ভালর জন্য যদি ভগবানের নাম করতে হয়, তা' বোধহয় পারব। ও শত্রুর, আমাকে দাগা দিয়ে গেলেও ওর ভাল হোক, আমি এ-ই চাই।

এরপর মা-টি উৎফুল্ল হ'য়ে বিদায় নিলেন।

রমেশদা (চক্রবর্ত্তী)—ঠাকুর! আপনি সকাম প্রার্থনা করতে বারণ করেন, অথচ মা-টিকে যা' করতে বললেন—তা' তো সকাম প্রার্থনা ব'লে মনে হয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গীতায় তো আছে 'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং'—না কি জানি?

রমেশদা—আজ্ঞে হ্যাঁ! তৃতীয় অধ্যায়ে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমারও ঐ-রকম মনে হয়। যে যে-অবস্থায় আছে, সেইখান থেকে যাতে পরমপিতার দিকে এগোতে পারে, সেই যুক্তি-বুদ্ধি বাতলানই শ্রেয়। তাহ'লে তাতেই মানুষ উপকৃত হ'তে পারে। মা-টি ছেলের শোকে নিমজ্জিত হ'য়ে আছে। ওর কাছে এখন নিষ্কাম ভক্তিতত্ত্ব যতই আওড়ান যাক-না-কেন, তা' তার মাথায় ঢুকবে না। আর, আমার মনে হয়, মানুষের মনের অবস্থা না-বুঝে ঐ ভাবের উপদেশ দেওয়া একটা cruelty (নিষ্ঠুরতা)। যে-কোন মানুষই আমার কাছে আসুক না কেন, আমি নিজেকে তার অবস্থায় ফেলে ভাবতে চেষ্টা করি—আমার এমনতর অবস্থা হ'লে কী হ'ত। সেই অনুভূতি থেকে যেখানে যেমনতর বলা বা করা আসে, পরমপিতা যেমনতর জোয়ান, তেমনতর বলি বা করি। তা'ছাড়া কারও মঙ্গল যাতে হয় তা' করায় বা তেমনতর আবেদন-নিবেদন ভগবানের কাছে করায় কোন দোষ নেই। সন্তানের মঙ্গল তো মানুষ চাইবেই। প্রিয়জনের মঙ্গল ভাবা, মঙ্গল চাওয়া ও মঙ্গল করার অভ্যাস যদি মানুষের হয়, তা' কখনও ইষ্টনিষ্ঠার পরিপন্থী হয় না—যত-সময় ইষ্ট ও পরিবেশের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা' করা যায়। অবশ্য, এই সামঞ্জস্য নষ্ট ক'রে কারও প্রকৃত মঙ্গল কখনও করা যায় না। যা'হোক, স্নেহ-মমতার স্বাভাবিক বন্ধনকে

অস্বীকার না ক'রে, তাকে যাতে মাঙ্গল্য-নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তাই করাই ভাল। পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-পরিজন থেকে সুরু ক'রে পরিবেশ, সমাজ, দেশ—সবার সত্তাকেই মানুষ পালন-পোষণে প্রতুল ক'রে তুলতে অভ্যস্ত হোক—এবং তা' ইষ্টার্থে। এই-ই হ'ল সহজ ধর্ম্ম। মমতার বিনাশ না-ক'রে বিস্তার করতে হবে। মানুষের কামনা তো একেবারে যায় না, তাই কামনা রাখতে হয়—যাতে ইষ্ট ভাল থাকেন, পরিবেশের প্রত্যেকে ভাল থাকে। আর, এই কামনা পূরণের জন্য যা' যা' করার তাও করতে হয়। ছেলেপিলে বা আপনজন এর ভিতর-থেকে বাদ পড়ে না। ইষ্টকে মুখ্য ক'রে ধরলে তাই সবাইকেই ধরা হয়। আবার, কোন-একটা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করতে গেলেও, ইষ্ট ও জগৎ-সংসার-শুদ্ধ টান প'ড়ে যায়। ভালবাসতে যে জানে, অপরের ভালতে বাস করতে অভ্যস্ত যে, তার পথ এন্তার খোলা। তবে, নামের অপার মহিমা। নামে রস পেয়ে গেলে মানুষ দেখে যে ইষ্টই তো মুখ্য জীবনে। তাই, ছলে, বলে, কৌশলে মানুষকে নামের তরঙ্গের মধ্যে ফেলে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর তারাপদদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার যে শিশুগাছের কাঠ পাঠাবার কথা ছিল, তা' কি পাঠাইছ নাকি?

তারাপদদা—না! এখনও পাঠাতে পারিনি। চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন দায়িত্ব নিয়ে তা' সময়মত পালন না-করলে কিন্তু অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যায়। অভ্যাস খারাপ হ'লে নিজেরই ক্ষতি। তাড়াতাড়ি করা লাগে।

তারাপদদা—এইবার গিয়েই তাড়াতাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করব।

ফরিদপুরের একজন কর্ম্মী একজন সৎসঙ্গী-ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—পরস্পর স'য়ে-ব'য়ে চলতে হয়। বেশি দোষ দেখতে থাকলে নিজের চলনই খারাপ হ'য়ে যায়। খারাপ যাকে বলছ, তার ভিতরও ভাল কতটুকু আছে, সেইটে টেনে বের করতে চেষ্টা করবে। তোমার কাছে এসে তোমার দৃষ্টান্তে, তোমার স্নেহভালবাসায় মানুষ যদি ভালর দিকে না যায়, তাহ'লে তোমার কৃতিত্ব কোথায়? তোমরা এই দিক্ দিয়ে যদি কৃতী হও, তাহ'লে আমার মনে হয়, আমিই যেন বেড়ে উঠলাম। তোমাদের দিয়েই তো আমার গৌরব। তোমরা এক-এক জন বহু মানুষের আশ্রয় হ'য়ে ওঠ। তোমাদের আওতায়, তোমাদের প্রীতিভরা শাসনে, তোষণে মানুষের দোষের স্খালন হোক, তারা তৃপ্ত হোক; দীপ্ত হোক। কারও প্রতি বিরক্ত বা বিদ্বিষ্ট হ'লে কিন্তু তার ভাল করতে পারবে না। মানুষ বড় অসহায়, প্রবৃত্তির ঘোরে চলে, তার উপর তাদের হাত

নেই, তাই ভুল করে। তোমরা ঋত্বিক্, তোমরা যদি সহ্য, ধৈর্য্য নিয়ে তাদের শুধ্রে না-নেও, তাহ'লে তাদের দেখবে কে? তাদের পাশে দাঁড়াবে কে? তাদের উপায় কী হবে? আবার, নিজের দিকেও ভাল ক'রে চেয়ে দেখতে হয় নিজের কোন ত্রুটি আছে কিনা।

সুরেনদা (ভৌমিক) বললেন—জ্ঞানের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সৎসঙ্গীরা সঙ্কল্পবদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, আশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হ'লে দলে-দলে তারা এখানে আসবে। এমনতর ব্যাপার যাতে আর না ঘটতে পারে, তা' তারা দেখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' ঘটে গেল, তার তো আর প্রতিকার হবার নয়। যা'-হোক সৎসঙ্গীদের মধ্যে যে এই ভাব জেগে উঠেছে, এটা খুব ভাল! এখন অবস্থা অনেকটা শান্ত, তা'হলেও খারাপের জন্য প্রস্তুত থাকাই লাগে।

শৈলমা এসে নালিশের সুরে বললেন—ঠাকুর! আমি আনন্দবাজারে গিয়েছিলাম তরকারি কুটতে, আমাকে তরকারি কুটতে দিল না, তাড়িয়ে দিল!

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কেডা রে? তোরে আবার তাড়াবি কেডা? হয়তো এখন দরকার নেই, তাই বলিছে।

শৈলমা—তাও তো মিষ্টি ক'রে বলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মিষ্টি তো সবার ভাঁড়ারে সব-সময় থাকে না। না-থাকলে দেবে কী ক'রে? তুই ওর জন্য মন খারাপ করিস না। তবে, নিজে তৈরী থাকিস যাতে অন্যকে দেদার মিষ্টি বিলাতে পারিস—কথায়, বার্ত্তায়, ব্যবহারে।

শৈলমা ফিক ক'রে হেসে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সুর ক'রে)—জয় রাধে, রা-ধে বোল।……(পরক্ষণেই বলছেন)—অনেক বৈষ্ণব আছে বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়, যে-বাড়িতে আদর ক'রে ভিক্ষা দেয়, সে-বাড়িতেও 'জয় রাধে, রাধে বোল' ব'লে খঞ্জরী বাজিয়ে গান করে, আবার যে-বাড়িতে দেয় না, সে-বাড়িতেও খঞ্জরী বাজিয়ে গান শুনিয়ে আসে। তুইও কোথায় কি পেলি-না-পেলি সে বিচার না-ক'রে মিষ্টি ক'রে পরমপিতার নাম শুনিয়ে যাবি সবাইকে। অন্যে শান্তি দিক্ বা না-দিক্, নিজের তো শান্তিতে থাকা লাগবে, তাই, একটা রোখ বা রকম ধ'রে থাকতে হয় যাতে নিজের শান্তির ব্যাঘাত না হয়, আবার অন্যকেও কিছুটা শান্তি দেওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর মদনদাকে বললেন—তুই ব্রেড-ফ্রুটের গাছ চিনিস? তার ফলই নাকি রুটির মত হয়!

মদনদা—চিনি তো না-ই, নামও শুনিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রোব নার্শারীতে নাকি চারা পাওয়া যায়। দেখিস তো, কিছু কিনে পাঠাতে পারিস নাকি। লোকের যেমন খাবার কষ্ট, জিনিসটা যদি কাজে লেগে যায়, যার কাছে পাঠাবি, ব'লে দিবি যেন বড়খোকার কাছে দেয়।

হরিশদাকে বললেন—ও তো পাঠাবেই। তুইও চেষ্টা করিস কিছু পাঠাতে।

উভয়েই সম্মতি জানালেন।

১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৫০ (ইং ১৮।৭।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রমপ্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন। ঋত্বিক্-অধিবেশন চলছে। তাই, চারিদিকে বহু দাদা ও মায়েদের ভিড়। বর্ষাকাল, তাই, কোন-কোন জায়গায় জল জমে কাদা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাটিতে তাই অনেকে এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভবতারণদা (বসু) শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—লোকের খুব অন্নকষ্ট, এ-অবস্থায় আমরা কী করতে পারি ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটি সৎসঙ্গীকে ব'লে দেবেন, তারা তাদের সাধ্যমত অন্যকে যেন দেখে। পরস্পর পরস্পরকে দেখবে, পরস্পর পরস্পরের জন্য করবে, এ-ছাড়া আর উপায় কী ? আর, মানুষ যেন হতাশ না হয়, মনোবল না-হারায়। অভাব, কষ্ট এ-সব তো আসেই, আবার মানুষই তা' পার হয় চেষ্টার ভিতর-দিয়ে। দীক্ষিত হোক বা অদীক্ষিত হোক, যাদের ঢের আছে তাদের প্রবুদ্ধ করতে হয়, যাতে তারা অন্যকে দিয়ে তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করে। এই দুর্দ্দিন যে আসবে, তা' আমার অনেক আগেই মনে হয়েছিল। প্রায় দেড় বছর ধ'রে আমি আপনাদের এর জন্য প্রস্তুত হ'তে বলছিলাম। কিন্তু যতখানি তীব্রতা নিয়ে' এ-সব কাজ করা লাগে, তা' আপনারা করেননি। তাহ'লে আজ এই অবস্থা হ'ত না। ধান-চাল সংগ্রহের কথা, জমি কেনার কথা আমি কতদিন থেকে বলছি। সময় মত করলে আজ এত ভাবনা ছিল না।

এবার কুষ্টিয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব হবার কথা। বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য), যতীনদা (নাথ), সত্যদা (দত্ত), বিষ্টুদা (বিশ্বাস) প্রমুখ কথা তুললেন—কিভাবে কী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসব মানে আমি তো বুঝি vigorous (উদ্দীপ্ত) যাজন, যা'তে মানুষ মঙ্গলের অধিকারী হয়, উন্নতির অধিকারী হয়। তাই, আপনারা মূল ব্যাপারের দিক্ লক্ষ্য রাখবেন, তাহ'লে আর-কোন অসুবিধা হবে না। সবাই যদি আনন্দের প্রেরণা না-পায়, উন্নতির প্রেরণা না-পায়, রিক্ততা থেকে সম্পদে দাঁড়াবার

যোগ্যতা আহরণ না-করে, তাহ'লে উৎসবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে গেল জানবেন।... আর, টাকা-টাকা করলে কখনও টাকা আসে না, টাকা আসে—মানুষের মন, প্রাণ ও উৎসাহকে উচ্ছল ক'রে তুললে। মন, প্রাণ ও উৎসাহ যদি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে, সেই উচ্ছলতাই শুভপ্রসূ কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে আত্মপ্রকাশ ক'রে মানুষকে স্বচ্ছল ক'রে তোলে! ঐ উচ্ছল সম্বেগই আবার দেবার প্রবৃত্তিকে উসকে তোলে। অমনতর-ভাবে অবদান-আহরণে দাতা-গ্রহীতা উভয়েরই উপকার হয়। নিজের অন্তর দৈন্যক্লিষ্ট থাকলে অন্যের ভিতর একটা প্রাণোচ্ছল ভাবের উদ্বোধন করা যায় না।

বিরাজদা—যে অভাবে পীড়িত, সে দেবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি পাওয়ার ধান্ধায় অভিভূত থাকবেন কেন? আপনার ধান্ধাই তো থাকবে মানুষকে উচ্ছল ক'রে তোলা। আপনি যদি অভাববোধে পীড়িত না-হন, আপনি যদি ভাবে ভরপুর থাকেন, আপনার নেশাই হবে মানুষকে ভরপুর ক'রে তোলা। এই যে মানুষকে ভরণে, পূরণে উচ্ছল ক'রে তুলবার আগ্রহ, মানুষকে ভাবোদ্দীপ্ত ক'রে তুলবার দক্ষতা, তাই-ই অন্যের অভাববোধকে হটিয়ে দিয়ে তার ভিতর জাগিয়ে তুলবে কর্ম্মময় ভাববোধনা। সেটাকে মানুষ একটা বাস্তব প্রাপ্তি ব'লে বোধ করবে। আপনার তো কোন প্রত্যাশা নেই তার কাছ-থেকে, আপনার প্রত্যাশা হ'ল তাকে প্রকৃত লাভবান ক'রে তোলা। সে যদি লাভবান্ হয়, সেই-ই আপনার মস্ত লাভ। প্রীতির সঙ্গে যদি কিছু দেয়, সেটা আপনার উপরি পাওনা। ভাবের ভাবী যে, অনুরাগী যে, অভাব তাকে কমই কাবু করতে পারে। কারণ, অভাববোধ তার মনকে কমই আক্রমণ করে। মন তো তার প্রিয়কে নিয়েই বিভোর। আবার, প্রিয়ের তোষণ-পোষণ-পালনে সদা সক্রিয় যে, ঐ প্রচেষ্টাই তাকে প্রতুল ক'রে তোলে।

অজিতদা (দত্ত)—মানুষ কাউকে-না-কাউকে তো ভালবাসেই, কিন্তু তাতে তো তার কষ্ট ঘোচে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ইষ্টকে ভালবাসতে হয় মন-প্রাণ দিয়ে। ইষ্ট মানে মূর্ত্ত মঙ্গল। He is a man of solved complex (তিনি সমাহিত-বৃত্তি), তাঁকে ভালবাসায় আমাদের complex (বৃত্তি)-গুলিও solution (সমাধান)-এর পথে চলে।

মতিদা (চ্যাটার্জী)—দেবতা বা ইষ্টের পূজা, অর্চ্চনা, সন্ধ্যা, প্রার্থনা, আরাধনা ইত্যাদির মূল তাৎপর্য্য কী? তা' করতে হয় কিভাবে? এবং কিভাবেই বা তা' সার্থক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর প্রধান লক্ষ্য হ'ল চারিত্রিক অনুরঞ্জনা। দেবতার পূজা-অর্চ্চনা

করতে গেলে আগে ইষ্টের ভাব অন্তরে জাগ্রত ক'রে সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে দেবতার স্মরণ-মনন করতে হয়। তাঁকে স্মরণ করা মানে—তাঁর চলন-চরিত্র ও গুণগরিমা স্মৃতিতে এনে অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করা, আর, মনন করা মানে—ঐ ভাব ক্রমাগত চিন্তার ভিতর-দিয়ে মনোজগতে উচ্ছল ক'রে তোলা যাতে আচরণ ও চরিত্র তাঁতে অভিষিক্ত হ'য়ে ওঠে। ঐ ভাব অন্তরে এমনভাবে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠা চাই যে প্রত্যেকটি চলনের ভিতর তার ছাপ পড়ে, এবং তার প্রভাবে যা'-কিছু ভাবা, বলা, করা, চলা, বোধ ও জানা—এক কথায় সমগ্র ব্যক্তিত্বই ঐ ভাবে বিনায়িত হ'য়ে ওঠে। তাঁর মননের মধ্যে কিন্তু তাঁর রূপটাও আছে। গুণের চিন্তা করতে গেলে গুণের অভিব্যক্তি যে রূপের ভিতর-দিয়ে যে-রকমে হয়, তারও অনুধ্যান করতে হবে। আর, সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলি হাতে-কলমে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতে হবে! তাঁর গুণগুলি আলাদা-আলাদা ক'রে খুঁটিনাটিভাবে এবং সবগুলি একত্র ক'রে সামগ্রিকভাবে অভ্যাসগত ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। একদিনে এটা হবে না—এতে সময় লাগবে। তাই, একটা মুগ্ধ, আকুল, নাছোড়বান্দা সম্বেগ নিয়ে লেগে-প'ড়ে থাকতে হবে। তাঁর রকমে অভিব্যক্ত হ'য়ে তদনুগ চলনে চলতে হবে। ভুলভ্রান্তি হ'লেও বা বাধাবিপত্তি আসলেও না ঘাবড়ে সঙ্কল্প-সাধনে তৎপর থাকতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশকেও ঐভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হবে। ভাবের মধ্যে আছে হওয়া আর হ'তে যা' করতে হয়, তা' করা। দেবতার পুজো-অর্চ্চনা সার্থক হয় এমনতর ক'রেই। ইষ্ট-আরাধনা করতে গেলেও চাই পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে তাঁর নির্দ্দেশগুলিকে বাস্তবে মূর্ত্ত করা, তাঁর চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজের ভিতর assimilate (আত্মীকৃত) করা। আরাধনা নানা ব্যাপার বা নানা বিষয়ের হ'তে পারে। সেদিক্-দিয়ে আরাধনা মানেই হ'চ্ছে সশ্রদ্ধ আগ্রহ-অনুরাগ নিয়ে কোন-কিছু হাতে-কলমে করতে তৎপর হওয়া, যেমনভাবে, যে-পদ্ধতিতে তা' নিখুঁত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় তা' করা, ঐ কাজের প্রত্যেকটি অংশ সঙ্গতি-সহকারে নিশ্ছিদ্রভাবে ক'রে সামগ্রিকভাবে পুরো কাজটিকে যথাযথভাবে সুসিদ্ধ করা, নিষ্পন্ন করা—বিহিত বিশেষের সুসংযোগে! তাই, যখন যে-আরাধনা করতে হবে সেই আরাধনার ধারা-অনুযায়ী নিজেকে দীপন তালে নিয়ন্ত্রিত ও বিন্যস্ত করতে হবে—সব করায়, সব চলায়, সব বলায়, সব ভাবায়। আহার, বিহার, চালচলন, আচার-আচরণ সবই ঐ খাতে প্রবাহিত করতে হবে। কোন-কিছু বেসুরো বা বিরুদ্ধ রকমকে প্রশ্রয় দিলে আরাধনায় বিঘ্ন উপস্থিত হবে এবং সিদ্ধিও বিলম্বিত হবে তাতে। এ-কথা বিশেষ ক'রে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিহিত করণই

বিহিত ফল প্রসব ক'রে থাকে, অবিহিত চলন বিভ্রান্তিরই স্রষ্টা।

প্রমথদা (দে)—গুরুকে অবলম্বন ক'রেই যখন যা-কিছু সব, তখন গুরু-নির্ব্বাচনে যদি মানুষের ভুল হ'য়ে যায়, তাহ'লে তো খুব বিপদের কথা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা ঠিকই। অজান্ মানুষ যে, যে নিজেই পথের সন্ধান জানে না, সে অন্যকে পথের সন্ধান দেবে কী ক'রে? তিনটে জিনিস বিশেষ করে দেখতে হয়। প্রথমতঃ দেখতে হয়—পূর্ব্বতন প্রাজ্ঞ আচার্য্যদের ধারার সংগে তাঁর মিল আছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ দেখতে হয়—তিনি বৈশিষ্ট্যের পরিপালন ও পরিপোষণ ক'রে চলেন কিনা, তৃতীয়তঃ দেখতে হয়—তাঁর গুরুনিষ্ঠা কেমন। গুরুনিষ্ঠার লক্ষণ হ'ল আত্মপ্রতিষ্ঠায় ঔদাসীন্য, গুরুর প্রতিষ্ঠায় উদগ্র আগ্রহ। আর-একটা ছোট্ট জিনিস দেখতে হয়—সেটা হ'ল কথায়-কাজে সংগতি। মানুষ যা' বলে, তা' যদি নিজে আচরণ না-করে, তাহ'লে সেখানে সন্দেহের অবকাশ আছে বুঝতে হবে। তবে গোড়ারগুলি যদি ঠিক না-থাকে, তবে কথায়-কাজে মিল থাকলেও কিন্তু তিনি অনুসরণযোগ্য নন।

অতুলদা (রায়)—আমরা যা' বুঝি, আমাদের চলন তদনুযারী নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে ভিন্ন পথে চলে কেন? আপনার নীতিগুলি সত্য ব'লে বুঝি, কিন্তু চলনের ভিতর-দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাসের অসাধারণ শক্তি। তাই-ই আমাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সেইজন্য যা' সত্য ব'লে বোঝ, exercise (অভ্যাস)-এর ভিতর দিয়ে তাকে habit (অভ্যাস) ক'রে ফেলা লাগে। কেষ্টদার কাছে শুনেছিলাম, একজন লোক বহুদিন নাকি সৈন্যবিভাগে কাজ করেছিল। বহুবছর ধ'রে ড্রিল করায় তার অভ্যাস এমন হ'য়ে গিয়েছিল যে attention (মনোযোগ) বললেই সে সেই ভঙ্গীতে না-দাঁড়িয়ে পারত না। সৈন্যবিভাগের কাজ ছেড়ে দেবার পরও তার ঐ অভ্যাস যায়নি। হয়তো মাথায় দুধের হাঁড়ি নিয়ে যাচ্ছে, কোন দুষ্টু ছেলে হঠাৎ বলল 'attention' (মনোযোগ), অমনি সে হাত টান-টান ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে বাধ্য, কোথায় দুধ তখন কোথায় গেল। অভ্যাসে এমনতরই হয়। সদভ্যাস গঠন ক'রে বদভ্যাসের প্রভাবমুক্ত হ'তে হবে। খারাপ ব'লে যেটা বুঝবে, সেটা কিছুতেই আর করবে না। একবার বেশি করা মানে, তাকে আরো শক্তিমান্ ক'রে তোলা। যা' ক্ষতিকর তাকে প্রভাবশালী হ'তে দেবে কেন? এইটে ঠিক জেনো—আচরণে স্বতঃ হ'য়ে আছে যা', তাই-ই তোমার মাথায় শিকড় গেড়ে আছে। আচরণ সাফ না হ'লে কিন্তু মাথাও সাফ হবে না। তাই, শুধু মাথার বুঝে বা বচনের বুঝে খুশি থেকো না। ও মোটেই

টেকসই নয়। তোমার স্বাভাবিক চলন কোন্ ঝোঁকের পরিচয় দেয়, সেইটে লক্ষ্য ক'রো এবং তা' ক্রমাগত নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লো। একেই বলে সাধনা।

নরেশদা (অধিকারী)—যাজন করতে গিয়ে ২।৪ জনের কাছে যেভাবে কথা ব'লে খুব ভাল ফল পেলাম, সেই ভাবে আর-একজনের কাছে কথা বলতে গিয়ে হয়তো দেখলাম, কোনই ফল হ'ল না। যাজনের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট কায়দা কী আছে, যা' প্রত্যেকের কাছে প্রাণস্পর্শী হবেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর —প্রথম জিনিস হ'ল, তার প্রতি interested (অন্তরাসী) হ'য়ে, তাকে তোমার প্রতি interested (অন্তরাসী) ক'রে তোলা। তারপর যার যেমন চাহিদা, বৈশিষ্ট্য ও ঝোঁক, সেই-অনুযায়ী তার সঙ্গে কথা বলতে হয়, ব্যবহার করতে হয়। যাজনের কোন একঢালা নিয়ম নেই। প্রত্যেকটা মানুষই যে আলাদা। মানুষটাকে বোধ ক'রে, সেই তালে চলতে হবে, বলতে হবে। একঘেয়ে রকম হ'লে ভাল হয় না। আদর্শ ও উদ্দেশ্য ঠিক রেখে নটের মত হ'তে হয়। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন pose (ভঙ্গী) ধরতে হয়। অষ্টপাশ-মুক্ত না হ'লে মানুষ কিন্তু সাবলীল ও সড়গড় হয় না। ভাব যদি অকৃত্রিম হয় এবং তার অভিব্যক্তি যদি অবাধ, সহজ ও শোভন হয়, তবে তা' প্রত্যেকের প্রাণ স্পর্শ করে। তাই, ভাবমুখী হ'য়ে থাকতে হয়, একটা ইষ্টরঙ্গিল, আনন্দময় কর্ম্মমুখর উল্লাস জাগিয়ে রাখতে হয় প্রাণে। ঐ হওনমুখী উল্লাসের হাওয়া একের থেকে চারিয়ে যায় অন্যের ভিতর। যাজন এমনি-ক'রে চরিত্রে স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে আবার মধুর ও শক্তিমান্ ব্যক্তিত্বের দ্যোতনা ফুটে ওঠা চাই। হাল্কা ও দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে কিন্তু মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করা যায় না।

রমণদা (পাল)—সবার ব্যক্তিত্ব তো মধুর ও শক্তিমান্ নয়। দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব যাদের, তারা কী করবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conviction (প্রত্যয়) যার যত পাকা, ব্যক্তিত্বও তার তত শক্তিশালী হ'য়ে ওঠে। ইষ্টনিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন, কৃতী অথচ নিরহঙ্কার যারা তাদের মানুষ শ্রদ্ধা না-ক'রেই পারে না। দক্ষতা ও বিনয়—এই দুইয়ের সমাবেশ চাই। দক্ষতা আসে করার ভিতর দিয়ে। আর, দক্ষতার ভিতর দিয়ে আসে আত্ম-প্রত্যয়। তাই করিতকর্ম্মা হওয়া লাগে, মঙ্গল-কর্ম্মে কৃতী হওয়া লাগে। কাজের লেক না-হ'লে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয় না। অলস হ'য়ে থেকো না, ইষ্টকে মাথায় নিয়ে চল, কর, জীবনের বিভিন্ন দিকে কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠ, ব্যক্তিত্ব দিন দিন প্রভাম্বিত হ'য়ে উঠবে।

প্রভাতদা (দে)—মানুষ বড় হ'লেই সাধারণতঃ অন্যে তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়। অকারণ নিন্দা করে। ভাল হ'য়েও মানুষের রেহাই নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈর্ষ্যা যাদের স্বভাব তারা ঈর্ষ্যা করবেই। কিন্তু অন্যে তোমার নিন্দা করলেও তুমি তাদের নিন্দা ক'রো না। তুমি তাদের প্রশংসার যতটুকু জান তাই-ই ব'লো। আর, যতই বড় হও না কেন, বিনয়পূর্ণ ব্যবহার নিয়ে চ'লো। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যে, তাকেও বিহিত শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা দেখিয়ে চ'লো! তোমার ক্ষমতায় যতখানি কুলায়, প্রত্যেকের ভালই ক'রো। ভালবেসো প্রত্যেককে। এতে দেখবে, ঈর্ষ্যা ক'রেও তোমার কিছু করতে পারবে না। মানুষ আস্তে-আস্তে সবই বুঝতে পারবে। আমার ডাক্তারী জীবনে অন্য ডাক্তাররা আমার ক্ষতি করতে কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু তাতে আমার পসার বেড়েছে ছাড়া কমেনি। বরং যারা অযথা নিন্দাবাদ করেছে, তাদের উপরই মানুষ চ'টে গেছে। তবে, রোগীর ভাল যাতে হয়, তাই কিন্তু ছিল আমার লক্ষ্য। পয়সার কথা কোনদিন ভাবিনি। রোগীকে আরাম ক'রে তোলাই ছিল আমার interest (স্বার্থ)। কোন রোগীর ভার নিলে, তার খবরের জন্য ছটফট করতাম। বার-বার রোগীর বাড়িতে গেলে ডাক্তারের কদর থাকে না, তাই রোগীর বাড়ির আশপাশ দিয়ে ঘুরতাম। যদি বাড়ির কারও সঙ্গে দেখা হয়, আর-একবার দেখতে বলে, তা'হলে বর্ত্তে যাই। এই রকম ছিল মনের অবস্থা। রোগীর জন্য ভাবতামও খুব, খাটতামও খুব। সব দিক্ ভেবে-চিন্তে, প'ড়ে-শুনে নির্ঘাত ওষুধ দিতাম। তাই, যত কঠিন রোগই হোক, প্রায় সবাই তাড়াতাড়ি সেরে উঠত। ভাল করতে পারিনি, এমন ঘটনা বড় একটা মনে পড়ে না। আর, আমার পসার বাড়াবার জন্য কাউকে খাটো করা লাগতে পারে, এমনতর কথা আমার কোনদিন কল্পনায়ও আসেনি। আমি বুঝি, মানুষকে বড় করা মানে বড় হওয়া, আর খাটো করা মানে খাটো হওয়া। তবে, অকারণ অত্যাচার ও ষড়যন্ত্রও যথেষ্ট হ'য়ে থাকে। সত্যের প্রতিষ্ঠা যারা করতে চায়, তাদের শত্রুর অন্ত নাই। তাই অস্তিত্ব যাতে বিপন্ন না হয়, সেজন্য হুঁশিয়ার থাকতে হয়।

অক্ষয়দা (পুততুণ্ড)—হুঁশিয়ার থাকা বলতে কী করতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলা লাগে, কোথায় কে কী মতলব বা অভিসন্ধি নিয়ে ঘুরছে এবং কারও ক্ষতি করার মতলব থাকলে সে যাতে ক্ষতি করতে না পারে, তেমনতর ব্যবস্থা ক'রে রাখা লাগে। আপনি ভাল কাজ করলেও, অসৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ও অসূয়া-পরবশ যারা, তারা কোন্ ভাবে তা' ব্যাখ্যা করবে, এবং তাদের কোন্ প্রবৃত্তি আহত হওয়ার ফলে তারা কী বাঁক নেবে, এটা আঁচ

করা চাই এবং আঁচ ক'রে তার প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই। শয়তানী বুদ্ধির দ্বারা অভিভূত হওয়া ভাল নয়, কিন্তু শয়তানের ক্রিয়াকলাপ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাও নিরাপদ নয়, তাতে বেঘোরে প'ড়ে যেতে হয়। তাই, ভালমন্দ এই দুই সম্বন্ধেই পাকা বুঝ থাকা চাই, এবং মন্দকে প্রয়োজনমত neutralize (নিষ্ক্রিয়) ও utilize করার (কাজে লাগাবার) কৌশলও আয়ত্ত করা চাই। আমি ভাল করছি, মানুষ আমার খারাপ করবে কেন ?—এ-ধারণাই কিন্তু ভুল। ভাল করা সত্ত্বেও দুষ্ট প্রকৃতির লোক খারাপ করে ও খারাপ করবে, take it for granted (এটা নিশ্চিত ব'লে ধ'রে নেবেন)। এটা ধ'রেও নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাও রাখতে হবে যাতে খারাপ করতে চাইলেও খারাপ করতে না পারে। বহুলোকের দায়িত্ব নিয়ে যারা চলবে, তাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি চাই। তা'ছাড়া, আপনি হয়তো ভাল মানুষ, ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে ভাল কাজই আপনি করতে চান। আপনার হয়তো দশটি hand (সহকারী) আছে, তাদের কে কোথায় কার সঙ্গে কী ব্যবহার করছে, কে কিভাবে কোন্ কাজ করছে, সেগুলি যদি আপনার নখদর্পণে না থাকে, এবং তাদের যদি আপনি বাগ মানাতে না পারেন, তাহ'লে কিন্তু তাদের দোষেও আপনাকে দুর্ভোগ ভুগতে হবে। তারা যদি কোন অন্যায় করে, লোকে মনে করবে, আপনি তাদের উসকে দিয়েছেন। অথচ আপনি হয়তো তার কিছুই জানেন না। এইভাবে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে এসে পড়ে। অবশ্য, আপনার hands (সহকারী) যারা, তাদের দোষ-ত্রুটির জন্য আপনাকে দায়ী করা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তাই, ভিতর-বাহির উভয় দিক্ সামাল দিয়ে চলতে হবে। সব দিকে নজর রেখে চলার অভ্যাস করতে হবে।

এমন সময় মাষ্টারমহাশয়কে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার এনে দিতে বললেন।

মাষ্টারমহাশয় (ডাঃ শশিভূষণ মিত্র) বললেন—না বাবা! তুমি ব'সো, আমার এখন অন্য কাজ আছে, আমি বসব না, চেয়ার আনাতে হবে না আমার জন্য।

যতীনদা জমি কেনার কাজকর্ম্ম নিয়ে আছেন। তাঁকে ডেকে নিভৃতে কয়েকটা কথা বললেন।

এই কথাবার্ত্তার পর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), মন্মথদা (দে), সুবোধদা (সেন), মনোরঞ্জনদা (ব্যানার্জ্জী), অনিলদা (গাঙ্গুলী), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ অনেকে আসলেন।

কেষ্টদা কথায়-কথায় বললেন—Ritwik manual* (ঋত্বিক্-সাথী) প্রথম

বেরিয়েছিল বছর চারেক আগে। তারপর এই চার বছরের ভিতর আপনি organization (সংগঠন) সম্বন্ধে অনেক নূতন বিধান দিয়েছেন। সেগুলি নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, ভাবছি পরের ওগুলি একত্র ক'রে আপনাকে দেখিয়ে ঋত্বিক্‌-সাথীর পরিশিষ্ট-হিসাবে ছাপিয়ে ফেলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাপানই তো ভাল। সব কথা তো সব সময় স্মরণ থাকে না। তাই ছাপালে কাজের সুবিধা হবে।

কেষ্টদা বললেন—এখন অধিবেশনে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা সব মনে থাকে যেন। কর্ম্মী কিন্তু চাই-ই। আর, জমির কথা বিশেষ ক'রে বলবেন।

সুবোধদা—সৎসঙ্গী অভিভাবক ও ছেলেদের সাহায্যে এবার বিনাখরচায় কয়েকটি গরীব অথচ ভদ্রপরিবারের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উল্লসিত হ'য়ে)—এ তো একটা মহাপুণ্য কাজ। গরীবের মেয়েকে সৎপাত্রস্থ করার ব্যবস্থা—এ কি একটা যে-সে কাজ? এ-কাজ যারা করে, তারা পরমপিতার অজস্র আশীর্ব্বাদের অধিকারী হয়। সমাজের মোড়ল যারা, তারা আগে দেখত যাতে কারও মেয়ে অবিবাহিত না থাকে, অপাত্রে না-পড়ে। তোমরা ঋত্বিক্‌রা হ'লে সমাজের মোড়ল-স্থানীয়। তোমরা এদিকে লক্ষ্য দিলে মানুষের খুব উপকার হবে। আর, এদিকে লক্ষ্য না-দিলেও উপায় নেই। শিরে করলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধবে কোথা?

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে অনেকে হেসে ফেললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাসির কথা নয়। বিয়ের মধ্যে যদি গলদ ঢুকে যায়, তাহ'লে জাতির শিরে সর্পাঘাত হ'য়ে যাবে, তারপর আর ওঝাগিরি ফলাবার জায়গা থাকবে না। ভাল মানুষই জন্মাবে না। বাইরে দেখতে মানুষের চেহারা অথচ ভিতরে যদি মানুষের সত্তা না থাকে, তাহ'লে তাদের উপর যতই ঋত্বিকতা কর-না-কেন, সুফল কমই ফলবে তাতে।

এরপর কর্ম্মীরা বিশ্ববিজ্ঞানে ঋত্বিক্‌-অধিবেশনে গেলেন।

১৮ই আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৫০ (ইং ৫।১০।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্ট। পূজা আগত। আকাশে-বাতাসে আনন্দের স্পন্দন। শরতের স্বর্ণ-কিরণে উৎসবের আহ্বান। কিন্তু মন্বন্তরের বৎসর, তাই মানুষের মনে সুখ নেই। তবু শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে মানুষ আশা

পায়, ভরসা পায়, প্রাণ পায়, প্রেরণা পায়, সমস্যার সমাধান পায়। তাই এখানে এসে মানুষ যেন দুঃখকষ্ট ভুলে যায়। হাসে, গল্পগুজব করে, আনন্দ করে।…শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে এখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়) প্রমুখ আছেন। কিছুদিন আগে কুষ্টিয়ার উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সেই সম্পর্কে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেখানে যে-কোন উৎসব বা আনন্দানুষ্ঠানই হোক না কেন, দেখতে হবে তার ভিতর-দিয়ে বাস্তব কাজ কতখানি হ'ল। সাধারণ সভা ইত্যাদি যেমন হয়েছে, সেই সঙ্গে সমবেত কর্ম্মী ও সৎসঙ্গীদের নিয়ে আলাদা বৈঠক ক'রে বর্ত্তমান করণীয় সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল। Emotional upheaval (ভাবের জাগরণ) যেমন-যেমন হবে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে শুভসঙ্কল্পাত্মক কাজের ভিতর দিয়ে সুফলপ্রসূ ক'রে তুলতে হবে। তারপর সামনের ঋত্বিক্ অধিবেশন-উপলক্ষে যে সর্ব্বদলীয় সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, সেটা যাতে কার্য্যকরী হয়, তার জন্য ভাল ক'রে প্রস্তুত হ'তে হয়। যাঁরা আসবেন বলেছেন, তাঁদের আসা যাতে হয় তার ব্যবস্থা করা লাগে। এখানে আসলে যাতে তাদের অসুবিধা না হয়, সেজন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করতে হয়। আর, প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা যাতে ভালভাবে হয়, সেজন্য উপযুক্ত কয়েকজন মোতায়েন থাকতে হয়।

কেষ্টদা—সে নিজেরাই করতে হবে।……এবার মনে করেছি, short-hand (সংক্ষিপ্ত-লিখন) জানা কোন reporter (সংবাদদাতা) কলকাতা থেকে আনাব, যাতে অধিবেশনের ভাল-ভাল বক্তৃতা ও আলোচনাগুলি পুরোপুরি ধ'রে রাখা যায়। নইলে ওগুলি মাঠে মারা যায়। ওগুলি ধরা থাকলে ওর উপর দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি অনেক pamphlet (পুস্তিকা) ready (প্রস্তুত) ক'রে ছাপিয়ে ফেলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভালই। আর, নিজেদের ২।১ জনকে যদি বাংলা short-hand (সংক্ষিপ্ত-লিখন) শিখিয়ে নিতে পারেন, তাহ'লে আরো ভাল হয়।

কেষ্টদা—তাও দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতবড় একটা ব্যাপার করতে গেলে পাবনার বিশিষ্ট যারা, তাদের সঙ্গে কিন্তু বিশেষভাবে যোগাযোগ করা লাগে। তাদের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করতে হয়। আর, এখানকার Government Officer (সরকারী কর্ম্মচারী) যারা, তাদের কাছেও যেতে হয়। কোন কার্য্যকরী সাহায্য যদি না-ও পান, তবু বিশেষভাবে ব'লে রাখায় লাভ আছে। Ignored feel (উপেক্ষিত হয়েছে ব'লে বোধ) করবার অবকাশ পাবে না। আমাদের গ্রামে-গাঁয়ে আগে যে সামাজিকতা ছিল, তার ভিতর কিছু-কিছু কৃত্রিমতা ঢুকে পড়লেও, ওর ভিতর অনেকখানি

psychological manipulation (মনোবৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণ) ছিল। কারও বাড়িতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হ'লে গলবস্ত্র হ'য়ে প্রত্যেকের বাড়িতে যেয়ে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করত। দীনতম ব্যক্তিটিকেও পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে আহ্বান করা হ'ত। এই যে শিষ্টাচার, এই যে প্রত্যেককে মর্য্যাদা দিয়ে চলা, এর ভিতর একটা মাধুর্য্য ছিল। পরিবেশের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাও স্বতঃ হয়ে উঠত। তাই, কাউকে অবহেলা করতে নেই, কারও প্রতি উদাসীন থাকতে নেই। আপনার হয়তো মানুষের সঙ্গে কথা বলবার অভ্যাস কম। যা'হোক, আপনি যদি মানুষের তত্ত্ববার্ত্তা না নেন, মানুষের বাড়িতে না যান, তাহ'লে লোকে আপনাকে অনায়াসেই ভুল বুঝতে পারে। বড় যারা, তাদের ত্রুটি আবার মানুষে বেশি ধবে। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে মিশুক হওয়া ও হৃদ্যতা ও সামাজিক সৌজন্য নিয়ে চলা তাই একান্ত প্রয়োজন। অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও এই সব গুণ না-থাকলে মানুষ জন-প্রীতি অর্জ্জন করতে পারে না।

কেষ্টদা—জনপ্রীতি অর্জ্জন করবার বুদ্ধি তো ভাল না। ও তো একটা selfish (স্বার্থপর) ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হ'তে যাবে কেন? মানুষকে ইষ্টের দিকে নিতে গেলে আগে তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জ্জন করা চাই। মানুষকে mould (নিয়ন্ত্রিত) করতে চাইলেই করা যায় না, যদি সহৃদয়তার ভিতর-দিয়ে তার হৃদয় স্পর্শ করা না যায়।

ধীরে-ধীরে অনেকে আসলেন। কেষ্টদা, বঙ্কিমদা চ'লে গেলেন। সুশীলদা (বসু) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সেদিন কাগজে দেখলাম, সারা জগতে দিন দিন মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, প্রতিকারের কথা ভাববার আগে এর কারণের কথা ভাবতে হবে। কারণ খুঁজতে গেলে দেখতে পাবেন, তারা weak nerve ও brain (দুর্ব্বল স্নায়ু ও মস্তিষ্ক) নিয়েই জন্মেছে। জীবন-সংগ্রামের ধকল সহ্য করবার মত ক্ষমতা তাদের নেই। কিন্তু এই জন্মগত দুর্ব্বলতার কারণ যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে, হয় তাদের পিতামাতার ভিতর গলদ আছে, না-হয় তাদের compatible marriage (সুসঙ্গত বিবাহ) হয়নি। তাই, বিয়ে যদি ঠিক-ঠিকমত না হয়, তাহ'লে এর প্রতিকার হবে না। আর, বিয়ে ঠিকমত দিতে গেলে বংশগুলির কুলাচার, ঐতিহ্য, সংস্কার ও রক্তধারা যাতে ঠিক থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার, বিয়ের আগে পুরুষ ও নারীর বংশগত ও প্রকৃতিগত সঙ্গতি দেখতে হবে। এই সব করতে গেলেই আমার মনে হয়, যে-নামেই করুন hereditary grouping (বংশগত বিভাগ) introduce (প্রবর্ত্তন) করা লাগবে।...আর, মানুষ যাতে

পরিবেশের প্রতিকূল সংঘাতের ভিতর প'ড়ে balance (সাম্য) ঠিক রাখতে পারে, তার মানসিক ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ ক'রে নিতে পারে, তার বিহিত ব্যবস্থা রাখাই লাগে। সদ্‌গুরু-উপদিষ্ট সাধন-ভজন, নামধ্যান এ-দিক্ দিয়ে অমৃতের মত কাজ করে। আবার, মানুষের যদি এমনতর কোন প্রিয়জন না-থাকে, যার কাছে সে নিশ্চিন্ত মনে নিজের ভারাক্রান্ত মনের দুঃখ, ব্যথা, গ্লানি ও সমস্যার কথা নিবেদন ক'রে সমাধানলাভে হাল্কা হ'তে পারে, তাহ'লে কিন্তু তার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে। এ-দিক্ দিয়েও সদ্‌গুরুর আশ্রয় নেয় যারা, তারা নিজেদের ভারমুক্ত করবার অনেকখানি সুযোগ পায়।……নিজের দুঃখের ভার নিজে বহন করা মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য, তাই মানুষ চায় কাউকে—যার কাছে সে নিজেকে উজাড় ক'রে দিতে পারে। এইভাবে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন ক'রে মানুষের অন্তর-বেদনা যত হাল্কা হয়, ততই তার ভিতর আত্ম-নিয়ন্ত্রণী শক্তির আবির্ভাব হয়। সে আবার তখন কতজনকে সাহায্য করতে পারে। অন্যের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার দরকার বোধ করে না—এমন মানুষ আছে কিনা জানি না। অন্ততঃ আমি তো পারি না। তাই এখনও মা'র জন্য হা-হুতাশ করি। ব্যথা পেলে সহানুভূতিশীল কারও সান্নিধ্য খুঁজি। দুঃখ-কষ্ট-বিপদের সময় মানুষের পিছনে মাভৈঃ ব'লে দাঁড়াবার যদি কেউ না-থাকে, তাহ'লে সে আরো অসহায় হ'য়ে পড়ে। আবার, ঈশ্বর-বিশ্বাসও মানুষের দিন-দিন ক'মে যাচ্ছে। ঐ বিশ্বাস থাকলেও মানুষ অসময়ে অনেকটা মনে বল পায়। সব দিক্-দিয়ে নিঃসম্বল হওয়ায় বেকায়দায় পড়লে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে না। মাথার আর দোষ কি বলেন? যে এক মণ বোঝা বইতে পারে, তার মাথায় যদি পাঁচ মণ বোঝা হঠাৎ চাপিয়ে দেন, সে কতক্ষণ ঘাড় সোজা রাখতে পারে?

শরৎদা (হালদার)—মানুষের সহনশীলতা নাকি অফুরন্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্মগত সম্পদ্ যার যেমন, সম্ভাবনাও তার তেমনি। অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে ভিতরের সম্ভাবনা বাস্তব রূপ নেয়। ভিতরে যদি সম্ভাবনা না-থাকে, তাহ'লে হয় না। সেই জন্য বিহিত বিবাহ ও সু-প্রজনন এত প্রয়োজন।

কালীদা (ব্যানার্জ্জী)—নামধ্যান করলে নাকি ভিতরের শক্তির জাগরণ হয়। ভিতরের শক্তির জাগরণ হ'লে বাইরে তো তার একটা প্রকাশ হবে? কিন্তু অনেক নামধ্যান-পরায়ণ লোকের জীবনে তো বিশেষ কোন কর্ম্মশক্তি দেখা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধোষিত নিষ্ঠা নিয়ে নামধ্যান করলে একটা tremendous unlocking of energy (প্রচণ্ড শক্তির বিকাশ) হয়। তার প্রেরণায় মানুষের কর্ম্মশক্তিও সম্বেগবান্ হ'য়ে উঠবার কথা। সে তরতরে ও চন্‌মনে হ'য়ে ওঠে।

উৎসাহে টগবগ করে। কাজ না-ক'রেই তার ভাল লাগে না। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আমি তো এমনতরই দেখেছি। আবার, শত কাজ ক'রেও ক্লান্তিবোধ কমই হয়। যত কঠিন কাজ হয়, তত স্ফূর্ত্তি ও রোখ বেড়ে যায়। জরুর করেঙ্গে—এমনতর একটা ভাব। আবার, বুদ্ধি হয় তাড়াতাড়ি করা, নির্ভুলভাবে করা ও successful (কৃতকার্য্য) হওয়া। যেন একটা আমোদের খেলা। ছেলেপিলেরা যেমন খেলা করে। খেলার পরিশ্রমকে কি পরিশ্রম ব'লে মনে হয়? ঐ পরিশ্রম না-করতে পারলে বরং কষ্ট বোধ হয়। তাই, নামধ্যান করলে তদনুপাতিক কর্ম্ম আসেই। অবশ্য, কর্ম্মের নানা রকমারি আছে। প্রকৃতি-অনুযায়ী কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়। একজন হয়তো গবেষণা করে, সে-ও কর্ম্ম। আবার, একজন হয়তো আর্ত্তের সেবা করে, সে-ও কর্ম্ম। আবার কেউ হয়তো যাজন করে, সে-ও কর্ম্ম। কিন্তু অন্য কোন কর্ম্ম করে না অথচ খুব নামধ্যান করে, এমনতর শুনলে মনে হয়, নামধ্যানই ঠিকমত করে কিনা সন্দেহ। তবে, মাঝে মাঝে এক একটা সময় আসে যখন নামধ্যানে ডুবে থাকতে ইচ্ছা করে। ঐ অন্তর্ম্মুখী ভাব কিন্তু যথা সময়ে সমৃদ্ধতর কর্ম্মশক্তির ভিতর-দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে।

প্রমথদা (দে)—যুগে-যুগে মহাপুরুষরা আসেন, কিন্তু সেই ধারাটা ধ'রে রাখার মত লোক তো বেশী দিন থাকে না। এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মহাপুরুষরা তো প্রাণপণ চেষ্টা করেন মানুষ তৈরী করবার জন্য। যে ক'জন যেমনতর তৈরী হয়, তার উপর নির্ভর করে তাঁদের প্রভাবের স্থায়িত্ব। কারণ, নীতি যদি চরিত্রগত না-হয়, তবে বইপত্রে যত উচ্চস্তরের নীতিবিধি লিপিবদ্ধ থাক-না-কেন, সেগুলি মানুষের খুব-একটা কাজে আসে না। আবার, মানুষ না-থাকলে, কতকগুলি বড়-বড় প্রতিষ্ঠান গড়লেও কাজ হয় না। মানুষ ঠিক হ'লে আর সবই আপসে-আপ হয়। দুঃখকষ্ট স'য়েও যারা হাসিমুখে লেগে থাকে, আনন্দের সঙ্গে নির্দ্দেশগুলি পালন ক'রে চলে, তাদের এর ভিতর-দিয়ে অনেক কাজ হ'য়ে যায়। আর-একটা মস্ত জিনিস হ'ল—ভাল-ভাল পরিবারগুলির মধ্যে ইষ্টকৃষ্টির ধারাটা বংশ-পরম্পরায় জাগ্রত ও জীয়ন্ত ক'রে রাখা—আচারে, আচরণে, অনুষ্ঠানে—এককথায় সুসংস্কৃতির অনুনয়নে। এর ভিতর-দিয়ে ক্রমান্বয়ে ভাল-ভাল মানুষের জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং ঐ পারিবারিক আবহাওয়ায় তাদের মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠারও সুযোগ ঘটে। কতকগুলি পরিবারের ভিতর আদর্শপ্রাণতা যদি শিকড় গেড়ে যায়, তাহ'লে আর ভাবনা নেই। সেইভাবে চেষ্টা করেন। বেশি মানুষ তো লাগে না। কয়েকটা মানুষ হ'লে দুনিয়া ওলটপালট ক'রে দিতে পারে।

প্রমথদা হাসতে-হাসতে বললেন—আপনার কথা যখন শুনি তখন মনে হয়, আমি আপনার মনোমত হ'য়ে উঠতে পারি, কিন্তু কাজের বেলায় দেখতে পাই, ভিতরে অনেক গলদ, অনেক দুর্ব্বলতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ডান হাতে তুড়ি দিয়ে)—ও কিছু না। St. Augustine (সাধু অগষ্টিন)-এর কথা শোনেননি? তিনি নাকি না-করেছিলেন দুনিয়ায় এমনতর অপকর্ম্ম নেই। কিন্তু সেই মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল, যার কোন তুলনা হয় না। সব রকম দুর্ব্বলতা ও অপকর্ম্মের অভিজ্ঞতাকে পরে তিনি কাজে লাগালেন তাঁর যাজনে। কত পাপী-তাপী উদ্ধার হ'য়ে গেল তাঁর সান্নিধ্যে এসে। তাই, কা'রও হতাশ হবার কারণ আছে ব'লে মনে হয় না। চাই একটু sincere Will (আন্তরিক ইচ্ছা), আর কিছু না। (জোরের সঙ্গে) আমি বলছি—খুব পারেন, ঢের পারেন, এখনই পারেন। ইতস্ততঃ করবেন না—

যা' করবি তুই বুঝলি মনে
এক ঝাঁকিতে কর্ তাহা,
সমানে চল্ সেই চলনে
এমনি চলাই ঠিক রাহা।

এরপর কিছু সময় চুপচাপ কাটলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—পাবনায় গিছিলেন নাকি?

প্রমথদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Response (সাড়া) কেমন?

প্রমথদা—খুব ভাল। গেলেই কাজ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো সেই কথা কই। মানুষের বাড়িতে যাবেন, মানুষের সঙ্গে মিশবেন, গল্পগুজব করবেন। অন্তরঙ্গতার ভিতর-দিয়ে opposition (বিরোধ) ও stiffness (কঠিন ভাব) melt ক'রে (গ'লে) যায়।…আর, আপনাদের এখানে যদি যাত্রাটাত্রা হয়, আর যাত্রার সময় যদি town (শহর) থেকে লোকজন আসে, সৎসঙ্গীরা বসুক বা না-বসুক, তাদের ভাল জায়গায় বসার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। আমাদের অনেকেই তেমন alert (সতর্ক) না, আপনি সব দিকে নজর রাখবেন।…আর সাবিত্রী কোম্পানীকে ভাল ক'রে ব'লে রাখবেন যে, নানা জায়গা থেকে বহু বিশিষ্ট লোকের আশ্রমে আসার সম্ভাবনা আছে, কা'রও যেন কোন অসুবিধা না-হয়।

হঠাৎ বাবরালীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কাজ কতদূর হ'ল?

বাবরালী—হতেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্তরের মত ক'রে ফ্যাল। দিন তো আর বাকী নাই।

পঞ্চানন (কর্ম্মকার) সুন্দর ক'রে অনেকগুলি বাণী ও ছড়া লিখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতে নিয়ে এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে সুললিত কণ্ঠে বললেন—

মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।—

হাত চালায়ে যাও। থা'মো না।

উমাদা (বাগচী)—এর মধ্যে ময়মনসিংহ জিলা থেকে চিঠি এসেছে যে সেখানে বাইরের লোক সৎসঙ্গের ঋত্বিক্‌দের এতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে যে, এক গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বিরোধ বাধার পর যখন মামলা-মোকদ্দমা হবার সম্ভাবনা হ'ল, তখন সৎসঙ্গীদের কাছে নিবারণদার কথা শুনে, তাঁর মধ্যস্থতায় নাকি বিরোধ মিটিয়ে নিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ-সব খবর শুনলেই আমার ভাল লাগে। নিবারণের মত মানুষও এতখানি পারে। উভয় পক্ষকেই খুশি ক'রে, বিরোধের মিটমাট ক'রে শান্তিস্থাপন কিন্তু কম কথা নয়। তোমাদের ব্যক্তিত্ব যত বেড়ে যাবে, খ্যাতি যত বেড়ে যাবে, ততই দেখবে লোকে থানায় বা কোর্টে না যেয়ে তোমাদের কাছে ছুটে আসবে নিষ্পত্তির জন্য।…নিরাশী, নির্ম্মম হওয়া আমার আর হ'ল না! আমার সব সময় আশা—তোমাদের প্রত্যেকে বড় হবে, তোমাদের এক-একজনকে দিয়ে হাজার-হাজার লোক উপকৃত হবে both materially and spiritually (বস্তুগতভাবে ও আধ্যাত্মিক-ভাবে উভয়তঃ)। আর, মমতার কথা কও কেন! মমতার মধ্যেই তো হাবুডুবু খাচ্ছি। জনে-জনে প্রত্যেকের জন্য উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা লেগেই আছে।

একটি মা একখানি অত্যন্ত ময়লা কাপড় প'রে একটু দূরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—পূজোর সময় পরবার জন্য কাপড়খানা গোছায়ে রাখিছিলি, তাই না?

মা-টি লজ্জিত হ'য়ে বললেন—না। এটা কাচতে হবে। বড় ময়লা হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাজ-সজ্জা, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র সব শুচি-সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে হয়, যাতে মনে তৃপ্তি আসে, উৎসাহ ও পবিত্রতার উদয় হয়। তোদের হাতে সংসারের সবার জীবন, তোদের কাজকর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও

চালচলনের ভিতর দিয়ে সংসারের মানুষগুলি যদি ফুটে উঠবার প্রেরণা না-পেয়ে মিইয়ে যাবার খোরাক পায়, তাহ'লে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী ফুটে উঠবে কিভাবে, বাড়-বাড়ন্তই বা হবে কেমন ক'রে ? মায়েরা যে-সংসারে অপরিচ্ছন্ন ও এলোমেলো, সে-সংসারের মানুষগুলিও ধীরে-ধীরে অব্যবস্থ ও ছন্নছাড়া হ'য়ে উঠতে থাকে। তাই, খুব সাবধান।

একটি নবাগত দাদা জিজ্ঞাসা করলেন—রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যষ্টির কী সম্পর্ক!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য-সম্মত শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ ও জীবিকার ব্যবস্থা যাতে হয়, এবং কারও স্বাতন্ত্র্য যাতে ব্যাহত না হয় ও পারম্পরিকতার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকে স্বাধীনতা ও সহযোগিতা উপভোগ করতে পারে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। রাষ্ট্র সবসময় চেষ্টা করবে, অবনতির পথকে রুদ্ধ করতে এবং উন্নতির পথকে এস্তার করতে। এ করতে গেলে রাষ্ট্রের উচিত বর্ণাশ্রমকে রক্ষা ও পালন ক'রে চলা। বর্ণাশ্রম মানে ঋষির অধিনায়কতা। তাই, রাষ্ট্রেরও উচিত ঋষির অনুশাসন মেনে চলা। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঋষি রাষ্ট্রের বাইরে থাকলেও প্রতিটি ব্যষ্টি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে থাকবে তাঁর যোগসূত্র। এবং এইরকম একজন adjusting agent (নিয়ন্ত্রণকারক) মাঝখানে থাকায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরস্পর পরিপূরণশীল ও সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠবে। একদিক্ সামাল দিতে যেয়ে আর-একদিক্ বিপর্য্যস্ত হবে না। সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কার, বৈশিষ্ট্য ও নৈতিকতার ভূমি দৃঢ় থাকবে। ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে না, ব্যক্তি রাষ্ট্রের দাসরূপে পরিণত হবে না।

উক্ত দাদা—সব সময় ঋষি তো আর পাওয়া যায় না, আর বর্ণাশ্রম হিন্দুরা মানতে পারে, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায় মানতে যাবে কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবন্ত ঋষি যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে ঋষি-অনুশাসনবাহী কোন উপযুক্ত লোককে ধ'রে চলতে হয়। আর, বর্ণাশ্রম কথাটা না-মানুক, যাতে প্রত্যেকের চলন বৈশিষ্ট্যানুগ হয়, সে-সম্বন্ধে কি কারও কোন আপত্তি থাকতে পারে ? আর, ঐটেই stretch (বিস্তৃত) করতে গেলে বর্ণাশ্রম এসে পড়ে। বর্ণাশ্রম নাম না-দিয়ে তাকে যে-কোন নামই দাও-না-কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে, মানুষের ভাল করতে গেলে তার জন্মগত বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী শিক্ষা চাই, কর্ম্ম চাই, বিবাহ চাই, পোষণ চাই। এ বাদ দিয়ে চলবে না, তা' যে-দেশেই হোক আর যে-সম্প্রদায়েই হোক।

উক্ত দাদা—আপনি যা' বলছেন তাতে ঋষিই তো dictator (একমাত্র নায়ক)

হ'য়ে উঠবেন, গণতান্ত্রিক ধাঁজ থাকবে না। তার ভিতর-দিয়ে তো আবার বহু সমস্যার সৃষ্টি হ'তে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গণতন্ত্র থাকবে to workout the ideas of the Rishi (ঋষির চিন্তাগুলিকে রূপায়িত করতে)। যা'-কিছু আমরা করি-না-কেন, আমাদের mission (উদ্দেশ্য) হ'ল being and becoming (বাঁচা-বাড়া), আর তার personified form (রূপায়িত বিগ্রহ) হলেন ঋষি।

২৮শে আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৫০ (ইং ১৫। ১০। ১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের পিছনদিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। প্রমথদা (দে), শরৎদা (হালদার), নরেনদা (মিত্র), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী), গোপেনদা (রায়) প্রমুখ কাছে আছেন। ধীরে-ধীরে আরো লোকজন আসছেন। ইতিমধ্যে ঋত্বিক্-অধিবেশন-উপলক্ষে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'সীতারাম' এই দুই পালা যাত্রাভিনয় হ'য়ে গেছে। সেই প্রসঙ্গে কথা উঠতে বললেন—জাতির ভিতর বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন কিছু গ'ড়ে তোলা খুব কঠিন ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়।

শরৎদা—অবস্থা যখন এমনতর হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের প্রকৃতি জেনেশুনে, সজাগ থেকে, শুভার্থে যতটুকু কাজে লাগান যায় তা' লাগাতে হবে, কিন্তু তাদের উপর নির্ভর করা চলবে না। তাদের-দিয়ে ভাল যারা, তারা আবার যাতে contaminated (সংক্রামিত) না-হয়, সে দিকে কড়া নজর রাখতে হবে। আপনি তাদের সন্দেহের চোখে দেখেন, এটা কিন্তু কখনও বুঝতে দেবেন না। সব সত্ত্বেও তাদের ভালই বাসবেন এবং ভাল যাতে হয় তাই-ই করবেন—evil (মন্দ)-কে support (সমর্থন) না-ক'রে।

শরৎদা—দোষের সঙ্গে অসহযোগিতা করব অথচ দোষীকে ভালবাসব, এ কেমন ক'রে সম্ভব হয়, বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ির কারও যদি কোন সংক্রামক ব্যাধি হয়, তাহ'লে তাকে সুস্থ ক'রে তোলার জন্য কী করেন, সেইটে ভাবলেই হয়। কারও সত্তার সঙ্গে আমাদের বিরোধ নেই, বিরোধ আছে তার সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে—যা' সপরিবেশ তাকে বিনাশের পথে নিয়ে যায়। সে-বিরোধ যদি না-থাকে, তাহ'লে বোঝা যাবে, আমরা তাকে বা কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসা কখনও চায় না যে প্রিয়ের ক্ষতি হোক।

প্রমথদা—আমি যদি অন্যকে সন্দেহ করি, তাহ'লে সেটাও কি আমরা অবনতির

কারণ হ'য়ে ওঠে না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে সন্দেহ করা উচিত নয়, তাকেও যদি আপনি সন্দেহ করেন—আপনি যদি সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত হন, তাহ'লে তো আপনার পক্ষে তা' অবনতির কারণই হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু যে প্রকৃত সন্দেহযোগ্য, তাকে যদি আপনি ধরতে না-পারেন, বুঝতে না-পারেন এবং বুঝে সাবধান হ'তে না-পারেন, তাহ'লে সেটা তো আপনার অজ্ঞতা ও বেকুবী ছাড়া আর কিছু না। তবে কাউকে অযথা সন্দেহ করা না-হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। আবার, কেউ প্রকৃত সন্দেহযোগ্য সেইটে বুঝে মাথায় যদি একটা obsession-এর (অভিভূতির) সৃষ্টি হয়, ঐ চিন্তা যদি আপনাকে পেয়ে বসে, তার ধ্যানই যদি আপনার মাথায় লেগে থাকে—হিংসা বা শত্রুতাবশে যেমনতর হ'য়ে থাকে—তাহ'লে তাতে কিন্তু ক্ষতিই হয়। বুঝলে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রতিবিধানের দিকে, যাতে অমঙ্গলকে এড়িয়ে মঙ্গলের অধিকারী হওয়া যায়। Unbalanced (সাম্যহারা) হ'লে ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় না।

যোগেশদা—লাভ হোক, বা না-হোক, মানুষ অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়লে প্রায়ই balance (সমতা) হারিয়ে ফেলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, ঠ'কে যায়। প্রতিকুলতা পাড়ি দিয়ে-দিয়ে মানুষের জীবন। থমকে গেলে বা depressed (অবসন্ন) হ'লে, নিজেরই খাটুনি বেড়ে যায়। আবার তা' make up (পরিপূরণ) ক'রে নিতে হয়। গায় গু মাখলে যমে ছাড়ে না। যম যেমন নাছোড়বান্দা, তার চাইতে বেশি নাছোড়বান্দা জীবন-সম্বেগ। হতাশা তাকে সহজে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে না। সব ব্যথা, সব কষ্ট, সব জ্বালা, সব আঘাত-ব্যাঘাত অতিক্রম ক'রে সে চায় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে। এই তো জীবনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিপক্ষের সাজসজ্জা দেখে ঘাবড়ে গেলে বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'লে পরাজয়কেই আমন্ত্রণ করা হয়। পরাজয় তো চাই না আমরা, জয়ই চাই। তাই, জয় আসে যেমন ক'রে সেই ভাবে চলা ভাল। ঐ ভাবে চলতে চলতে ঐটেই instinct (সংস্কার) হ'য়ে ওঠে। তাই, negative (নেতিমূলক) কথা বা ভাব ভাল না। ওতে মানুষ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে।…জীবন ও অমৃতের তৃষ্ণা যাতে মানুষের অদম্য ও অকাট্য হ'য়ে ওঠে, যাতে মানুষ বাঁচা ও বাঁচানর স্বপ্ন দেখে, মৃত্যু ও মৃত্যুমুখী যা'-কিছু নিকেশ করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লাগে, তাই করতে হবে।

যোগেশদা—এই সংগ্রামে জয়ী হ'তে গেলে যে-শক্তির প্রয়োজন, তা' তো সবার নাই !

শ্রীশ্রীঠাকুর—শক্তি প্রত্যেকের ভিতর তার মত আছে। এবং প্রত্যেকের ভিতর

সুপ্ত শক্তি যা' আছে তা' যদি জাগিয়ে তোলে,—কার্য্যতঃ, হাতে-কলমে,—তাহ'লে দেখা যাবে, কেউ একেবারে ফ্যাল্‌না নয়। Passionate obsession-এর (প্রবৃত্তি-অভিভূতির) ফলে অনেক শক্তির অযথা অপব্যয় হ'য়ে যায়, তাই with all one's passions (সমস্ত প্রবৃত্তি নিয়ে) ইষ্টে অনুরক্ত হ'তে হয়। ওতে সংহত শক্তির অভ্যুদয় হয়। ঐ শক্তির দৌলতে নিজে তো জয়ী হওয়া যায়ই, আরো কতজনকে জয়ী ক'রে তোলা যায়।......ইষ্টপ্রীতির একটা লক্ষণ হ'ল, পরিবেশের ভালর জন্য একটা maddenning urge (পাগলপারা আগ্রহ আকুতি)। ঐ urge (আকুতি) তার শক্তিকে আরো উথলে তোলে।......আর, এই যে পরিবেশের সেবায় উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে ইষ্টের তৃপ্তি-উৎপাদন। তাই, সেবার অহঙ্কার বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধি তাকে কমই অভিভূত করতে পারে। একেই বলে যোগস্থ হ'য়ে কর্ম্ম করা। এর ভিতর-দিয়েই অর্থ ও পরমার্থের সমন্বয় হয় জীবনে।

শ্রীশদা—অর্থ ও পরমার্থের সমন্বয় বলতে কী বুঝব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যদি প্রকৃত সেবাপরায়ণ হন, আপনাকে দিয়ে যদি বহুলোক বাস্তবে উপকৃত হয়, তাহ'লে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনার আর্থিক সমস্যার স্বতঃই সমাধান হবার কথা। কারণ, অর্থ আসে সেবা ও প্রয়োজনপূরণের ভিতর-দিয়ে। আবার, ঐ সেবার পিছনে আত্মস্বার্থ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি না-থেকে যদি ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্ট-প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিই প্রবল হয়, তবে তার ভিতর-দিয়েই আসে পরমার্থ অর্থাৎ ইহজীবনের সার্থকতা। প্রবৃত্তি-পরামৃষ্ট স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ জীবন ইষ্টসার্থকতায় ভূমান্বিত পরিব্যাপ্তি লাভ করে। জীবন সফল হ'য়ে যায়, আর সেই তো পরমার্থ।

এমন সময় কারখানার সুধীরদাকে (দাস) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কী খবর রে?

সুধীরদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অটলের (কারখানার পূর্ব্বতন কর্ম্মী) সঙ্গে দেখাটেখা হয় না?

সুধীরদা—খুব কম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কথা মানুষের মনে থাকে কিনা জানি না, কিন্তু আমার মানুষের কথা খুব মনে হয়, বিশেষতঃ যাদের নিয়ে বেশ কিছুদিন নাড়াচাড়া করিছি।

সুধীরদা—এখানে থাক বা না-থাক যারা কিছুদিন আপনার কাছে থেকে গেছে, তারা আপনাকে ভুলতে পারে ব'লে মনে হয় না।

এরপর ডাক্তার প্যারীদা (নন্দী) একবার তামাক সেজে দিলেন। তামাক খেতে-

খেতে প্রমথদাকে বললেন—'রামদাসস্বামী ও শিবাজী' বইটা পড়েছেন তো ?

প্রমথদা—ভাল ক'রে পড়িনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে পড়বেন। ওর ভিতর অনেক practical wisdom (বাস্তব বিজ্ঞতা) আছে।

প্রমথদা—আজ্ঞে পড়ব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণ পাণ্ডিত্য এক জিনিস আর লোক-পরিচালনা করার কৌশল আর-এক জিনিস। বাস্তব অভিজ্ঞতা না-থাকলে এ-সম্বন্ধে লোককে কার্য্যকরী নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না। রামদাসস্বামীর নির্দ্দেশগুলি এ-দিক্ দিয়ে মোক্ষম। আবার, গোড়া ঠিক আছে। বলেছেন—'মুখ্য হরিকথা নিরূপণ।' নিরূপণ কথার মানে আমার মনে হয়, রূপ দেওয়া। হরিকথা মানে—হরির কথা, গুরুর কথা, অর্থাৎ গুরুর নির্দ্দেশকে কাজে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হবে। তার জন্যই যা'-কিছু। আবার বলেছেন—'রাম কর্ত্তা, রাম ভোক্তা, রামরাজ্য ভূমণ্ডলে—সর্ব্বথা দেবের আমি।' কেমন সুন্দর কথা! ধর্ম্মের প্রাণটুকু তুলে ধরেছেন, ছোট-ছোট কথার ভিতর-দিয়ে। সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র কোনটাকেই অস্বীকার করেননি, বরং যা'-কিছুকে ইষ্টসুতোয় গেঁথে তুলতে বলেছেন, এ না-করতে পারলে কিন্তু মানুষের নিস্তার নাই।

শরৎদা—শুনেছি কর্ম্মফল মানুষকে ভোগ করতে হয়ই, এ হ'তে কি মানুষের রেহাই নেই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মই জীবনের নিয়ন্ত্রণ-সূত্র। কর্ম্মফল মানুষের চরিত্রে ও মস্তিষ্কে বিশেষ-বিশেষ প্রবণতা ও ঝোঁকের সৃষ্টি ক'রে থাকে, তার চলনও তাই-দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং তার ফল যা' হবার তাও হ'য়ে থাকে। কোন কায়দায় পূর্ব্ব-কর্ম্মফল-প্রসূত খারাপ বুদ্ধি, প্রবণতা ও ঝোঁকগুলিকে যদি বদলে দেওয়া যায়, অর্থাৎ ভালর দিকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে দুর্ভোগের হাত-থেকে অনেকখানি রেহাই পাওয়া যেতে পারে। তবে, আপনার আগের কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যদি অপরের ক্ষতি হ'য়ে থাকে, তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘুরে-ফিরে আপনার উপর এসে বর্ত্তান সম্ভব। কিন্তু ভালমন্দ যা'-কিছুর শুভ-নিয়ন্ত্রণে যদি আপনি অভ্যস্ত হন, তাহ'লে মন্দ-কিছু ঘটলেও তা' আপনাকে বিধ্বস্ত করতে পারে কমই। তাই, সবকিছুকে উপেক্ষা ক'রে ইষ্টকে অনুসরণ ক'রে চলতে হয়। মন যে কতরকম বাতলায়, তার কি ঠিক আছে ? মনের কথা শুনে বিভ্রান্ত হ'তে নেই। যত কষ্টই হোক, ইষ্টের নির্দ্দেশ কাটায়-কাটায় পালন ক'রে চলতে হয়। এই কষ্টের ভিতর-দিয়ে বহু কষ্টের হাত-থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমি অনেক সময় মানুষকে খামাকা এক-একটা কাজ করতে বলি। বুদ্ধি

থাকে, otherwise engaged (অন্যথা ব্যাপৃত) রেখে অন্য-একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া। তাই, যারা কথা শোনে, তাদের অনেক বিপদ কাটিয়ে নেওয়া যায়। কথা না-শুনলে তাদেরও যন্ত্রণা, আমারও যন্ত্রণা। আমি একজনকে হয়তো বললাম—বাইরে বেরিয়ে কাজ নেই, এখানে থাকেন, লোকজন আসলে তাদের সঙ্গে যাজন-টাজন করবেন, কথাবার্ত্তা বলবেন, আমার এখানে ঘুরবেন-ফিরবেন। তাতে তার হয়তো বিশেষ কতকগুলি অসুবিধা হ'তে লাগল—পয়সাকড়ির টানাটানি, বাড়িতে অশান্তি ইত্যাদি। তাই, আমার কাছে হয়তো বলল—'ঠাকুর! এখানে ব'সে-ব'সে থাকি, কোন কাজকর্ম্ম হয় না, অমুক জায়গায় গেলে খুব ভাল কাজকর্ম্ম হয়, আমার শরীর-মনও ভাল থাকে, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে বেরোই।' আমি হয়তো দেখলাম—তার অত্যন্ত আগ্রহ, তখন যদি না করি, তাহ'লে মনে খুব ব্যথা পাবে, সে-ক্ষেত্রে অগত্যা হয়তো মত দিলাম। বাইরে যেয়ে হয়তো একটা কঠিন অসুখ বাধিয়ে আসল, খুব ভুগল।

শরৎদা—দেখা যায়, প্রকৃত গুরুভক্তিই তো সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব কঠিন, আবার খুব সোজা। ভক্তি থাকলে যেমন করে, যেমন বলে, যেমন ভাবে, সংকল্প নিয়ে অমনতর করতে থাকলে, বলতে থাকলে, ভাবতে থাকলে আস্তে-আস্তে ভিতরে ভক্তি জেগে ওঠে। গুরুভক্তি লাভ করতে গেলে গুরুর যেমন সঙ্গ করতে হয়, গুরুর আদেশ যেমন পালন করতে হয়, তেমনি প্রকৃত গুরুভক্ত যে, তারও সঙ্গ করতে হয়। ভক্তের একটা ভাব আছে, ভক্তের একটা শুদ্ধদৃষ্টি আছে যা' দুর্লভ। তাই, প্রকৃত ভক্ত যে তাঁর সংস্পর্শে মানুষের কল্যাণ হয়। সে কখনও মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চায় না—সে চায় সবাই যাতে তাঁর প্রেষ্ঠকে ভালবাসে। আর, ছেলেবেলা থেকে মানুষকে ভক্তিভাবে ভাবিত ক'রে তুলতে হয়। মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি ইত্যাদি যাতে পোষণ পায়, তেমনতর ব্যবস্থা করতে হয়। শিক্ষাটাকেই ক'রে তোলা লাগে শ্রদ্ধাভিত্তিক—তা' কি পরিবারে, কি স্কুলে, কলেজে। পিতামাতা ও আচার্য্যেরও হওয়া চাই শ্রদ্ধাবান্। শ্রদ্ধাবান্ পিতামাতার সন্তানও সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে থাকে। অবশ্য, সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়, ছেলেপিলেরা কোন্ পরিবেশে মিশছে। পরিবেশের দ্বারা infected (সংক্রামিত) না-হ'য়ে, তারা যাতে পরিবেশকে infuse (অনুপ্রাণিত) করতে পারে, তেমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয় তাদের। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি সব জিনিস আলোচনা করতে হয়, জোর ক'রে কোন জিনিস চাপাতে নেই। কোন্টা কেন করবে বা কেন করবে না, তার rational explanation (যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা) তাদের যদি জানা না থাকে, তাহ'লে অন্যকে

convince (প্রত্যয়দীপ্ত) করতে পারবে না, বরং অন্যের দ্বারা otherwise convinced (অন্যভাবে প্রত্যয়দীপ্ত) হবে। তাই শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ও উচ্ছল ক'রে রাখতে গেলে যজনের সঙ্গে যাজন চাই ই। যাজন না-করলে ভিতরের ভাব শুকিয়ে যায়। দেখবেন, যারা ভক্তিমান্, আচারবান্ ও যাজনমুখর তারা কত তাজা ও তর্তরে থাকে। এইরকম লোকের সংখ্যা যতই বেড়ে যাবে সমাজে, ততই সমাজের মঙ্গল। তাদের personality (ব্যক্তিত্ব) এমন একটা atmosphere (আবহাওয়া) ব'য়ে নিয়ে বেড়ায়, যা' মানুষের অনুরাগের উৎসকে শ্রেয়-সন্দীপনায় সন্দীপ্ত ক'রে তোলে। এই চারিত্রিক দ্যোতনার স্ফুরণ না-হ'লে শুধু কথায় মানুষের অন্তর স্পর্শ করা যায় না।

একটি দাদা বললেন—যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন, বরং সূচের ছিদ্রের ভিতর-দিয়ে উটের চ'লে যাওয়া সহজ, কিন্তু ধনীর স্বর্গে প্রবেশ করা সহজ নয়। আবার, আপনি বলেছেন—যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে অর্থ থাকবেই। এই দুই কথার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধনের আসক্তিতে যে নিমজ্জিত, ধনের অহঙ্কারে যে মত্ত, এই অহঙ্কারে যে অন্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, ধনলালসায় যে অকর্ম্ম, কুকর্ম্ম করে, আবার প্রচুর অর্থ হাতে পেয়ে যে সেই অর্থ নিজের খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তির পূজায় লাগায়, তেমনতর ধনী-সম্বন্ধেই যীশুখ্রীষ্ট ঐ-কথা বলেছেন। কিন্তু ধর্ম্ম করলে, মানুষেয় বাঁচাবাড়ার যোগান দিলে, তাতে যে অর্থ আসে সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ? সেই অর্থের যদি আবার ইষ্টার্থী ও সত্তাপোষণী ব্যবহার করা হয়, তা'-দিয়ে যদি পরিবেশের মঙ্গল করা হয়, তাহ'লে কি তা' কখনও মানুষের আত্মার অধোগতির কারণ হ'তে পারে ? অনাথপিণ্ডদ তো শুনেছি বুদ্ধদেবের কাজের জন্য কত অর্থ অকাতরে ব্যয় করেছেন। তিনি তো ধনী ছিলেন। ধনী ছিলেন ব'লে কি তিনি পরমপিতার পথের পথিক হ'তে পারেননি ? তাই, কোন্ কথাটা কোন্ উদ্দেশ্যে ও কোন্ প্রসঙ্গে বলা, সেটা ভাল-ক'রে বুঝতে হয়।

প্রফুল্ল—কেউ-কেউ বলেন, মৃত্যুচিন্তা করলে মানুষের পাপ-প্রবৃত্তি দমিত হয়। এ-সম্বন্ধে আপনি কী বলেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মৃত্যুচিন্তা করলে মানুষের পাপ-প্রবৃত্তি হয়তো দমিত হ'তে পারে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একটা মরণ-অভিনিবেশ পেয়ে বসে। তাই-ই তার আশা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্পকে নিথর ক'রে দিয়ে তাকে মরণপন্থী ক'রে তোলে, তার মরণকে এগিয়ে নিয়ে আসে। ভাল কিছু, বড় কিছু করতে গেলে তীব্র ও কঠোর

উদ্যমের প্রয়োজন, ক্লেশ স্বীকার প্রয়োজন। কিন্তু মৃত্যুচিন্তায় অভ্যস্ত যারা, তাদের অমনতর কঠোর সাধনার মধ্যে প'ড়ে থেকে-থেকে মনে হয়—এ-সব ক'রে লাভ কী? ক'দিনের জন্য জীবন? তাই, সৎকাজেও তারা উৎসাহ পায় না। কেমন যেন একটা মনমরা ভাব হয়। জীবনটা উপভোগ করতে পারে না। সব-কিছুকেই একটা দূরপনেয় দুঃখ ব'লে বোধ করতে থাকে। বিষাদ ও হতাশাই পেয়ে বসে। বাস্তবকে এড়িয়ে যাবার বুদ্ধি হয়। তারা নিজেরা তো বাস্তব-পরাঙ্মুখ ও দুর্ব্বল হয়ই, আবার অন্যকেও নিস্তেজ ও নিরুৎসাহ ক'রে তোলে। তাই, অমনতরভাবে প্রবৃত্তি-দমনের বুদ্ধি ভাল না। বরং সৎ-এ অনুরক্তি মানুষের যত বাড়ে, ততই তো অসৎ-প্রবৃত্তি সহজেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে আসে। আর, বিচার-বিশ্লেষণ ও প্রত্যাহারের ভিতর-দিয়েও গলদগুলি তাড়ান যায়। অযথা এমন একটা পন্থা অবলম্বন করতে যাব কেন, যাতে নানা উৎপাতের সৃষ্টি হয়?

জেলে-পাড়ার রাইচরণদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

রাইচরণদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীচরণ ভাল আছে তো? ওকে অনেকদিন দেখি না।

রাইচরণদা—আজ্ঞে ভাল আছে। দোকান নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাড়ার আর সব?

রাইচরণদা—মোটামুটি ভাল আছে। তবে কোন-কোন বাড়িতে সর্দ্দিজ্বর আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখায়ে-শুনায়ে ওষুধপত্র দিয়ে দিও।

সাধনা-দি (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা কন্যা) ক্রমাগত নানা অসুখে ভুগছেন। চিকিৎসা খুব হ'চ্ছে, কিন্তু ফল তেমন হ'চ্ছে না। তাঁর চিকিৎসা-সম্বন্ধে প্যারীদার সঙ্গে আলোচনা করছেন। প্যারীদার নিজস্ব মত ও সিদ্ধান্ত কী, শ্রীশ্রীঠাকুর জানতে চান। কিন্তু প্যারীদা নির্দ্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারছেন না। এ-সম্পর্কে তাঁর যে-সব কথা মনে হয়, সবই বলছেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এও বটে, ওও বটে, অমন ক'রে বললে কিছুই বোঝা যায় না। এতদিন ধ'রে দেখছিস, অথচ তোর নিজের মত কোন decision (সিদ্ধান্ত) নেই, এটা কিন্তু ভাল না। এতে আন্দাজে ঢিল মারা হয়। ঠিক-ঠিক চিকিৎসা হয় না। 'সব-দিক্ লক্ষ্য ক'রে, দেখেশুনে, ভেবেচিন্তে একটা অকাট্য সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

এরপর কথাপ্রসঙ্গে গোপেনদা বললেন—আজকাল অনেক শিক্ষিত লোক জাত ভাঁড়ায়।

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তার মানে তারা আদৌ শিক্ষিত নয়। পূর্ব্বপুরুষকে

যারা শ্রদ্ধা করতে শেখে না, তাদের শিক্ষার দাম কী? ঐ শ্রদ্ধা ছাড়া ব্যক্তিত্বের কোন দাঁড়া বা ভিত হয় না। তারা হয় বহুরূপীর মত—কোন্ সময় যে কোন্ রূপ ধরবে, তার কোন ঠিক নেই। মানুষ যার ভিতর-দিয়ে গজিয়ে ওঠে, তাকেই যদি অস্বীকার করতে পারে, তাহ'লে তার উপর আস্থা করার কিছু থাকে না।

১৭ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৫০ (ইং ৩।১১।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে ব'সে হাসি-খুশি হ'য়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। কাছে ব'সে আছেন ব্রজেনদা (চট্টোপাধ্যায়), নরেনদা (চক্রবর্ত্তী), সাধনাদি (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা কন্যা), রেণুমা (আদিত্যের মা), সৌদামিনীমা প্রমুখ। সাধনাদির সঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে।

সাধনাদি কথায়-কথায় বললেন—শরীর খারাপ থাকলে মনটা মোটেই ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো স্বাভাবিক। তবে কায়দাকৌশল ক'রে মনটাকে যত অন্যমনস্ক ও আনন্দদীপ্ত রাখা যায়, তাই কিন্তু ভাল। রোগীর সেবাশুশ্রূষা যারা করে, তাদের প্রধান গুণ হ'ল রোগীকে ভুলিয়ে রাখা, তার মনকে উদ্দীপ্ত ও উৎফুল্ল ক'রে তোলা। প্রীতিকর পরিবেশ হ'লে মনটা ভাল লাগে। আর, নিজেও সব-সময় চেষ্টা করা লাগে যাতে মনটা চাঙ্গা থাকে। আর, উপযুক্ত ওষুধ ও পথ্য এমন নিষ্ঠা-সহকারে নিয়মিত ব্যবহার করতে হয় যাতে শরীরের খাঁকতিগুলি পূরণ হ'য়ে যায় তাড়াতাড়ি। শরীরের খাঁকতির দরুন মন অনেক সময় দুর্ব্বল হয়। আবার, মনের দুর্ব্বলতার দরুন শরীরও দুর্ব্বল হয়। শরীর, মন দুই দিক্-দিয়ে প্যালা দিতে হয়, আবার পরিবেশেরও শুভ বিন্যাস দরকার, যাতে সুস্থতা সন্দীপ্ত ও পরিপোষিত হয়। আর, সব চাইতে বড় জিনিস হ'ল সুস্থ হ'য়ে ওঠার সঙ্কল্প। এই সঙ্কল্প যদি প্রবল হয়, ইচ্ছাশক্তির জোরে সুস্থতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া যায়। নামটাম করাও ভাল, ওতে vital flow (প্রাণন-প্রবাহ) বেড়ে যায়।...ভাল চিকিৎসক যাঁরা, তাঁরা রোগীর শরীর, মন, পরিবেশ সব-দিকে লক্ষ্য রেখে চিকিৎসা করেন, যাতে নিরাময়টা অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে ওঠে।...তোর শরীর খারাপ হ'লে তোর তো কষ্ট আছেই, আর সেই সঙ্গে আমরাও বেহাল হ'য়ে পড়ি। বড়বৌ খুব শক্ত আছে। বাইরে থেকে তাঁর কিছু বোঝার জো নেই, কিন্তু মনের উদ্বেগ যাবে কোথায়? সুধাংশুও কেমন মুখ কালি ক'রে ঘোরে, ভাল লাগে না। শ্বশুরও পাইছিস তুই ভাগ্যি ক'রে, তোর উপর অসম্ভব টান। তুই অসুস্থ থাকলে ভদ্রলোক ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েন।

সাধনাদি—হ্যাঁ। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ।…… আপনারা সবাই চিন্তিত হ'য়ে পড়েন, সেই কথা ভেবে অসুখ হ'য়ে আরো বেশি খারাপ লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—এর একমাত্র প্রতিকার হ'ল তোমার সুস্থ থাকা।

সাধনাদি—আশীর্ব্বাদ করেন, তাই যেন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-প্রার্থনা তো আমার লেগেই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজেনদাকে বললেন—Guest-house-এ (অতিথিশালায়) এমন একজন লোক যদি থাকে, যে নূতন লোক আসলেই তার সঙ্গে যাজন করবে, ঘুরে-ফিরে দেখাবে, বোঝাবে, তাহ'লে খুব ভাল হয়। দীক্ষিত, অদীক্ষিত যেই আসুক, এখান থেকে যদি charged (উদ্বুদ্ধ) হ'য়ে যায়, তাহ'লে অনেক কাজ হয়। সারা আশ্রমটা এমন ক'রে রাখা লাগে—যে যেখানেই যাক, সে সেখান থেকেই যেন একটা উন্নত প্রেরণা পেয়ে যায়।……প্রাণের ভিতর একটা আকুলি-বিকুলি থাকা চাই যে আমি কেমন ক'রে মানুষকে মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলব! তা' থেকেই ফোটে যাজন। যাজন হওয়া চাই rationalizing demonstration (যুক্তি-সন্দীপী নিশ্চয় প্রমাণ)-এর রকমে, চোখ, কান, নাক, মুখ, হাতনাড়া সবটা-দিয়েই conviction (প্রত্যয়) বিচ্ছুরিত হবে। মনটা প্রেষ্ঠটানে কানায়-কানায় ভ'রে থাকবে। যে-কোন complex (প্রবৃত্তি) থাক্, তাঁকেই জড়িয়ে থাকবে, যেমন চিন্তার হয়েছিল তুকারামের প্রতি অনুরাগের ফলে।

২৭শে কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৫০ (ইং ১৩।১১।১৯৪৩)

এক মা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন। তাঁর ছেলে এতে শোকে বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে তাকে সঙ্গে নিয়ে নাট্যমণ্ডপের কাছে গিয়ে বসেছেন। কাছে আছেন কেষ্টদা (ঋত্বিগাচার্য্য) ও সরোজিনী মা (অরুণের মা)।

শ্রীশ্রীঠাকুর দাদাটিকে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কলকাতায় প্রথম যখন প্রকাশের কাছে খবর পালি তখন কী মনে হ'ল?

দাদাটি বললেন—সন্ধ্যায় প্রকাশদা (বসু) কলকাতায় গেলেন। আমাদের তখন বেলেঘাটায় রুদ্রমার (পূর্ণ রুদ্রের মা) বাড়িতে সৎসঙ্গ করতে যাবার কথা ছিল। রওনা হ'চ্ছি, এমন সময় নেপাল (পাল) বলল, ঠাকুর প্রকাশদার কাছে ব'লে দিয়েছেন, আপনাকে আজ রাত্রেই আশ্রমে রওনা হ'তে হবে। এইটুকু বলাতেই আমার মনে হ'ল—মা বোধহয় নেই। ঠাকুরঘরে যেয়ে আপনার ফটোর সামনে ব'সে পড়লাম, বুক ভেঙ্গে কান্না আসতে লাগল, সমস্ত শরীর থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগল, নিদারুণ কষ্ট ও অশান্তি

বোধে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসছিল। একটু সামলে নিয়ে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে প্রকাশদাকে বললাম আপনি কোন কথা গোপন করবেন না, মা'র কী হয়েছে বলেন। প্রকাশদা সব বললেন। সেই মুহূর্ত্ত থেকে নিজের দুঃখের কথা ভুলে গেলাম, কেবল মনে হ'তে লাগল—মার এইভাবে মৃত্যু কেন হ'ল! আমার দ্বারা এর প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আশ্রমে আসতে বলেছি, তাতে তোর মার খারাপ কিছু হয়েছে এ-কথা ভাবার তো কোন কারণ ছিল না। হঠাৎ ও-কথা ভাবতে গেলি কেন?

উক্ত দাদা—তা' জানি না। ক'দিন থেকেই মনে হচ্ছিল, মাকে বোধহয় বেশিদিন রাখতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনি হয়। অমঙ্গলের কথা মনে ডাকে। বিশেষতঃ ভালবাসার জনের অমঙ্গল আসার আগে মনে যেন কেমন একটা ছায়া পড়ে।

উক্ত দাদা—মা কী কষ্টে গেলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো কষ্টের দরুন যায়নি। কষ্টের বোধ থাকলে মানুষ তা' অতিক্রম করতে চায়। আমার প্রতি টান ছাপিয়ে ছিল ওর জায়ের প্রতি টান। জা চ'লে গেছে, তার প্রতি টানে বেঁচে-থাকার ইচ্ছাটাই উবে গেছে। আমার প্রতি তেমন টান থাকলে আমাকে কী খাওয়াবে, আমাকে কী পরাবে, আমার জন্য কী করবে তাই নিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠত, অন্যকথা ভুলে যেত। ঐ যে ছড়ায় আছে—ইষ্টের চেয়ে থাকলে আপন, ছিন্নভিন্ন তার জীবন। এ একেবারে তাই হ'য়ে গেল, ঠেকান গেল না। আর, ঠেকান যায়ও না, যদি মানুষ নিজেকে নিজে না-ঠেকায়। কারণ, কেউ যদি কাউকে ইষ্টের থেকে আপন ব'লে বোধ করে, ও ইষ্টের থেকে আপন ক'রে রাখে, মানুষের সেই স্বাধীনতার উপর তো কারও কোন হাত নেই। ক'দিন আগে যখন খবর পেলাম যে তার ভিতর ঐরকম tendency (প্রবণতা)-র আভাস দেখা যাচ্ছে, তখন আমি ডেকে সাবধান ক'রে দিলাম। তাতে আমাকে বলল—'না, ও-সব বাজে কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ও-সব কাজ আমি করব না।' তাহ'লে দ্যাখো আমি তার মধ্যে কতখানি weak (দুর্ব্বল) হ'য়ে গিয়েছিলাম যে আমার কাছে কথা দিয়েও সে-কথা রক্ষা করল না।

উক্ত দাদা—ঠাকুর! আমি কেবল ভাবছি, মা'র অধোগতি হবে, মা কষ্ট পাবেন। আমি এমন কী প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি যার ফলে মা'র সদ্‌গতি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্তান যদি কৃতী হয়, ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপ্রাণ হয়, তাতে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হয়। আর, মা'র উদ্ধার হবে না? মা'র উদ্ধার, মা'র সদগতি, মা'র অপরাধের

প্রায়শ্চিত্ত তো সাধারণ কথা! মা'র সন্তানের জন্য মমতা থাকেই, মৃত্যুর পরও একটা আকর্ষণ থাকে তার দিকে, সেই সন্তান যদি অটুট, আপ্রাণ আদর্শপ্রাণ হ'য়ে ঊর্দ্ধগতি-সম্পন্ন হ'য়ে চলে, তাতে মা'রও কল্যাণ হয়। জীবিত বা মৃত প্রিয়জন যারা তাদের সব চাইতে বেশি উপকার করা যায় এইভাবে চ'লে—অবশ্য যদি সত্যিকার পারস্পরিক প্রীতি থাকে। প্রীতি না-থাকলে ভালটারও কদর্থ করে।

দাদাটি অসহায়ের মত ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে আছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর দরদের সুরে বললেন—যে গেছে সে তো গেছে, আমি তো তোর আছি।

একটু পরে ভাবগম্ভীর কণ্ঠে অভয়বাণী উচ্চারণ করার মত বললেন—

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

এরপর দাদাটির চেহারা, হাবভাব কেমন যেন মুহূর্ত্তেই বদলে গেল।

শ্রীযুত হেম চৌধুরী-মহাশয় কাশীপুরের হাট থেকে বাজার ক'রে ফিরছিলেন, দূর থেকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর গড়গড়া সরাতে বললেন এবং সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর গল্পচ্ছলে বললেন—মানুষ কত কষ্ট ক'রে টাকাপয়সা যোগাড় করে, বাজারে যেয়ে নিজ-হাতে কেনাকাটা ক'রে জিনিসপত্র কিনে এনে গিন্নীর সামনে ধরে, সে যদি একটু বাহবা দেয় বা হাসিমুখে চায়, তাহ'লে আর কথা নেই। তার সব কষ্টের লাঘব হ'য়ে যায় ওখানে।

সরোজিনীমার দিকে চেয়ে রহস্য ক'রে বললেন—রাধারমণ রাগ-ধাগ করলে কী হবে, তোকে খুশি করার চেষ্টার কিন্তু অন্ত নেই তার। খেটেপিটে আয়-উপায় ক'রে যা' আনুক, তার মালিক কিন্তু বোনার মা ছাড়া আর কেউ না। জমি-জায়গা কেনার পিছনেও উদ্দেশ্য হ'ল তোকে খুশি রাখা।

সরোজিনীমা (সহাস্যে)—আমার খুশির জন্য না, ছাই! ছেলের জন্য করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছাওয়াল তো পরে। আগে ছাওয়ালের মা, তারপর ছাওয়াল। ছাওয়ালের জন্য কিছু করলে ছাওয়ালের মা খুশি হবে, সুখী হবে, সেই লোভে করে। বাপু! ঢাকলে কী হয়? কে কোন্ দিকে চেয়ে কোন্ দিকে পা ফেলে তা' কি আর আমি বুঝি না? মানুষ চরাতে-চরাতে ঘুঘু হ'য়ে গেলাম!

সরোজিনীমা—আপনি সব বোঝেন, সব জানেন, তা' টের পেয়েও তো আপনাকে ফাঁকি দেবার বুদ্ধি আমাদের যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেকে ফাঁকি দেবার বুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন ও-বুদ্ধি যায় না।

এরপর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) নাট্যমণ্ডপ বাড়াবার কথা বললেন। কোন্ দিকে কতটা বাড়াতে হবে, মঞ্চটা কেমন হবে—সব বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের বক্তারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের মত মঞ্চের উপর থেকে কোন্ ভঙ্গীতে বক্তৃতা করবেন তা' অভিনয় ক'রে দেখালেন (হাতনাড়া, মুখভঙ্গী, চোখের চাউনি, দাঁড়াবার কায়দা, ভাব, ভাষা ইত্যাদির নমুনা-সহ)।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবভঙ্গী দেখে সকলেই উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন।

ভোলানাথদাকে (সরকার) লক্ষ্য ক'রে হাবভাব দেখিয়ে বললেন—ভোলানাথদা মুসোলিনীর মত বক্তৃতা করবে।

ভোলানাথদা সলজ্জভাবে খুশির হাসি হাসছেন।

কেষ্টদা—ভোলানাথদা বললে খুব ভাল পারেন, কিন্তু বলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন ? আমাদের যা'-কিছু সম্পদ, তা' exercise (অনুশীলন) ক'রে ফুটন্ত ক'রে তোলা লাগবে। আর, সব-কিছু ইষ্টের কাজে লাগিয়ে সার্থক ক'রে তুলতে হবে। নচেৎ life is an empty dream (জীবন একটা মিথ্যা স্বপ্ন)।

কেষ্টদা—এইভাবে সম্ভাব্য সব রকমে প্রস্তুত হওয়ার কথা তো আমরা ভাবি না। আমরা মোক্তাভাবে ভাবি—আপনি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার পালন করার কথা বলেছেন, তাই ক'রে গেলেই হ'ল। তদুপরি আপনি যদি কখনও কোন বিশেষ আদেশ বা নির্দ্দেশ দেন, তাও পালন করব। আর চাই কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর ভিতরই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় যা'-কিছুই এসে পড়ে। যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী ও সদাচার এই ক'টি ব্যাপারকে আপনি যত গভীর, ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভাববেন, ততই দেখবেন, এগুলির ইতি নেই, শেষ নেই। এর প্রত্যেকটার জন্যই অফুরন্ত ও অক্লান্ত করা লাগে। ধরেন, যাজনের প্রস্তুতির কি কোন সীমারেখা আছে ? আপনি তো কত পড়াশুনা করেছেন জীবনে, আমার কথাগুলি নানাদিক্ থেকে বোঝেন ও বোঝাতে পারেন মানুষকে—যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ ইত্যাদি দিয়ে। তবু কি আপনার মনে হয় না, আরো অনেক জিনিস জানা থাকলে আপনার পক্ষে সুবিধা হ'ত ?

কেষ্টদা—সে বোধ তো আমার সর্ব্বদাই লেগে আছে। তাই, নিজের বুঝ পরিপক্ব করবার জন্যই তো পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন আত্মপ্রস্তুতি কতখানি প্রয়োজন। আর, পড়া তো একটামাত্র দিক্। সেবা যাজনের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। মানুষের কতরকমের প্রয়োজন ও কতভাবে তাদের সেবা দেওয়ার দরকার হ'তে পারে, তার কি কোন লেখা-

জোখা আছে? ভাবতে গেলে তো bewildered (বিহ্বল) হ'য়ে যেতে হয়। তবে, যার যেমন সুযোগ, সুবিধা, সম্ভাব্যতা ও প্রবণতা আছে, তার সদ্ব্যবহার করা ভাল। হাতিয়ার যত বেশী থাকে ততই লাভ। যাজন কথায় হয়, বক্তৃতায় হয়, গানে হয়, লেখায় হয়, অভিনয়ে হয়, কথকতায় হয়, নাচে হয়, আঁকায় হয়, স্থাপত্যে হয়, ভাস্কর্য্যে হয়, বিজ্ঞানে হয়, গবেষণায় হয়, হাতের কাজে হয়, খবরের কাগজে হয়, রেডিওতে হয়, রেকর্ডে হয়, সিনেমায় হয়, টেলিভিশনে হয়, কৃষিতে হয়, শিল্পে হয়, শিক্ষায় হয়, স্বাস্থ্যে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে হয়, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে হয়, উৎসবে হয়, মেলায় হয়, প্রদর্শনীতে হয়, আচারে হয়, আচরণে হয়, চরিত্রে হয়, সংগঠনে হয়, সেবায় হয়—না-হয় কোন্ দিক্-দিয়ে বলতে পারেন? আপনার পক্ষে যেদিক্-দিয়ে যতখানি সম্ভব তা' তো আপনি করবেন। নিরন্তর অনুশীলনরত যদি না থাকেন, তাহ'লে তো আপনি stagnant (নিশ্চল) হ'য়ে গেলেন। আপনার becoming (বৃদ্ধি) হবে কেমন-ক'রে? মানুষ ইষ্টকে নিয়ে actively engaged (সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত) থাকলে, তবেই থাকে চিরতরুণ। সে করে, জানে, হয়—ক্রমাভিগমনে, শ্রেয়ার্থ-সার্থকতায়। জীবনটা তার কাছে একটা দুর্ব্বহ বোঝা হ'য়ে ওঠে না। এ-চলায় ক্লান্তি আসে না, বরং একটা পাগলা রোখ পেয়ে বসে। প্রেষ্ঠের কাছে উপভোগ্য হ'য়ে নিজের জীবনটাকে উপভোগ করবার রোখ—তাতে যত কষ্টই হো'ক-না-কেন। এই সীমায়িত জীবনেই তার অনন্ত জীবনের দুয়ার খুলে যায়। সে গেয়ে ওঠে—

অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ,
থাক চিরদিন অনন্ত অপার,
ধরা যদি দিতে, ফুরাইয়া যেতে
তোমারে ধরিতে কে চাহিত আর।
... ...
পিছু পিছু ছুটে যত যাব আমি
তত দূরে দূরে সরে যাবে তুমি,
ফুরাবে না তুমি, ফুরাব না আমি,
তোমাতে আমাতে র'ব একাকার।

এ-সব বর্ণনা ক'রে বোঝাতে গেলে মানুষের মনে হয়, অতিরঞ্জিত ক'রে বলা হচ্ছে। কিন্তু যার ভিতর ছিটেফোঁটাও এই ভাব জেগেছে, সে টের পায়, জীবনের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য কাকে বলে।

ভোলানাথদা—আপনি বললেন, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির

ভিতর-দিয়েও যাজন হয়—কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের কেমিক্যাল ওয়ার্ক্‌স্‌-এর প্রিভেণ্টিনা ও এ্যাজামণ্ডিট দিয়ে কি কম যাজন হইছে নাকি? এক সময় তো সারা দেশে নাম-ডাক প'ড়ে গিছিল। সেবাবুদ্ধি নিয়ে যদি করা যায়, আর কোন-কিছুতে যদি মানুষের বিশেষ সুখ, সুবিধা ও উপকার হয়, তাহ'লে মানুষ সেটা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। আপনাদের ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্ক্‌স্‌ও কিন্তু কম কাজ করেনি। আপনাদের এই সব কাজের দক্ষতা দেখে সৎসঙ্গ-সম্বন্ধেও লোকের একটা আস্থা বেড়ে গেছে।...আপনি ডাল-ভাত খান, স্বাস্থ্যটি নীরোগ ও গোলগাল, দরকার হ'লে ভূতের মত খাটতে পারেন, মানুষের কাছে এতেও একটা যাজন হ'য়ে যায়। আজকাল তো জায়গায়-জায়গায় সৎসঙ্গ কৃষিস্থান করার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। সেখানে যদি উন্নত উপায়ে লাভজনকভাবে কৃষি ক'রে এমন নমুনা দেখান যায় যাতে ফলন বাড়ে, নূতন-নূতন জিনিসের চাষ হয় ও মানুষের আয় বেড়ে যায়, তাহ'লে তা' দেখে দেশের লোক বুঝবে যে সৎসঙ্গ এই দুর্দ্দিনে একটা কাজের মত কাজ করল। গ্রুয়েল কিচেন্‌ খুলে যে-সেবা হয়, সে-সেবা হ'ল সাময়িক, কিন্তু এই সেবায় স্থায়ী কাজ হয়। যাজকের জিদ থাকবে—মানুষকে কষ্ট পেতে দেব না, পড়তে দেব না, মরতে দেব না।—এমনতর একটা ধনুকভাঙ্গা পণ নিয়ে যদি চলে ও আড়েহাতে লাগে, দেশের চেহারা ফেরাতে কি দেরি লাগে নাকি? অন্যের গায় ব্যথা লাগলে, আমার গায় তার চোটটা যদি কিছুমাত্র অনুভব না-করি, তাহ'লে কি শুধু পোষাকী সমবেদনায় কাজ হবে? অনুভব করা চাই, কিন্তু অনুভব ক'রে অভিভূত হ'য়ে পড়লে হবে না, সাহস ও শক্তির সঙ্গে তার প্রতিকার করা চাই। দুঃখ-কষ্টের ভিতর প'ড়ে মানুষ যাতে নিস্তেজ হ'য়ে না-পড়ে, বরং তার ভিতর-দিয়েই উন্নতির পথ ক'রে নেয়, তেমনতর বল সঞ্চারিত ক'রে দিতে হয় মানুষের ভিতর। অমনতর চলন নিজের স্বভাবগত ক'রে নিতে না-পারলে কিন্তু শুধু মৌখিক উপদেশে মানুষের ভিতর প্রেরণা সঞ্চার করা যাবে না। একটা rationally adjusted active optimistic out-look (যুক্তিসঙ্গত সক্রিয় আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী) নিয়ে অটুট নিষ্ঠায় ইষ্টের পথে চলতে হয়। এই চলন পরিবেশের ভিতর মঙ্গলের মধু ছিটাতে-ছিটাতে চলে। তাই, সব-চেয়ে effective (কার্য্যকরী) যাজন হয় নিজের চরিত্র-দিয়ে।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আমি কলকাতার কাজকর্ম্ম সম্পর্কে প্রফুল্লকে অনেক কথা বলেছি। 'সেবা-বৃত্তি'র বাক্স আগে যেমন ছিল, তেমনি ক'রে আবার যদি চালু করা যায়—ভাল হয়। তারপর কর্পোরেশনের প্রায় প্রত্যেক ওয়ার্ডেই

যথেষ্ট সৎসঙ্গী আছে, কিন্তু ওয়ার্ড-অনুযায়ী সৎসঙ্গীদের কোন list (তালিকা) নেই। সেই অনুযায়ী list (তালিকা) ক'রে যদি প্রত্যেক ওয়ার্ডে উপযুক্ত অধ্বর্য্যু নিয়োগ ক'রে শাখা ও অধিবেশন-কেন্দ্র করা যায়, তাহ'লে সবটা organized (সংগঠিত) হ'য়ে ওঠে। চেষ্টা করলে প্রত্যেক ওয়ার্ডে সৎসঙ্গের নিজস্ব জমি ও বাড়ি হ'তে পারে। সৎসঙ্গী ছাত্র কলকাতায় কম নেই। এদের সঙ্ঘবদ্ধ ও যাজনমুখর ক'রে ছাত্র সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম ও কৃষ্টিমূলক ভাবধারা প্রচার করা যায়, এবং ছাত্রদের ভিতর-থেকে কর্ম্মীও সংগ্রহ করা যায়। সৎসঙ্গী যে-সব ডাক্তার আছেন এবং আমাদের যে-সব ডাক্তার বন্ধু আছেন, তাঁদের সহায়তায় একটা সৎসঙ্গ মেডিক্যাল সার্ভিস্ বোর্ড গঠন ক'রে দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সকলকেই চিকিৎসাদি ব্যাপারে সাহায্য করা যায়। মাঝে-মাঝে সারা কলকাতা ও শহরতলীর সৎসঙ্গীদের সমবেত ক'রে উৎসবাদি করলে সৎসঙ্গীরাও চাঙ্গা থাকে, আর নিজেদের সঙ্ঘ-শক্তিটাও বোঝা যায়। তা'ছাড়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সেবা ও পরিবেশের সেবা কতখানি করতে পারি তাও নির্দ্ধারণ করা যায়। আমাদের ভিতর সবরকমের লোক আছে, কিন্তু পরস্পরের জানা-পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। আপনি যে জেলায়-জেলায় জমি সংগ্রহের কথা বলেছেন, সে-কাজ কিন্তু সবচেয়ে ভালভাবে করা যায় কলকাতায় থেকে। কারণ, বাংলাদেশের বড়-বড় জমিদাররা বেশির ভাগই কলকাতায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যায়, তাহ'লে কলকাতায় ব'সেই সারা বাংলায় জমি সংগ্রহের ভিত্তি-পত্তন করা যায়। বড় বড় খবরের কাগজগুলি বের হয় কলকাতা থেকে, কাগজের মাধ্যমে যদি আপনার সংগঠনমূলক ভাবধারাগুলি পরিবেষণ করা যায়, তাহ'লে সারা দেশের লোক উপকৃত হয়। তা'ছাড়া, আপনার লেখাগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা প্রয়োজন, সে-কাজেরও ব্যবস্থা করা যায় কলকাতায় ব'সে। সবদিকে নজর রেখে যে-ভাবে simultaneously (যুগপৎ) সব-কাজ করা যায়, আর একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা লিখে ফেলে সেইভাবে অগ্রসর হ'তে বলেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। এগুলি চেষ্টা করলে যে না পারে তাও হয়তো নয়। কিন্তু এ-সব কাজ করতে দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, শরীর শক্ত না-হ'লে সামাল দেওয়া কঠিন আছে। আর, বেশ কয়েকজন ভাল সহকর্ম্মী যোগাড় করা চাই। তাদের ভরণপোষণ ও গঠন ইত্যাদির দায়িত্ব নিজে নিতে হয়। পেলেপুষে, গ'ড়েপিটে যোগ্য ক'রে নিতে পারলে অবশ্য ভাবতে হয় না, পরে তারাই কতজনকে পালতে পারে। কাজে যত স্ফূর্ত্তি হয়, স্ফুরণও তার তেমনি হয়।

কেষ্টদা—তা' তো বেশি দেখা যায় না। শেষটা বেশির ভাগ কর্ম্মীর পরিবারসুদ্ধ

পরিপোষণের দায়িত্ব আপনার উপর প'ড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের কর্ম্ম যদি আমাকে উচ্ছল ক'রে তোলে, তাহ'লে সে দায়িত্ব আমাকে কাবু করতে পারে না। কিন্তু আমাকে যদি তাজা না-রাখে, তাহ'লে তারাই বা তাজা থাকবে কি-ক'রে? প্রত্যেকের এমনভাবে কাজ করা লাগে যাতে তার কাজ সপরিবার তাকে তো প্রতিপালন করেই, তা'ছাড়া দুঃস্থ ও অক্ষম যারা তাদেরও দায়িত্ব কিছু-কিছু বহন করে, তদুপরি বাড়তি প্রচেষ্টাগুলিকেও পুষ্ট ক'রে তোলে। অবশ্য, সবচাইতে ভাল হয়, যদি আমার কাছ থেকে না-নিয়ে লোকের স্বতঃস্বেচ্ছ শ্রদ্ধার অবদানের উপর দাঁড়াতে পারে।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর কথা বলতে-বলতে বাঁধের ধারে তাসুতে ফিরে আসলেন।

১লা অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫০ (ইং ১৭।১১।১৯৪৩)

ক্যাপেল ব্রিটন নামক একজন ইংরেজ যুবক আজ কয়েকদিন হ'ল আশ্রমে এসেছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক পিপাসা অত্যন্ত প্রবল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ-আলোচনা ক'রে কতকগুলি বিষয় পরিষ্কার ক'রে নিতে চান। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন, এমন সময় প্রফুল্লসহ তিনি এসে তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন সবাইকে স'রে যেতে বললেন। প্রফুল্ল রইল দোভাষীর কাজ করবার জন্য!

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার এখানে কষ্ট হ'চ্ছে না তো?

ক্যাপেল—না। সৈন্যবিভাগে কাজ করতে এসে আমরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে শিখেছি। সে তুলনায় এখানে আরামে আছি। আর, আশ্রমবাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমার খুব ভাল লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার অন্তরে ভালবাসা আছে, তাই তা' অন্যের অন্তরের ভালবাসাকেও জাগ্রত ক'রে তোলে। ভালবাসার সম্পদ্ যার আছে, কেউ তার পর থাকে না—সবাই তার আপন।

ক্যাপেল—আপনি আমার উপর যে সদ্গুণের আরোপ করছেন, সে-সদ্গুণ আমার নেই। কেমন-ক'রে সে-সদ্গুণ আমার ভিতর জাগবে, তাইতো জানতে চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তুমি যে এই সদ্গুণ তোমার ভিতর জাগ্রত ক'রে তুলতে

আগ্রহশীল, তাতেই বোঝা যায়—তোমার প্রকৃতির ভিতর ওটা আছেই। তবে তাকে পোষণ দিতে হয়; যতই পোষণ দেওয়া যায়, ততই তা' বাড়ে। প্রভু যীশু হ'লেন মূর্ত্ত প্রেম, তাঁর প্রতি যত আমাদের টান বাড়ে, ততই তা' ছড়িয়ে পড়ে জগতের উপর। নইলে ভালবাসার অনুশীলন করতে চাইলেও করা যায় না, প্রবৃত্তির পাল্লায় প'ড়ে ভালবাসা বিপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে যায়। তার বিশুদ্ধতা বজায় থাকে না।

ক্যাপেল—প্রভু যীশুকে তো ভালবাসতে চাই, কিন্তু তাঁকে তো অন্তরে উপলব্ধি করতে পারি না। আর, এও বুঝতে পারি না, এই যুদ্ধবিগ্রহ ও অশান্তিময় জগতে ভালবাসার স্থান কতটুকু।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রভুকে কায়মনোবাক্যে ভালবাসেন, তাঁর নীতি-নিয়ম দৈনন্দিন জীবনে পালন ক'রে চলেন, তাঁতে তন্ময়—এমন-কোন ভক্তকে যদি পাও, তবে তাঁকে অনুসরণ ক'রে তাঁর মাধ্যমে প্রভুর উপলব্ধি সহজ হ'য়ে উঠতে পারে। শুধু বই প'ড়ে বা কল্পনা ক'রে তাঁকে বোঝা যায় না। তদ্গতচিত্ত, তদ্গতচরিত্র জীবন্ত মানুষকে দেখেই তাঁকে আমরা কিছু-কিছু বুঝতে পারি, অবশ্য শুধু দেখলেই হয় না, ভালবেসে তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলতে হয় বাস্তবে। দরকার হ'ল unconditional surrender (নিঃসর্ত্ত আত্মসমর্পণ)। কারণ, তাঁর কথা আমার যতটুকু ভাল লাগে, যতটুকু পছন্দ হয়, ততটুকু যদি মানি, আর যা' ভাল না-লাগে বা পছন্দ না-হয়, তা' যদি না-মানি, তবে কিন্তু আমার complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয় না। তাঁর অনেক কথা ভাল লাগে না বা বুঝতে পারি না, তার কারণ হ'ল complex (প্রবৃত্তি), complex (প্রবৃত্তি) আমাদের বুঝতে দেয় না। যে reason-এর (যুক্তির) আমরা এত বড়াই করি, সে reason (যুক্তি) কিন্তু আমাদের খুব বেশি সাহায্য করে না। কারণ, reason (যুক্তি) চলে complex ও sentiment (প্রবৃত্তি ও ভাবানুকম্পিতা)-অনুযায়ী। তাই নির্বিচারে তাঁর নির্দ্দেশ পালন ক'রে চলতে হয়। ভাল লাগুক না-লাগুক, জোর ক'রেও তাঁ'র নির্দ্দেশগুলি পালন ক'রে চলতে থাকলে—পরে বোঝা যায় তিনি কেন কী বলেন। এইভাবে চলতে-চলতে আমরা আমাদের submerged complex (নিমজ্জিত প্রবৃত্তি)-গুলি চিনতে ও বিন্যস্ত করতে শিখি। তাই, একজন seer-এর (দ্রষ্টার) guidance-এ (পরিচালনায়) না-চললে complete transmutation of personality (ব্যক্তিত্বের পূর্ণ রূপান্তর) হয় না। চরিত্রের মধ্যে অনেক গোঁজামিল থাকে। সদ্বৃত্তির বিকাশ হ'লেও তার মধ্যে প্রায়শঃ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-কামনাই প্রধান থাকে। তাই, real elevation of being (সত্তার প্রকৃত উন্নতি) হয় না।……আর, জগতে যে আজ

এত অশান্তি ও দ্বন্দ্ব, তার কারণ আদর্শকেন্দ্রিকতার অভাব। Lord Christ (প্রভুখ্রীষ্ট)-কে কেন্দ্র ক'রে যদি আমরা চলতাম, আর মানুষকে যদি তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত করতে পারতাম, তাহ'লে এ-অবস্থার সৃষ্টি হ'ত না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের interest (স্বার্থ) হ'য়ে উঠত। কেউ কাউকে মারার কল্পনা করত না। অন্যকে মারা মানেই তো নিজের বাঁচার ভিত্তি-ভূমিকে ক্ষয় ক'রে ফেলা।......মনে রাখতে হবে—যাঁরাই Advent (তথাগত), তাঁরাই bedewed with the attributes of Providence (বিধাতৃপুরুষের গুণে অভিষিক্ত), আর তাঁরাই Christ (খ্রীষ্ট)। Christ (খ্রীষ্ট) মানে anointed (অভিষিক্ত)।

ক্যাপেল—মানুষ যদি ভগবানকে নাও ভালবাসে, তা' সত্ত্বেও তো মানুষকে ভালবাসতে পারে। মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসাটা তো অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। আর, আমি দেখেছি, প্রায় প্রত্যেকের ভিতর এই প্রবণতা আছে। তা' সত্ত্বেও জগতে কেন এত হিংসাদ্বেষ ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর ভালবাসাও যেমন আছে, তেমনি হিংসাদ্বেষও আছে। মানুষের সামনে এমন কাউকে ধরা লাগবে যাঁকে ভালবেসে তার ভালবাসার প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে ওঠে ও হিংসাদ্বেষ সুনিয়ন্ত্রিত ও সংযত হয়। সেইজন্য Lord (প্রভু)-কে যদি সঞ্চারিত করা না-যায়, তাহ'লে মানুষ তার নিজস্ব সম্পদ্ নিয়ে বড় বেশি দূর এগোতে পারবে না। যতখানি স'য়ে-ব'য়ে, বৈশিষ্ট্য বুঝে ও মাত্রাবোধ বজায় রেখে পারস্পরিক সঙ্গতি নিয়ে চলা যায়, কার্য্যকালে তা' আর হ'য়ে উঠবে না।

ক্যাপেল—আপনি যেভাবে বলছেন, তার ভিতর-দিয়ে গুরুবাদ এসে পড়ে। গুরুবাদের একটা মস্ত দোষ এই যে গুরু যদি ঠিক না-হন, তাঁর দোষগুলিও মানুষ নির্ব্বিচারে অনুসরণ করে, এবং শিষ্যের গুরুভক্তির সুযোগ নিয়ে তিনি তাকে শোষণ করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য গুরু-হিসাবে কাউকে গ্রহণ করবার আগে ভাল ক'রে দেখে-শুনে নিতে হয়। বিশেষতঃ দেখতে হয়, তাঁর গুরুভক্তি কেমন, এবং তিনি যে-উপদেশ দেন তা' তিনি নিজে পালন করেন কিনা। প্রকৃত গুরু যিনি তিনি নিজের স্বার্থকে অপরের স্বার্থ থেকে আলাদা ক'রে ভাবতে পারেন না, তাঁর সবসময় বুদ্ধি থাকে—মানুষকে বাড়িয়ে তোলা। তিনি যখন মানুষের কাছ থেকে কিছু নেন, তখনও ঐ দেওয়ার ভিতর-দিয়ে তার উপকার হবে ব'লেই নেন, নচেৎ নেওয়ার গরজে নেন না। তাই exploit (শোষণ) করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। But he may exploit our complexes to serve our being (কিন্তু তিনি আমাদের সত্তাকে সেবা করবার

জন্য আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে শোষণ করতে পারেন)। ধর, একজনের হয়তো মদের নেশা আছে। হাতে টাকা-পয়সা থাকলেই সে নেশা করবে। তার কাছ-থেকে নিয়ে-নিয়ে তাকে যদি সব সময় টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে রাখা যায়, তাহ'লে হয়তো তার নেশা করবার বুদ্ধি ও সুযোগ ক'মে যাবে। এ-ক্ষেত্রে তার কাছে-থেকে lovingly (প্রীতির সঙ্গে) নেওয়াটাই তার উপকারের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। তবে ঠিকমত গুরুকরণ না-হ'লে যে মানুষের ক্ষতি হ'তে পারে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে নিজেই আলোর সন্ধান পায়নি, সে অন্যকে আলো দেখাবে কী-ক'রে? যে নিজেই প্রবৃত্তিপরায়ণতার ঊর্দ্ধে ওঠেনি, সে অন্যকে তার ঊর্দ্ধে উঠতে সাহায্য করবে কী-ক'রে?

ক্যাপেল—গুরু করতে গিয়ে যখন নানারকম ভুল ও বিপদের সম্ভাবনা, তখন গুরু না ক'রে নিজের মত সাধনা করাই তো ভাল! ভগবান্ তো আছেন, মানুষ আন্তরিক-ভাবে তাঁকে চাইলেই তাঁকে পাবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর গুরুকে না ধ'রে নিজের মত সাধনা করলে, নিজে যেমন আছি তেমনই হ'য়ে থাকব, নিজের দুর্ব্বলতাগুলি ভাল ক'রে ধরতেও পারব না, ও সেগুলিকে অতিক্রমও করতে পারব না। ভগবান্কে পাওয়া মানে—আমার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভগবানের চরিত্র লাভ করা। আমার সামনে সেই চরিত্র ও চলনের যদি একটা living example (জীবন্ত দৃষ্টান্ত) না থাকে, তবে আমার চরিত্র ও চলনকে mould (গঠন) করব কী ভাবে? ভগবান্কে পাওয়া একটা মামুলী কথা নয়। সামান্য একটু দর্শন, শ্রবণ হ'লেই অনেকে মনে করে যে খুব বড়-কিছু হ'য়ে গেল। তা' কিন্তু নয়। চরিত্র না বদলালে, complex (প্রবৃত্তি)-গুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) না হ'লে দর্শন, শ্রবণ বা আনন্দের উদ্দীপনে কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় না। ওগুলি হ'য়েও যে-কোন সময় egoistic explosion of complexes (প্রবৃত্তিগুলির অহমিকামুখর বিস্ফোরণ) হ'তে পারে। আবার, গুরুভক্তি না থাকলে মানুষ সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যেও বেশি দূরে যেতে পারে না। অল্পেতেই লয় এসে যায়। গুরুভক্তি যত গভীর হয়, তত সূক্ষ্ম স্তর পর্য্যন্ত self-consciousness (আত্ম-সম্বিৎ) বজায় রাখা যায়। আর, self-consciousness (আত্ম-সম্বিৎ) বজায় থাকলে, সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, গভীর হ'তে গভীরতর অনুভূতিগুলি বোধ করা যায়। যাদের চেতনা অল্পেতেই গুলিয়ে যায়, তারা একটা স্থূল অনুভূতিকেও চরম ব'লে মনে ক'রে খুশি থাকতে পারে। গুরু যত গভীরতম অনুভূতিসম্পন্ন হবেন এবং তাঁর প্রতি অনুরাগ যত গভীর হবে, ততই সাধনরাজ্যে গভীরতম অনুভূতিলাভের সম্ভাবনা থাকে—অবশ্য নিয়মিত

অনুশীলন করা চাই। এই অনুভূতিকে আবার রূপ দেওয়া চাই আচরণে। আত্মানুসন্ধান ও আত্ম-সংগঠনের প্রতিটি স্তরেই চাই গুরু।

ক্যাপেল—মানুষ যদি নৈতিক জীবন-যাপন করে, তাতেও তো চলতে পারে। আধ্যাত্মিক জীবনে না-হয় গুরুর প্রয়োজন, কিন্তু নৈতিক জীবনে তো গুরু না-হ'লেও চলে। সাধারণ নীতিকথাগুলি মানুষ বোঝেই, এবং উত্তম নৈতিক-চরিত্রসম্পন্ন মানুষও সমাজে কিছু-কিছু পাওয়া যায়, তাদের চলন দেখে নিজের চলন ঠিক করা যায়। অথচ ব্যক্তিবিশেষের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। কারও কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দেওয়া অত্যন্ত আত্ম-অবমাননাকর ব'লে মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিবিশেষের ঔরসে জন্মগ্রহণ করি ব'লে ব্যক্তিবিশেষকেই আমরা পিতা ব'লে স্বীকার করি ; প্রকৃতির বিধানই এমনতর। পুত্র-হিসাবে পিতার আনুগত্য স্বীকার করাটাকে কি আমরা কখনও অপমানজনক ব'লে মনে করি ? বরং, একজনকে পিতা-হিসাবে শ্রদ্ধাভক্তি করি ব'লেই পিতৃতুল্য যাঁরা তাঁদেরও শ্রদ্ধাভক্তি করতে পারি। উপযুক্ত একজনকে অবলম্বন ক'রেই আমাদের personality (ব্যক্তিত্ব) unified (ঐক্যবদ্ধ) হ'তে পারে। জীবনের মূলে আছে জীবনসম্বেগ। সেই সম্বেগকে যদি শতধা-বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলা যায়, তাহ'লে ব্যক্তিত্বই টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। কোন একজনকে মুখ্য ক'রে ধ'রে তাঁরই অনুসরণে যেখান থেকে যেমন প্রয়োজন, সেখান থেকে তেমন আহরণ করা চলে। তাতে কোন ক্ষতি হয় না। এই নিষ্ঠায় মানুষের যা-কিছু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে এক-এ সার্থকতা লাভ করে। এই সার্থকতার কেন্দ্র ব্যতিরেকে বহু জ্ঞান, গুণ ও অভিজ্ঞতা থাকলেও সেগুলি disintegrated lumps (অসংহত পিণ্ডসমূহ)-এর মত থেকে যায়। সে নীতি পালন ক'রে চলতে পারে, কিন্তু সেগুলি assimilated (সমীকৃত) ও absorbed (আত্মীকৃত) হয় না, indigestion of morality (নৈতিকতার বদহজম) হয়। আর, definite (নির্দ্দিষ্ট) কোন Superior Beloved (প্রেষ্ঠ) না-থাকলে মানুষের urge (আকুতি) থাকে না। মানুষ নীতির জন্য নীতি পালন করে না, কিন্তু পালন করে out of an urge to satisfy the Superior Beloved (প্রেষ্ঠকে খুশি করবার আকুতি থেকে)। তাই, Superior Beloved (প্রেষ্ঠ) না থাকলে নীতি পালনের আগ্রহও ক'মে যায়।

ক্যাপেল—প্রেষ্ঠ যে একজন থাকবেন, তার মানে কী ? বহুজনও তো থাকতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নারীর এক স্বামী না হ'য়ে বহু স্বামী হ'লে যা' হয়, তাতেও মানুষের

তাই হয়। Uni-centric adjustment (একমুখী বিন্যাস) হয় না। Conflicting personality (দ্বন্দ্বপ্রবণ ব্যক্তিত্ব) হয়। তাই, একজনকে prime (মুখ্য) ক'রে নিতে হয়। কারও শরীরের বিভিন্ন organ (যন্ত্র) যদি বিভিন্ন মায়ের গর্ভে সৃষ্ট হয়, তাহ'লে সেগুলি জোড়া লাগিয়ে কি একটা গোটা জীয়ন্ত মানুষের সৃষ্টি হ'তে পারে? Unity (ঐক্য) variety-তে (বৈচিত্র্যে) উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে, আর, variety (বৈচিত্র্য) unity-তে (ঐক্যে) meaningful (সার্থক) হয়। গোড়ায় unit (এক) চাই। একটা cell (কোষ)-এর division (বিভাজন) হ'য়ে-হ'য়ে এত বড় শরীরটা তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে গ'ড়ে ওঠে। তাই, শরীরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এতখানি সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পারস্পরিকতা থাকে। আমাদের জ্ঞানও যদি তেমনি এককে অবলম্বন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে, তবে তার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটা গভীর সমন্বয় ও সঙ্গতির সুর ফুটে ওঠে। নইলে, একটা জানার সঙ্গে আর-একটা জানার সম্পর্ক থাকে না, বিচ্ছিন্ন জানাগুলি হট্টগোল ক'রে বেড়ায়, পরস্পর পরিপূরণী হ'য়ে জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলে না।

ক্যাপেল—ভগবানের অস্তিত্বে অটুট বিশ্বাস আসে কী ক'রে? মাঝে-মাঝে সন্দেহ এসে মনকে পীড়িত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাসের মূলে আছে ভালবাসা। সত্তা-প্রীতির থেকে প্রবৃত্তি-প্রীতি যখন আমাদের প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন বিশ্বাসের জায়গায় সন্দেহ প্রবল হ'য়ে ওঠে। যখনই ভগবানের প্রতি সন্দেহ হয়, তখনই বুঝে নিও—প্রবৃত্তিপরায়ণতা পেয়ে বসেছে তোমাকে। বিশ্বাসই জীবনীয়, তাই-ই মানুষকে সৎপথে চালিত করে ও শক্তিমান্ ক'রে তোলে। অবিশ্বাস ও সন্দেহ মানুষকে অবিবেকী ও দুর্ব্বল ক'রে তোলে। সদ্‌গুরুর প্রতি টান যত বাড়ে, মানুষের ভগবদ্‌বিশ্বাসও তত পাকা হ'তে থাকে। আর, সাধনার ভিতর-দিয়ে সত্তার আদিভূমি-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করতে হয়, সেই অনুভূতির উপর দাঁড়ালে তখন মন টলে কম। প্রবৃত্তিপরায়ণতার জাল ভেদ করতে না-পারলে বিশ্বাসে স্থিতিলাভ হয় না। প্রবৃত্তিপরায়ণতা একটা মিথ্যা আবরণ সৃষ্টি করে, তা' সত্যকে আবৃত ক'রে রাখে। সূর্য্য স্বয়ংপ্রকাশ, কিন্তু তাও কেমন মাঝে-মাঝে মেঘে ঢাকা পড়ে, তা' দেখনি?

ক্যাপেল—হ্যাঁ, দেখেছি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শাস্ত্রে মায়ার আবরণ ব'লে যা' বর্ণিত হয়েছে তা' বোধ হয় এই প্রবৃত্তিপরায়ণতা।

ক্যাপেল—আজকের দিনে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে মানুষের চলার উপায় নেই, কিন্তু

বিজ্ঞান তো মানুষের শান্তির কারণ না-হ'য়ে অশান্তির কারণ হ'য়ে উঠছে। এর উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত হ'য়ে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যদি আমরা করি, তাহ'লে আমাদের চেষ্টা হবে—বিজ্ঞানের সহায়তায় আমরা নিজেরাও যাতে ভালভাবে বাঁচতে পারি, এবং অন্যকেও যাতে ভালভাবে বাঁচাতে পারি। তাতেই বিজ্ঞান জীবনে meaningful (সার্থক) হ'য়ে উঠবে পারস্পরিক পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে। এই বাঁচা ও বাঁচানর বুদ্ধিই ধর্ম্মবুদ্ধি। তাই, ধর্ম্মবুদ্ধির জাগরণ চাই। তাহ'লে অন্যের ধ্বংসের কথা না ভেবে রক্ষার কথাই আমরা বড় ক'রে ভাবব। আর, তাতে বিজ্ঞান শান্তি ছাড়া অশান্তির সৃষ্টি করবে না। তবে, সঙ্গে-সঙ্গে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি রাখা লাগে, আর দেশবিদেশের সবার মধ্যে যাতে বাঁচা ও বাঁচাবার আগ্রহ উত্তাল হ'য়ে ওঠে, তেমনতর যাজন চালান লাগে। আত্মরক্ষার প্রস্তুতি এই জন্য—যাতে ধ্বংস সত্তা ও সংহতিকে সাবাড় করতে না পারে।

ক্যাপেল—অন্যকে মারার প্রস্তুতিকেও তো অনেকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবে ধরে। কারণ, অপরে যদি বোঝে যে আমাদের মারতে আসলেই মরতে হবে, তাহ'লে সেই ভয়ে অন্ততঃ মারতে আসবে না, এবং আমাদের নিরাপত্তা বজায় থাকবে। তাই, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি রাখতে গেলেই তো হিংসা ও যুদ্ধ এসে পড়বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি থাকা চাই যথাসম্ভব অন্যের ক্ষতি না ক'রে যাতে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়। নিজ অস্তিত্বকে অন্যের হিংসার বলি হ'তে দেওয়ার অধিকারও তো আমার নেই ; কারণ, অস্তিত্ব পরমপিতার দান।

ক্যাপেল—চাহিদার নিবৃত্তি না-হ'লে নাকি ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু চাহিদাহীন জীবন কী সম্ভব ? কোন ইচ্ছা জাগবে না মনে, এটা হয় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ইচ্ছাই জাগুক, যত চাহিদাই থাকুক—তার গন্তব্য যদি হয় ভগবান, তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করাই যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে কোন দোষ হয় না। তবে, তাঁর পরিপন্থী যে-সব ইচ্ছা বা চাহিদা, সেগুলিকে আমল দিতে নেই। আমল দেওয়া মানেই বাজে বোঝা ব'য়ে ভারাক্রান্ত হওয়া। যা' আমার বাঞ্ছিত ও আমার মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে, তাকে প্রশ্রয় দিয়ে লাভ কী ?

ক্যাপেল—আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। আপনার সঙ্গে কথা ব'লে উপকৃত হ'লাম। আজ এই পর্য্যন্ত থাক্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট কিছু নয়। আমার খুব ভাল লাগে। তবে মূর্খ মানুষ,

ইংরেজী জানি না। তাছাড়া, এমন জ্ঞান নেই যে কথাগুলি ভাল ক'রে গুছিয়ে বলতে পারি।

ক্যাপেল—আপনার 'মেসেজ' বই আমি পড়েছি, ইংরেজী না জানলে কেউ ওভাবে বলতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু জানি না। কেষ্টদা কেমন-ক'রে যেন বের ক'রে নিয়েছে।

ক্যাপেল—সুযোগমত আবার আপনার সঙ্গে কথা বলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—হ্যাঁ! যখন খুশি! আমার কথায় যদি কারও উপকার হয়, তাহ'লে মনে হয় আমিই লাভবান হ'লাম। আমি যেমন আমার মধ্যে আছি, তেমনি তোমার মধ্যে আছি; তুমি যদি fulfilled (পরিপূরিত) না-হও, তাহ'লে আমিও ততখানি unfulfilled (অপরিপূরিত) থাকি।

১৩ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৫০ (ইং ২৯।১১।১৯৪৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। গোঁসাইদা (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গোস্বামী) আসতেই তাঁকে একটি দুঃস্থ পরিবারের জন্য কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে দিতে বললেন। গোঁসাইদা হাসিমুখে রওনা হচ্ছেন, এমন-সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনার কাছে যখনই চাই, আপনি উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, এই একটা রাজলক্ষণ। দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে যারা খুশি হয়, বোঝা যায়, তাদের ভিতরে সম্বল আছে।…

গোঁসাইদা খুশিমনে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন, এবং কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যুদ্ধকে উপলক্ষ্য ক'রে আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চায়না, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি জায়গার বহু লোক ভারতের মাটিতে উপস্থিত হয়েছে। এদের মধ্যে বহু যুবক আছে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু, যারা জগৎকে নতুনভাবে গ'ড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। ভারতের প্রতি অনেকেরই গভীর শ্রদ্ধা আছে। তারা বিশ্বাস করে—ভারতই পথের সন্ধান দিতে পারবে। লোকজনের কাছে যেমন শুনি, তাতে এমনতর লোকের অভাব নেই ব'লেই মনে হয়। এখন এদের মধ্যে যদি কাজ করা যায়, তাহ'লে কতকগুলি ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব নয়। বিভিন্ন দেশের কতকগুলি লোক এই ভাবে যদি ভাবিত হয়, দীক্ষিত হ'য়ে এই চলনে যদি চলে, তবে তারা যখন দেশে ফিরে যাবে, তাদের মাধ্যমে আবার অনেকে এই ভাবে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠবে।

কেষ্টদা—প্রত্যেক দেশের লোকের একটা বিশিষ্ট ধারা আছে, তাদের চিন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও সংস্কারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে যদি যাজন করা না যায়, তাহ'লে তাদের মাথায় ধরে না। তাই, এইসব লোকের মধ্যে যাজন করতে গেলে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা চাই। আর, আপনার ভাবধারাও খুব ভাল ক'রে হজম করা চাই, নচেৎ মুখস্থ-বুলির মত আপনার কথাগুলি বললে তাদের মাথায় ধরবে না। উপরন্তু যারা যাজন করবে, তাদের এমন ব্যক্তিত্ব থাকা চাই, যা' দেখে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যায়। আর, আপনার ভাবধারা অবলম্বন ক'রে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রকৃত সমস্যাগুলির অকাট্য সমাধান দেখিয়ে ইংরেজীতে ছোট-ছোট এমন কতকগুলি বই লেখার দরকার, যা' প'ড়ে মানুষ convinced (প্রত্যয়দীপ্ত) না-হ'য়েই পারে না। আর, এ-করতে গেলে আরো অনেক উপযুক্ত কর্ম্মী ছাড়া কিছুই হবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো তাই কতদিন থেকে বলছি, তিন শত কর্ম্মী সংগ্রহের কথা। এরা হওয়া চাই নিরাশী। প্রত্যাশা থাকলে এ-কাজ করতে পারবে না।

কেষ্টদা—আপনি কর্ম্মী চান, আমরাও সবার কাছে বলছি—ঠাকুর কর্ম্মী চান। মুখে-মুখে এই কথা বলা হ'চ্ছে, কিন্তু বাস্তবে তো এদিক্-দিয়ে বেশি-কিছু অগ্রসর হ'চ্ছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের দীক্ষা অনেক দেওয়া হ'চ্ছে, কিন্তু মানুষকে ঠিক-ঠিক nurture (পোষণ) দেওয়া হ'চ্ছে না। Nurture (পোষণ) দিতে পারলে এতগুলি লোকের ভিতর থেকে কতকগুলি কর্ম্মী বেরিয়ে আসা অসম্ভব ছিল না। দীক্ষিত পরিবারগুলিকে খুব ভাল ক'রে গ'ড়ে তুলতে হয়, যাতে প্রত্যেকটা পরিবার এক-একটা শিক্ষায়তন হ'য়ে জেগে ওঠে। পারিবারিক শিক্ষার মত এমন শিক্ষা আর হয় না। আর, সেই শিক্ষার প্রভাবই সব-চাইতে স্থায়ী হয়। তা' মানুষের জীবনের মধ্যে ঢুকে যায়। তাই ইষ্টপ্রাণতা, নিষ্ঠা, সেবা, সহানুভূতি, সততা, সদাচার, অনুসন্ধিৎসা, ন্যায়পরতা, সংযম, সন্তোষ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, শ্রমপরায়ণতা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, দয়া, ক্ষমা, সৎসাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা, ইচ্ছাশক্তি, অর্জ্জনপটুতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সদভ্যাস, লোকপালী আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্যম, প্রফুল্লতা, পবিত্রতা, ক্রমাগতি, কর্ত্তব্যজ্ঞান, দায়িত্বশীলতা, কথায়-কাজে মিল, প্রীতিপদ ব্যবহার, ভাবা ও করার সমন্বয়, ঝুঁকি-ঝোঁকা চলন, অসৎ-নিরোধী পরাক্রম, ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, এক-কথায় যাবতীয় সদ্‌গুণের চর্চ্চা যাতে পরিবারে-পরিবারে অঢেলভাবে হ'তে থাকে তার ব্যবস্থা করা লাগে। বিয়েতে যদি গোলমাল না-হয়, আর এই পারিবারিক চলন যদি পরিশুদ্ধ ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে দেখবেন—ভাল-ভাল সৎসঙ্গী পরিবারগুলি থেকে কত সোনার মানুষ বেরিয়ে আসবে। আর,

যে-গুণগুলির উদ্বোধন আপনারা করতে চান, সে-গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে আপনাদের। ঋত্বিকদের চরিত্রে এইসব গুণ যদি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, তারা যদি নাছোড়-বান্দা হ'য়ে এগুলির অনুশীলন ক'রে চলে, তবে তাদের দেখে-দেখে মানুষ অনেক শিখে যাবে,—অবশ্য যাদের শিখবার যোগ্যতা আছে। তাই, সৎ-সংস্কারসম্পন্ন পরিবার-গুলির ভিতর বিশেষভাবে ঢুকতে হয়। উন্নত স্তরের মধ্যে যাজন করতে অভ্যস্ত না-হ'লে নিজেদেরও কল্যাণ হয় না। প্রত্যেকটি কর্ম্মীর চরিত্র যাতে সদ্‌গুণ-বিভূষিত হ'য়ে ওঠে, সেইদিকে ফিঙ্গে হ'য়ে লাগেন। চরিত্রের মত, জীবনের মত এত বড় যাজক আর হয় না। কেউ লেখাপড়া যদি একটু কমও জানে, তাতেও আটকায় না, চাই সুগঠিত চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তা। লেখাপড়া যতটুকু দরকার, তাও তারা সহজেই আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে। যাদের হাতে পেয়েছেন, তাদের একটাকেও ছাড়বেন না। ক্রমাগত তাতিয়ে রাখবেন। ঠাণ্ডা মেরে যেতে দেবেন না কাউকে। কোন্ ঝিনুকের মাঝে মুক্তা লুকিয়ে আছে তা' কি বলা যায় ?

কেষ্টদা (সহাস্যে)—নিরাশী হ'য়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে যদি তপস্যাপরায়ণ ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে প্রত্যেকেরই তার মত ক'রে progress (উন্নতি) হয়ই ; আর, যতটুকু হয় ততটুকু লাভ। তার উপর দাঁড়িয়ে আরো এগোন যায়।·· আর, এখানকার চাষবাস ও নিরাপত্তার জন্য মেদিনীপুর অঞ্চল থেকে কতকগুলি ভাল পরিবার আনা দরকার। দুঃখ-কষ্ট স'য়েও যাতে টিকে থাকে, এমন-ভাবে বাজিয়ে আনতে হয়। আপনাদের পরিকল্পনাগুলিকে রূপ দিতে গেলে টাকারও প্রয়োজন যথেষ্ট। তাই, টাকার normal flow (সহজ আগম) যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়। আমি চাই দেওয়ার ভিতর-দিয়ে যাতে মানুষের যোগ্যতা বেড়ে যায়। মানুষের যোগ্যতা বাড়বে এবং আপনাদের resources (সম্পদ্) বাড়বে for further activity (আরো কাজের জন্য)—এই দুটো দিক্ combined (মিলিত) হওয়া দরকার।···এখন ধান ওঠার সময়। যে-সব এলাকায় ধান ভাল হয়, সে-সব জায়গায় এখানকার জন্য যদি ধান সংগ্রহ করবার ব্যবস্থা করেন, তাহ'লে অনেক ধান সংগ্রহ হ'তে পারে। অনেকে টাকা দিতে কাতর হয়, কিন্তু নিজেদের ক্ষেতের জিনিস দিতে অসুবিধা বোধ করে না।

কেষ্টদা—ঘুরে-ফিরে জোগাড় করবার লোকের অভাব, নচেৎ এটা কঠিন কিছু নয়। অবশ্য, স্থানীয় উদ্বুদ্ধ সৎসঙ্গীদের দিয়েও এটা করা যায়। বহু মিলিটারী কণ্ট্রাক্টর ইদানীং বহু টাকা রোজগার করে। এদের মধ্যে আদর্শপ্রাণ যাঁরা, তাঁদের বুঝিয়ে বললে, সৎকাজের জন্য তাঁরা অনায়াসেই দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unconditionally (নিঃসর্ত্তভাবে) শ্রদ্ধার সঙ্গে যারা দেয়, তাদের কাছ থেকে নেওয়া ভাল। Binding-এর (বাধ্যবাধকতার) ভিতর গেলে নিজেদের রকমে চলার অসুবিধা হ'তে পারে।

বাইরের একটি দাদা বাড়ি চ'লে যাবেন ব'লে প্রণাম করতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সাবধানে যেও। আর, যে-কথা বলেছি, মনে থাকে যেন।

দাদাটি বললেন—আচ্ছা। আপনার দয়ায় পারব ব'লে আশা করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারবে বই কি ? নিশ্চয়ই পাববে।

এরপর কেষ্টদা অন্যত্র গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে প্রফুল্লকে বললেন—ইন্দু (বসু) তোর সঙ্গে কলকাতায় গেলে ভালই হবে। ওর মুখ মিষ্টি আছে, আর সবার সঙ্গে মিশতে পারে। ঋত্বিকতার কাজের উপর দাঁড়িয়ে ও যাতে সংসার চালাতে পারে, এখান থেকে যাতে না-দেওয়া লাগে, তেমনিভাবে ওকে সাহায্য ক'রে দাঁড় করিয়ে দেওয়া চাই। মানুষ যদি মানুষের উপর দাঁড়ায়, তার মত কিছু নেই। এতে নিজেও বাড়ে, অপরেও বেড়ে ওঠে। উপযুক্ত ঋত্বিক্ ও পুরোহিত যদি সমাজে থাকত, তাহ'লে মানুষের কি এই দুরবস্থা হ'তে পারত ? মানুষগুলির পিছনে লেগে থেকে তারা সবাইকেই progressive (উন্নতিমুখী) ক'রে তুলত। মানুষের ভাল করার নেশা যাদের পেয়ে বসে, তারাই ভাগ্যবান্। ঐ ধান্ধা, ঐ ধ্যান-জ্ঞান নিয়ে চলে তারা। বাস্তবে এমন ক'রে চলে যারা, তাদের কখনও নিজের ভাবনা ভাবতে হয় না। মানুষই তাদের ভাবনা ভাবে। মানুষ যার স্বার্থ হয়, অর্থ তার পিছনে-পিছনে ঘোরে। তাই বলে—ভক্তের বোঝা ভগবান্ ব'ন। 'ভগবান্' মানে বিধি। ভক্ত যে, সে ইষ্টার্থে দশের বোঝা বয়, এবং বিধির বিধানে স্বতঃই পরিপূরিত হয়। ভক্ত যে, তার পরিবেশের সেবা না-ক'রেও উপায় নেই ; কারণ, ভগবান্ নিজেই ভজমান্ অর্থাৎ চির-সেবারত। তাই, কর্ম্মী যারা, তাদের উচিত—নিজেদের দুঃখকষ্টকে উপেক্ষা ক'রে পরিবেশের জন্য যা' করণীয় তা' করতে থাকা। এই করাটা যদি অব্যাহতভাবে চলে, তাহলে ভাবনা থাকে না।

অমরভাই (ঘোষ)—করার ভিতর-দিয়ে মানুষ যদি দাঁড়িয়ে যায়, তাহ'লে তো কোন কথা থাকে না, কিন্তু ঋত্বিকের নিজের বাড়িতে যদি হাঁড়ি না-চড়ে, তাহ'লে সে না-ভেবে পারে কী ক'রে ? তাই, পারিপার্শ্বিকের জন্য করার ইচ্ছা থাকলেও তো কর্ম্মীরা নিজেদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান না-ক'রে তা' করতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিবারিক সমস্যাকে প্রাধান্য না-দিয়ে দুঃখকষ্ট স'য়েও মুখ্য করণীয় যা' তাতেই tremendously engaged (প্রচণ্ডভাবে ব্যাপৃত) হ'য়ে চলে যারা, কষ্ট

তাদের কাছে কাবু হ'য়ে যায়। পারিবারিক প্রয়োজন নিয়ে যারা obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়ে, তারা কখন পারিবারিক প্রয়োজনের সমাধান করতে পারে না। Existential service (সত্তাপোষণী সেবা) অন্যের ধৃতিরক্ষণী প্রয়োজন পূরণ ক'রে নিজের প্রয়োজন-পূরণের পথ পরিষ্কার করে। তাই, এই service (সেবা) দেওয়ার কথাই ভাবতে হয় বড় ক'রে, আর কাজেও করতে হয় তাই। এই অভ্যাস যাদের মজ্জাগত, দুনিয়ায় কেউ তাদের রুখতে পারে না, দৈন্য তাদের স্পর্শও করতে পারে না। তন্ন-তন্ন ক'রে মাথা খেলিয়ে-খেলিয়ে ভাবতে হয়—কতভাবে মানুষের অস্তিত্বকে উন্নতির পথে ঠেলে দিতে পারি; আর, ভাবা-অনুযায়ী অতন্দ্রভাবে করতে হয়।···ঋত্বিকের প্রধান কাজ হ'ল ইষ্টার্থে অর্থাৎ হিতার্থে মানুষ উপায় করা। কারও কাছে যদি কিছু চাইতে হয়, আপনজনের মত সহজভাবে চাইবে—যাতে তোমাকে দিয়ে তারা উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে ওঠে, এবং নিয়ে তোমার ব্যক্তিত্ব ও মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। দৈন্যপীড়িত রকমে চাইলে উভয়তঃ ক্ষতি হয়।

বীরেনদাকে (মিত্র) বললেন—বঙ্কিম (রায়) যদি ডাক্তারকে দিয়ে দেখাবার জন্য কলকাতায় যায়, ওর উপর লক্ষ্য রাখিস। ও অন্যের জন্য খুব করতে পারে, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে বড় উদাসীন; দেখিস ওর যেন কোন কষ্ট না হয়।

বীরেনদা—আচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার পঞ্চানন চ্যাটার্জীকে দিয়ে দেখাতে গেলে আগে মাষ্টার-মহাশয়ের (ডাক্তার শশিভূষণ মিত্র) কাছ থেকে একখানা চিঠি নিয়ে নিস। শুনেছি তিনি মাষ্টারমহাশয়ের বন্ধুস্থানীয়। মাষ্টারমহাশয়ের চিঠি থাকলে বিশেষ যত্ন-সহকারে দেখবেন আশা করা যায়।···আর তোদেরও শরীর ভাল না। সেইদিন প্যারী প'ড়ে শোনাচ্ছিল—আপেলের অশেষ গুণ। যদি রোজ একটা ক'রে আপেল খেতে পারিস ভাল হয়। কলকাতায় থাকাকালীন খাওয়া কঠিন কিছু না, হাতের কাছেই পাওয়া যায়। দেবী (চক্রবর্ত্তী) ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারে।

এরপর কিছু সময় চুপচাপ কাটল।

একজন নবাগত কথাপ্রসঙ্গে বললেন—নানা ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জাতি, বর্ণ, অবতার, মত, পথ ইত্যাদির বিরোধ ও দ্বন্দ্ব মানুষের জীবনকে যত জটিল ও দুর্ব্বহ ক'রে তুলছে, এমন বোধহয় আর কিছুতে করেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর ভিতর বিরোধ ও দ্বন্দ্বের কোন স্থান নেই, আছে চিরন্তন ঐক্য ও সমন্বয়। আমরা বুঝতে পারি না, তাই বিরোধ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করি। ধর্ম্মের কোন জাতি নেই, ভেদও নেই তার। আছে বৈশিষ্ট্যানুগ আচার, আচরণ, ব্যবহার ও

অনুচলন। ধর্ম্মের জাতি বা জন্ম-উৎসব একমাত্র ঈশ্বর, অর্থাৎ ধর্ম্ম ঈশ্বরের থেকেই জাত বা উদ্ভূত। ঈশ্বরের মধ্যে আছে আধিপত্য, অর্থাৎ ধারণ-পালন-সম্বেগ-সিদ্ধতা, তাঁর প্রবর্ত্তনাতেই যা-কিছু উৎসৃষ্ট হ'য়ে বেঁচে থাকে ও বেড়ে চলে। আর, যে-নীতিকে অবলম্বন ক'রে বেঁচে থাকা ও বেড়ে-চলা বজায় থাকে, তাকেই বলে ধর্ম্ম-নীতি। সেগুলি হাতে-কলমে আচরণ করতে হয়, শুধু মুখে মুখে বললে হয় না। তাই বলে—'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ'। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বোধ ও অস্তিত্বের প্রকৃতিকে বজায় রেখে বাঁচতে-বাড়তে যেখানে যা'-যা' করণীয়, তা' নিখুঁতভাবে ক'রে চলতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত আছে ঐতিহ্য বা tradition ; ঐতিহ্য যার ভিতর-দিয়ে এসেছে, সেই তুকতাক-গুলিকে বলে প্রথা। আবার, ঐ ঐতিহ্য ও প্রথা অস্তিত্বের বুকে সংস্কার সৃষ্টি ক'রে তাকে আত্মরক্ষায় তৎপর ক'রে তুলে থাকে—কৃষ্টিগত অনুশীলন-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে। আচার, আচরণ, সংস্কাব ও কৃষ্টির বিশেষত্বের ভিতর দিয়ে জন্মগত বর্ণ বিভাজিত হ'য়ে ওঠে। এই বিভাজনা বা বিভাগ প্রত্যেককে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ভজনচর্য্যা অর্থাৎ সেবাচর্য্যার দিকে নিয়ে যায় বিস্তারমুখী ক'রে। কিন্তু এই যে বর্ণ-সমন্বিত সমাজ সৃষ্টি হ'ল, তা' কিন্তু জীবনীয় প্রয়োজনের আপূরণায়, অনুচর্য্যার স্বতঃ-পরিবেষণায়, পারগতার প্রকৃতি-অনুযায়ী, উদ্ভাবনী অভিনিবেশে. উন্নতি-নিয়মনায় স্বতঃই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—পারস্পরিক সঙ্গতি ও সহযোগিতা নিয়ে। আর, এর ভিতর-দিয়েই প্রত্যেকে তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে, পরস্পরের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে, সেবার আদান-প্রদানে, উন্নতির পরিবেষণ ও পরিপোষণে, অন্তর-বাহিরে সাম্যসঙ্গত সুব্যবস্থ চলন নিয়ে বর্দ্ধনপ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে পারে। আর, এই প্রগতির পরম পথই হ'চ্ছেন অবতার-পুরুষ। তিনি নরদেহ ধারণ ক'রে নিজের জীবন, বাণী ও আচরণ দিয়ে মানুষের বাঁচাবাড়াকে সংস্কৃতিতে সুসংস্কৃত ক'রে আরো উদ্দীপ্ত, উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত ক'রে তোলেন—বৈশিষ্ট্যকে পরিস্ফুরিত ক'রে। অবতার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বে আসতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন যেখানেই আসেন—আসেন দেশ-কাল-পাত্রের প্রয়োজন-অনুপূরণে। তিনি মূর্ত্তিপরিগ্রহ ক'রে আসেন, চ'লে যান, আবার আসেন। তাঁর আবার-আসা মূর্ত্ত ঈশ্বরেরই নবকলেবর ধারণ ছাড়া আর কিছু না—তা' যে-দেশে, যে-পরিবারে, যে-পরিস্থিতির ভিতরই আসুন-না-কেন। তাই, কোন অবতারকে উপেক্ষা করা, নিন্দা করা বা বীতরাগ দেখান মানে, তাঁদের প্রত্যেককেই উপেক্ষা করা, নিন্দা করা বা বীতরাগ দেখান। কারণ, তাঁরা প্রত্যেকেই এক। তাই, তা' করা মানে বঞ্চিত হওয়া। তাই, তা' করতে নেই। আবার, ধর্ম্মান্তরিত করাও একটা অস্বাভাবিক কথা ; কারণ, ধর্ম্মের কখনও অন্তর বা

ভেদ হয় না। ধর্ম্ম চিরকালই এক ও অভিন্ন। তাছাড়া, ধর্ম্ম কখনও পিতৃপুরুষ বা পিতৃকৃষ্টিকে অস্বীকার করার কথা অনুমোদন করে না। ধর্ম্মাচরণে অবতার-পুরুষ এবং তাঁর অবর্ত্তমানে তন্নিষ্ঠ আচার্য্যগণই মানুষের অনুসরণীয়। যাঁরা ঐ ঐশী সন্দীপনায় অভিষিক্ত নন, আত্মপ্রতিষ্ঠ অহমিকাই যাঁদের চালক, তাঁদের নিদেশ ও বিচার অবতার-পুরুষদের অভ্রান্ত নিদেশ ও বিচারের সঙ্গে খাপ খায় না। তাই, তাঁদের অনুসরণ করায় বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

ভদ্রলোক বললেন—আপনি বলছেন ধর্ম্ম এক, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টানধর্ম্ম ইত্যাদি কথা তো আমরা শুনতে পাই, আর ধর্ম্মের নামে, অবতার-পুরুষদের নামে ভেদ, বিভেদ, হিংসার তো অন্ত নেই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুধর্ম্ম, মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টানধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি কথা আমরা বাদভ্রান্তির মহড়ায় প'ড়ে বলি। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্মের মধ্যে কোন রকমারি নেই, কোন বাদ-দ্বন্দ্ব নেই। বাদ বলতে ঐ সত্ত্ববাদ—সাত্বতবাদ—যা' চিরদিনই এক প্রত্যেকের কাছে—যে-বাদের পরিণতি জীবন, বৃদ্ধি, অমরত্ব ও কল্যাণ—যা' সবারই চাহিদা। তিনি যেখানেই আসেন, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়েই আসেন অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বৈশিষ্ট্যের পালন-পোষণ ও পূর্ব্বতন অবতার-পুরুষগণ ও প্রতিটি সত্তার পরিপূরণ ক'রেই চলেন। ঐ-ই তাঁর চিরন্তন তাৎপর্য্য। এবং প্রত্যেকের ভিতর তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী ঐ তাৎপর্য্যই অভিদীপ্ত ক'রে যান। তিনি দেখতে চান—ঈশ্বরপ্রদত্ত ধারণ-পালনী সম্বেগের অনুপ্রেরণায় কে কেমন ক'রে বৈশিষ্ট্যের আসনে দাঁড়িয়ে পরিবেশের ধারণ-পালন ক'রে চলতে পারছে—অপরের বৈশিষ্ট্যকে অব্যাহত রেখে। আর, এ যত বেশি দেখতে পান, সব অবতার-পুরুষই, প্রেরিত-পুরুষই ততই নন্দিত হ'য়ে ওঠেন তাদের অন্তরে। তাই বলছিলাম—ধর্ম্মের কোন আলাদা জাতি নাই। জাতি এক ঈশ্বর। কারণ, ঈশত্ব অর্থাৎ ধারণ-পালন-সম্বেগই ধর্ম্মের উৎস; তা' থেকেই ধর্ম্মের উদ্ভব। ধর্ম্মের কোন ভেদও নেই; ভেদ আছে দেশ-কাল-পাত্রের—বৈশিষ্ট্য-অনুগ ঐতিহ্য, প্রথা, রীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির উপর দাঁড়িয়ে। আর, তাই-ই সমাজ ও বর্ণে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তা'-দিয়ে ধর্ম্মের অর্থাৎ সাত্বত-ধৃতির ভেদ হয় না। ঐ সাত্বত-ধৃতি অর্থাৎ সত্তার ধারণ-পোষণই সবার লক্ষ্য, কিন্তু ধৃতি-পোষণী আয়োজন যে-বৈশিষ্ট্যের পক্ষে যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবে না-করলে তা' ব্যত্যয়ী হ'য়ে-ওঠে, অর্থাৎ ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে ওঠে। যেমন একজনে হয়তো রুটি খেয়ে ভাল থাকে, আর-একজন হয়তো ভাত খেয়ে ভাল থাকে। যার পক্ষে যা' উপযোগী, তাকে তাই দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার, এক-এক জাতীয় বৈশিষ্ট্যসঞ্জাত সংস্কার নিয়ে

গ'ড়ে উঠেছে এক-একটি বর্ণ। বর্ণানুগ চলন হ'চ্ছে বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব। তাই, বৈশিষ্ট্যসম্মত পথে বাঁচা-বাড়ার অভিযানে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ প্রতিটি ব্যক্তিচরিত্রেই বিদ্যমান। ফলকথা, প্রত্যেকে তার বৈশিষ্ট্যের উপর দাঁড়িয়ে সত্তাকে ধারণ ও পালন ক'রে থাকে। এই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। বাঁচাবাড়ার জন্য এটা অপরিহার্য্য। তাই, এর মধ্যে ঘৃণা বা দ্বেষ-হিংসার কোন স্থান নেই। সাত্বত সত্তা চিরদিনই অহিংস। সে নষ্ট হ'তেও চায় না, নষ্ট করতেও চায় না—সত্তাই সত্তাকে সঞ্জীবিত ক'রে রাখে। পরিবেশ না-থাকলে চেতনাই লুপ্ত হ'য়ে যায়। আত্মরক্ষাই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তাই, হিংসা ক'রে ঈশ্বরের পূজা হয় না। কিন্তু শয়তানের পূজা যেখানে অবাধ হ'য়ে আছে, সেখানে তাকে নিরোধ করতে, নিরস্ত করতে এবং হিংসা-প্রবৃত্তিকে হনন ক'রে সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হিংসার প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। শয়তান মানে যা' সত্তাহিংস। কিন্তু, এই ধারণ-পালনী সম্বেগের প্রবর্ত্তনায় মানুষকে হিংসামুক্ত ক'রে যতই ধারণ-পালনী আধিপত্যে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে পারা যায়, ততই ঈশত্বের প্রতিষ্ঠা হয় বাস্তবে। এই হ'ল আসল কথা। কোন অবতার-পুরুষ বা প্রেরিত-পুরুষের কথার মধ্যে কখনও কারও অস্তিত্বকে ঘৃণা করবার বা কারও প্রতি ধারণ-পালনী অনুচর্য্যারহিত হবার সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই, ঈশ্বরপ্রীতি নিয়ে মানুষকে স'য়ে-ব'য়ে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে হবে—কুশল-কৌশলী তৎপরতায়। আর, এই চলনে চলতে-চলতে ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণও তেমনতর হ'য়ে উঠবে। তাহ'লেই দাঁড়াল—ঐতিহ্য, প্রথা, সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের বেদীতে দাঁড়িয়ে, তাকে নবায়িত ক'রে অসতের নিরোধ ও সতের পরিচর্য্যা যতখানি করতে পারব, ধর্ম্মকে পালন করা হবে ততখানি। দ্বেষ, হিংসা ও অসৎ হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে এমনি-ক'রে অমরণ ও অমৃতের পথে এগিয়ে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে—ঈশ্বর, ধর্ম্ম বা কোন অবতার-পুরুষের প্রতি বিরূপ ভাব পোষণ করা মানে—নিজ অস্তিত্বের প্রতি অসূয়াপরবশ হওয়া, আত্মবিনাশ ও আত্ম-অবদলনে উদ্যত হওয়া। সপরিবেশ নিজ অস্তিত্বের ধারণ-পালনের সমস্যা যতদিন আছে, ততদিন আমার ঈশ্বর, ধর্ম্ম ও অবতার-পুরুষকে বাদ দিয়ে চলতে পারব না। আর, এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই সমস্ত প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও মানবের মহামিলন সম্ভব হ'তে পারে। নইলে, একাকার ক'রে মিল করতে গেলে বিপর্য্যয় ও ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। জীবন, জনন ও যোগ্যতা সবই বিকৃত ও বিধ্বস্ত হ'য়ে উঠবে তাতে। আমরা কী চাই, আগে ভেবে দেখতে হবে আর চলতেও হবে সেই পথে।

১৩ই পৌষ, বুধবার, ১৩৫০ (ইং ২৯।১২।১৯৪৩)

আজ থেকে ২৩তম ঋত্বিক্-অধিবেশন আরম্ভ হ'চ্ছে। ঋত্বিক-অধিবেশন-উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান থেকে অগণিত কর্ম্মী এবং সৎসঙ্গী দাদা ও মায়েরা এসেছেন ও আসছেন। সমগ্র আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটা বিপুল উল্লাসের সঞ্চার হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বাবলা-তলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। সবাইকে দেখে তিনি আনন্দে ভরপুর। মহাখুশি হ'য়ে হাসিমুখে উচ্চৈঃস্বরে এক-একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন—কী রে, কী খবর ?

তাঁর চাউনি, হাবভাব, কণ্ঠস্বর সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে ঝ'রে পড়ছে অপার্থিব স্নেহ-প্রীতির অপার অমৃতধারা। সকলেই মুগ্ধ, বুদ্ধ, প্রেরণাপুষ্ট হ'য়ে উঠছেন—এক নবীন সঞ্জীবনী রসে অন্তর সবার অভিষিক্ত হ'য়ে উঠছে।

কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। তাই, ধীরে ধীরে কাজের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীক্ষা খুব বাড়াতে হবে। ব্যক্তি-চরিত্র গঠিত না-হ'লে কোন কাজ হবে না। তার জন্য চাই প্রত্যেককে যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-পরায়ণ ক'রে তোলা। আর, দীক্ষিতদের ভিতর-থেকে বেছে-বেছে অন্ততঃ ৩০০ কর্ম্মী সংগ্রহ করতে হবে। দীক্ষা যে বাড়বে এবং ভাল-ভাল কর্ম্মী যে সংগ্রহ হবে তার মূলে থাকা চাই আপনাদের চারিত্রিক ঐশ্বর্য্য, যা' দেখে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যাবে—সম্ভ্রমে বিনত হ'য়ে উঠবে। তখন বেশি কথা বলা লাগবে না। আর, বিশেষ-ক'রে নজর দিতে হবে agriculture, industry ও eugenics (কৃষি, শিল্প ও সুপ্রজনন)-এর দিকে। এইগুলি কিন্তু nurtured (পুষ্ট) হয় শিক্ষার ভিতর-দিয়ে। শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হয় বিহিত অভ্যাস-ব্যবহারের অর্জ্জনের ভিতর দিয়ে। এ-দিয়ে determined (নির্দ্ধারিত) হয় health and wealth (স্বাস্থ্য ও সম্পদ্)। এই health and wealth (স্বাস্থ্য ও সম্পদ্) যদি fulfilling to the principle (আদর্শের পরিপূরণী) হয়, with all its aspects with a meaningful environmental integration in and out (সর্বদিক্ দিয়ে, ভিতরে-বাইরে পারিবেশিক সার্থক সংহতি নিয়ে), তখনই we are on the coast of salvation (আমরা মুক্তির তীরে)।

মন্মথদা (দে)—দীক্ষা বাড়াবার জন্য আমরা কী-কী পন্থা অবলম্বন করব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, যাজন বাড়াতে হবে, যাজক বাড়াতে হবে। প্রত্যেকটি দীক্ষিত সৎসঙ্গীই প্রকৃতপ্রস্তাবে যাজক। তাদের যাজনমুখর ক'রে তুলতে হবে।

এক-একজন হয়তো এমনভাবে determined (সঙ্কল্পবদ্ধ) হ'য়ে উঠল যে, সে প্রতি মাসে নিজে যাজন ক'রে কয়েকজনকে দীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেই। মানুষ রুখে গেলে না-পারে এমন কাজ নেই। একটা মস্ত ঝোঁক গজিয়ে দিতে হয়। আর, বৃত্তিতে তেল মালিস ক'রে বা স্বার্থপ্রত্যাশা উসকে দিয়ে মানুষকে দীক্ষিত করতে নেই। তাতে মানুষ asset (সম্পদ্) হয় না। যাতে আদর্শের জন্য suffer ও sacrifice (কষ্ট ও ত্যাগ) করতে প্রস্তুত হয় এবং তাতেই আনন্দ পায়, তেমনভাবে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়। ক'রে পেতে হবে, ক'রে হ'তে হবে, না-ক'রে পাওয়া ঘটবে না—সেটা গোড়া থেকেই ভাল ক'রে মাথায় ধরিয়ে দিতে হবে। দীক্ষা নিয়ে প্রত্যেকে যাতে নিয়মিত নামধ্যান, যাজন ও ইষ্টভৃতি ইত্যাদি করে, এবং ক'রে রস পায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। একদিক্ দিয়ে দীক্ষা বাড়তে থাকল, আর একদিক্ দিয়ে দীক্ষিতরা ঝিমিয়ে যেতে থাকল, তাতে কিন্তু হবে না। লোকে যদি দেখে যে দীক্ষিত হ'য়ে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন হ'চ্ছে, তার যোগ্যতা বাড়ছে, জ্ঞান বাড়ছে, তার দ্বারা পাঁচজনে উপকৃত হ'চ্ছে, শান্তি পাচ্ছে,...তাহ'লে লোকে কিন্তু আপনা থেকে আকৃষ্ট হয়। এক-একজন মানুষের পিছনে যথেষ্ট খাটতে হয়। সেইজন্য কর্ম্মী-সংখ্যা বাড়াতে হয়। আর, নিজেদেরও খাটুনি বাড়িয়ে দিতে হয়। একাই একশ' এমনতর হওয়া লাগে। আবার, যদি একশ' জন একটা জায়গায় কাজ করেন, তাও নিজেদের মধ্যে এমন সঙ্গতি থাকা দরকার যাতে মনে হয়—একশ' জন মিলে যেন একজন। পরস্পরের মধ্যে love, understanding ও toleration (ভালবাসা, বোঝাপড়া ও সহনশীলতা) থাকলে, সেই দৃষ্টান্তে সকলেই উপকৃত হয়।

সুবোধদা (সেন)—কর্ম্মীরা যে মত-মাথাতে এক হ'য়ে চলতে পারে না, তার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকেরই প্রকৃতি আলাদা। দু'টি মানুষ হুবহু একরকম হয় না। কিন্তু আদর্শ ও উদ্দেশ্য যদি এক হয়, তাহ'লে প্রকৃতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক মিল হয়। এই মিল করতে গিয়ে আর একজনকে যদি তার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ ক'রে আমার ছাঁচে ঢালতে চাই, তাহ'লে সুবিধা হয় না। প্রত্যেকের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী চলা চাই, এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করা চাই। এই রকমটা না-হ'লে কিন্তু হয় না। তাছাড়া, সাধারণতঃ কেউই perfect (পূর্ণ) নয়। পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে চলতে হয়, নিজে দোষমুক্ত হ'তে চেষ্টা করতে হয় এবং অন্যেও যাতে দোষমুক্ত হ'তে পারে তেমনতর প্রবোধনা জোগাতে হয়। দোষদর্শীর রকমে কাউকে কিছু বললে তাতে তার নিজের দোষ সমর্থন করবার প্রবৃত্তি হয়। বলতে হয় দরদীর মত, সমব্যথীর

মত, শুভাকাঙ্ক্ষীর মত। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর কথা বললেও মানুষ তা' ভালভাবে নিতে পারে। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে হয়তো মানুষ ভাল, কিন্তু জানে না কেমন ক'রে দশজনকে নিয়ে চলতে হয়। তাই, সামান্য-সামান্য কারণে তাদের অন্যের সঙ্গে বিরোধ বেধে যায়। বিরোধ এড়িয়ে সম্প্রীতি নিয়ে চলবার কৌশল তাদের শিখিয়ে দিতে হয়। ক্রমাগত রাখালি না-করলে হয় না। শান্তিসংস্থাপকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে কাজ করতে হবে তোমাদের। অশান্তির জায়গায় শান্তি, অনৈক্যের জায়গায় ঐক্য প্রতিষ্ঠাই তোমাদের কাজ। আর, এ-কাজ করতে গেলে পক্ষপাতশূন্য হ'তে হবে তোমাদের। কোন একপক্ষের যদি হ'য়ে পড়, অন্যপক্ষ যদি বোঝে যে তোমাদের কাছে তার আশ্রয় নেই, তাহ'লে কিন্তু তুমি আর সামঞ্জস্য করতে পারবে না।

প্রমথদা (দে)—কাউকে যদি দেখা যায় যে সে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বিরোধী, তাহ'লে তাকে আশ্রয় দেওয়া তো সম্ভব হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বিরোধী ব'লে ধ'রে নেওয়া ভাল নয়। যার যে-ব্যাপারে ভুল থাকে, সে-ভুলটা ধরিয়ে দিতে হয়। আপনি যে তারও ভাল চান, সেইটে তার বোধ করা চাই। কারও স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'লে কথাই বেরোয় এ-রকম যে সে তা' বোধ করতে পারে। পারতপক্ষে কাউকে বাদ দেবেন না, প্রত্যেককেই আপনার asset (সম্পদ্) ক'রে তুলতে হবে, এই কথাটা মনে থাকে যেন। পরিবেশের মধ্যে যতগুলি মানুষ unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) থাকে, আপনার বাঁচাবাড়ার অভিযানও তত দুর্ব্বল হ'য়ে থাকে, এই কথাটা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুধাবন করা চাই। তাই, নিজের স্বার্থেই মানুষকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে-ক'রে চলতে হবে। হতাশ, নিরাশ বা বিরক্ত হ'লে চলবে না। যা' আছে তা' আছে, অক্লান্তভাবে তাই ক'রে চলতে হবে যাতে প্রতিকার হয়। অপরিসীম ধৈর্য্য চাই, নইলে হবে না। মানুষের চরিত্র-নিয়ন্ত্রণ সবচাইতে কঠিন কাজ। আর, খুব তাড়াতাড়ি এর ফল কিছু বোঝা যায় না। মানুষের ভিতর যে কত রকমের দুর্ব্বলতা থাকে, এবং পরিস্থিতির সংঘাতের ভিতর প'ড়ে কতভাবে যে তা' আত্মপ্রকাশ করে, তার কোন লেখাজোখা নেই। এ এক অন্তহীন সংগ্রামের ব্যাপার। তবে যাদের ভিতর অচ্ছেদ্য ইষ্টানুরাগ জেগে ওঠে, তাদের আর ভয় নেই। দোষ-দুর্ব্বলতা তাদের আটকে রাখতে পারে না, তারা ধীরে-ধীরে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে থাকে। তবে, জন্মটা ভাল হওয়া চাই।

সুরেনদা (বিশ্বাস)—আপনি যে eugenics (সুপ্রজনন)-এর কথা বলেন, তার জন্য আমাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়েগুলি ভাল ক'রে দেখে-শুনে দিতে হবে। বংশ, বিদ্যা, স্বাস্থ্য,

আয়ু, ইষ্টপ্রাণতা, চরিত্র, প্রকৃতি, বয়স, যোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে মিল ক'রে ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হ'লে সাধারণতঃ বিয়ের আগে মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে যে-ছেলের প্রতি তার শ্রদ্ধা হয় এমন জায়গায় বিয়ে দেওয়া ভাল। শাস্ত্রে যে মনোবৃত্ত্যনুসারিণী স্ত্রীর কথা আছে, মেয়ের মত নিয়ে বিয়ে দিলে তা অনেকখানি সম্ভব হ'তে পারে। কারণ, যাকে সে স'য়ে-ব'য়ে পোষণ ক'রে তৃপ্তি পায় ও নিজেকে সার্থক বোধ করে, তাকেই সে পছন্দ করবে! আবার, মেয়েদেরও ভাল ক'রে training (শিক্ষা) দিতে হয়—বিয়ে ব্যাপারটা কী এবং কেমনতর পুরুষ স্বামী হবার যোগ্য, ইত্যাদি। অবশ্য, বিয়ের আগে কাউকে যেন স্বামীর মত ক'রে না-ভাবে, বা ঐ-রকম কল্পনা ক'রে কারও সঙ্গে মেলামেশা না-করে। ওর ভিতর-দিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।...একটা ছোট্ট কথা মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। সেটা হ'ল এই— যে-পুরুষ মেয়েমুখী এবং মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তাকে কখনও স্বামী-হিসাবে নির্ব্বাচন করতে নেই। আদর্শপ্রাণতাই হওয়া চাই তার প্রধান সম্পদ্। আর, কুলশীলেও পুরুষ উন্নত, কিংবা অন্ততঃ সদৃশ হওয়া চাই। নিম্নকুলশীলসম্পন্ন পুরুষকে বিয়ে করলে যে তারই ক্ষতি—এটা বুঝিয়ে দেওয়া চাই। ক্ষতি এই দিক-দিয়ে যে তার পিতৃপুরুষাগত সংস্কার স্বামীর মাধ্যমে পরিপূরিত না-হ'য়ে বরং অবদলিত হয়, এবং তার ফলে তার সন্তানসন্ততি বিকৃত প্রকৃতিরই হ'য়ে থাকে। ফলকথা, সর্ব্বপ্রকার প্রতিলোম-সংস্রব যাতে রহিত হয় তার ব্যবস্থা করা লাগে। সবর্ণ ও অনুলোম বিবাহ যেগুলি হবে সেগুলিও যাতে বিধিমাফিক হয়, তার ব্যবস্থা করতে হয়। ঘরে-ঘরে এ-সব বিষয়ে যাজন চালান লাগে। আগে যা' হয়েছে তা' হয়েছে, এখন যেন আর একটা বিয়েও অবিহিত রকমে না-হয়। বিয়ে-থাওয়াগুলি ঠিকমত হ'লে তার ভিতর-দিয়ে অনেক ভাল মানুষ জন্মাবে।

মনোহরদা (বসু)—পণপ্রথা থাকার দরুন অনেক সময় তো মেয়ের পছন্দ-অনুযায়ী বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পণপ্রথা থাকা ভাল না। ওটা যাতে না-থাকে, তেমনভাবে লোকমত গঠন করা লাগে। সৎসঙ্গীরা ছেলের বিয়ে দেওয়ার সময় যদি কোন দাবীদাওয়া না-করে, এবং সঙ্গে-সঙ্গে যাজন ও আলাপ-আলোচনা যদি চালান যায়, তাহ'লে এই রকমটা চারিয়ে যেতে পারে।

প্রমথদা (দাসগুপ্ত)—ঠাকুর! প্রায়ই দেখা যায়—সামাজিকতা, লৌকিকতা, ভদ্রতা ও মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে মানুষের ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়, এবং তাতে বহু মানুষ বিপন্ন হ'য়ে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবেশের সঙ্গে

তাল মিলিয়ে চলতে গেলে কতকগুলি জিনিস না-ক'রেও উপায় নেই, অথচ করাও দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার সঙ্গতির মধ্যে যেমন কুলায়, তোমার সেইভাবে চলা উচিত। প্রত্যেকের সম্বন্ধেই এই কথা। ঠাট বজায় রাখতে যেয়ে যদি আয়ের চাইতে ব্যয় বেশি কর, তাহ'লে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়বে। বেশি ঋণগ্রস্ত হ'য়ে পড়লে বহুক্ষেত্রে কথা ঠিক রেখে চলা মুশকিল হয়, আর, সব সময় একটা উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। তাতে মান-সম্ভ্রম ও মানসিক শান্তি সবই বিপন্ন হ'তে বসে। তাই, যে যেমন তার সেইভাবে চলা উচিত। অবশ্য, আত্মীয় পরিজন ও পরিবেশের সঙ্গে ব্যবহারে আন্তরিকতা, হৃদ্যতা ও সৌজন্যের যেন অভাব না হয়। তুমি যা' নও, মানুষকে তা' দেখাতে ব্যস্ত হ'য়ো না। তবে, তোমার ক্ষমতায় যা' কুলায়, তা' করতেও কার্পণ্য ক'র না। সুরুচি যদি থাকে, মানুষকে প্রীত করার বুদ্ধি যদি থাকে, আন্তরিকতার ঐশ্বর্য্য যদি থাকে, সদাচার ও পরিচ্ছন্নতা যদি থাকে, ব্যবহারে মাধুর্য্য যদি থাকে, তবে নিজের সামর্থ্য-অনুযায়ী ভদ্রতা বজায় রেখে চলা কঠিন হয় না। নিজের চাল-চলন ও আচরণ দিয়েই সবাইকে তৃপ্ত ক'রে রাখা যায়।

বীরেনদা (মুহুরী)—কৃষি ও শিল্প-সম্বন্ধে আমাদের কী করতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎসঙ্গ কৃষিস্থান ক'রে এবং সৎসঙ্গী কৃষকদের দিয়ে উন্নত ধরনে কৃষি করিয়ে, সেই জিনিসটা আশপাশের লোকের মধ্যে চারিয়ে দিতে হবে। আর, কৃষির উপর দাঁড়িয়ে নানাস্থানে কুটির-শিল্পাদি যাতে গড়ে ওঠে, সে-দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কাশীশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—কোন্ কোন্ কুটির-শিল্পের দিকে লক্ষ্য দিতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি একটা লিস্ট ক'রে দিই, আর সেই অনুযায়ী যদি করতে চাও, তাহ'লে কিন্তু হবে না। স্থানীয় অবস্থা, পরিস্থিতি, প্রয়োজন, সুবিধা ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রেখে মাথা খাটিয়ে দেখতে হবে। অনুসন্ধিৎসাপূর্ণ, উদ্ভাবনমুখর সেবাবুদ্ধিই শিল্পের প্রাণ। তাকে-তাকে থাকতে হয়, ঐ নিয়ে ধ্যান করতে হয়, keen observation (তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ) নিয়ে চলতে হয়, যাদের ঐ-ধরনের knack (দক্ষতা) আছে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হয়, নিজে পড়াশুনা করতে হয়, মানুষের প্রয়োজন কী এবং তার পূরণ কী ভাবে হ'তে পারে—এই নিয়ে ভাবতে হয়। এই রকম করতে-করতে মাথায় খেলে যায়। শুধু তোমার মাথায় খেললে হবে না, যে করবে তার মাথায় খেলা চাই। আবার, কতকগুলি চরিত্রগত গুণ না-থাকলে

কিন্তু শিল্প বা ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। সেই গুণগুলি আয়ত্ত করতে হয়।

কাশীশ্বরদা—সেই গুণগুলি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রধান গুণ হ'ল—মানুষকে সেবা দেবার বুদ্ধি। কত সস্তায়, কত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে মানুষের অভাব ও প্রয়োজন মেটান যায়, সেই ধান্ধা থাকা চাই। প্রীতিজনক ব্যবহার জানা চাই। আর, চাই নিরলসভাবে পরিশ্রম করবার অভ্যাস। কথা ঠিক রাখা চাই, ও সততা বজায় রাখা চাই। চারিদিকে নজর রেখে যখন যেটা করবার তখন সেইটে করা চাই। মূলধনে তো কখনও হাত দেওয়াই চলবে না, এমনকি পারলে লাভের অর্দ্ধেক মূলধনের সঙ্গে যোগ করতে হবে। আর, কষ্ট ক'রে হ'লেও আর-অর্দ্ধেকটা-দিয়ে চালাতে হবে। বাকী দেওয়ার ব্যাপারে খরিদ্দার বুঝে যাকে যতটুকু দেওয়া চলে, তার বেশি দিতে নেই। এবং বাকী দিলেও জানা চাই—কেমন-ক'রে মানুষকে না চটিয়ে সময়মত তা' আদায় করা যায়। অনেকের এ-বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান থাকে না, যাকে-তাকে যথেচ্ছ বাকী দিয়ে চলে, এবং পরে তা' আদায় করতে না-পেরে ব্যবসা গুটিয়ে দেয়। হিসাবপত্রও খুব ভালভাবে রাখতে হয়। ব্যাপারটা উন্নতি ও লাভের দিকে চলছে, না অবনতি ও লোকসানের দিকে চলছে, সে-বিষয়ে খেয়াল থাকা চাই। আর, কেমন ক'রে তাকে উন্নতি ও লাভের দিকে চালনা করা যায়, সে-কৌশলও আয়ত্ত করা চাই। কৃতিত্বের সঙ্গে শিল্প বা ব্যবসায় যারা করে, প্রথমটা কিছুদিন শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাদের সঙ্গে থেকে হাতে-কলমে কাজকর্ম্ম শিখলে ভাল হয়। দেখতে-দেখতে, করতে-করতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় অভ্যাস আয়ত্ত হ'য়ে যায়। তখন স্বতন্ত্রভাবে করলেও আটকায় না। আর, ছোট থেকে সুরু ক'রে বড় করা ভাল। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন না-ক'রে অনেক টাকা ঢেলে প্রথমেই বড়-কিছু না-করা ভাল। আর, যথাসম্ভব অন্যের উপর নির্ভরশীল না-হ'য়ে কাজের প্রত্যেকটা step (পদক্ষেপ) নিজের জানা ও করা ভাল। অন্যকে দিয়ে করালেও নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা লাগে।

সুরেনদাকে (সেন) দেখে সহাস্যে বললেন—দরকার হ'লে আরো মাল (লাঠি ইত্যাদি) দিতে পারবি তো?

সুরেনদা—তা' দেওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে শুনে নিস।

সুরেনদা—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে নিয়ে পরে আবার কথা সুরু করলেন—যুদ্ধক্ষেত্রে

সৈন্যাধ্যক্ষদের দায়িত্ব যতখানি, তার থেকে তোমাদের দায়িত্ব ঢের বেশি। তোমাদের যুদ্ধ হ'ল against death, disease, disintegration, ignorance and poverty (মৃত্যু, রোগ, ভাঙ্গন, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে)। এই সমরাঙ্গনে একটা মুহূর্ত্তও যেন তোমাদের অযথা ব্যয়িত না-হয়। পরমপিতার ইচ্ছা ও চাহিদা পূরণই তোমাদের একমাত্র কাজ। প্রাণের ব্যাকুলতা নিয়ে, কঠোর সংকল্প নিয়ে, তীব্র সম্বেগ নিয়ে লেগে যাও তোমরা। দেখবে, তোমাদের তপস্যার মহিমায় অসম্ভব সম্ভব হ'য়ে উঠবে। গভীর তপস্যার ফলেই জেগে ওঠে personated decision (ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত সিদ্ধান্ত)। সর্ব্ব অবয়ব নিয়ে যে সিদ্ধান্ত আমাদের মধ্যে ফুটে ওঠে, তা' আমরা বাস্তবায়িত না-ক'রেই পারি না। সবদিক্-দিয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে আমাদের, যাতে মানুষের দুঃখ, দুর্দ্দশা, অশান্তি ও সর্ব্ববিধ দৈন্য ঘোচাতে পারি, প্রকৃত স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি কাকে বলে তা' মানুষকে দেখাতে পারি।... আমার খুব ইচ্ছা করে, স্যার উইলিয়ম উইল কক্সের পরিকল্পনা-অনুযায়ী দেশে নদী-সংস্কার ও সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদি করা। দেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য বিপুল সংখ্যক স্বস্তিসেবককেও সুগঠিত ক'রে তোলা লাগে। দেশের শিক্ষাপদ্ধতিকেও আমূল পরিবর্ত্তন করতে হয়। আর, এইসবের জন্য চাই মানুষ ও টাকা।

কেষ্টদা (ঋত্বিগাচার্য্য)—আমাদের দেশে ভাল-কিছু করতে গেলেই তো অকারণ অত্যাচার, উৎপাত ও বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হ'তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর জন্য কোন ভাবনা নেই। পাকা লোক যদি থাকে ও রসদ যদি থাকে, দুষ্টলোকদের দিয়েও অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। কারও complex (প্রবৃত্তি) যদি জানা থাকে, এবং নিজে যদি সেই complex-এর (প্রবৃত্তির) ঊর্দ্ধে থাকা যায়, তবে তাকে কাবেজে আনা কঠিন কথা নয়। আমরা জানি না, প্রস্তুত থাকি না, সচেতন থাকি না, আচমকা এক-একটা ঘাড়ের উপর এসে পড়ে, তাতেই বেকায়দায় প'ড়ে যাই। কিন্তু সজাগ চেতন চলন ও পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুতি যদি থাকে, তাহ'লে অনেক সহজে সামাল দেওয়া যায়। নিজেদের ভিতরে ও আশেপাশে কোন্ মানুষটা কেমন, কে কী চায়, কে কিভাবে চলে, সবটা ইয়াদের মধ্যে রাখতে হয়। এবং কাউকে দিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তার নিরসন যাতে হয়, তাই করতে হয়।

তারাশঙ্করদা (গাঙ্গুলী)—ঐ-রকম খেয়াল রেখে চলাই তো মুশকিল। আর, অত সময়ও তো পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভ্যাস করলেই হয়। এই মুহূর্ত্তেই তুমি চোখ দিয়ে দেখছ, কান দিয়ে শুনছ, চামড়া দিয়ে স্পর্শ করছ, মন দিয়ে চিন্তা করছ। এতগুলি ব্যাপার কিন্তু

একসঙ্গে করছ। তোমার যদি ঐভাবে তলিয়ে দেখা ও তলিয়ে বোঝার অভ্যাস থাকে, তাহ'লে সেটাও আপ্‌সে-আপ হ'য়ে যাবে। প্রথমে চেষ্টা ক'রে অভ্যাসটা করতে হয়।

অমূল্যদাকে (ঘোষ) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কথাপ্রসঙ্গে কয় খণ্ড ছাপা হ'ল ?

অমূল্যদা—দুই খণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেল্।

অমূল্যদা—আর দেরি হবে না।

এরপর অনেকেই ঋত্বিক্-অধিবেশনের দিকে গেলেন।

১৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫০ (ইং ১।১।১৯৪৪)

২৩তম ঋত্বিক্-অধিবেশন চলছে। প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাতৃমন্দিরের বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। শীতের দিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায় কেবল একখানি পাতলা চাদর। দক্ষিণমুখী হ'য়ে চরের দিকে চেয়ে ব'সে আছেন। মাতৃমন্দিরের পশ্চিম দিকে আশ্রম-প্রাঙ্গণে স্থানীয় তরকারিওয়ালারা তরকারি ইত্যাদি নিয়ে বসেছে। কলতলা থেকে অনেকে জল নিয়ে চলেছে। অনেকে এদিকে-ওদিকে ইতস্ততঃ রোদ পোহাচ্ছেন। রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হরেরামদা (চক্রবর্তী), জগৎদা (চক্রবর্তী), জগজ্জ্যোতিদা (সেন), করুণাদা (মুখোপাধ্যায়), অনাথদা (মুখোপাধ্যায়), সন্তোষদা (সেনাপতি), ধীরেনদা (চক্রবর্ত্তী), যোগেনদা (হালদার), অনন্তদা (ঢালি), বিধুদা (রায়চৌধুরী), জ্ঞানদা (দত্ত), কাশীদা (রায়চৌধুরী), কালীপদদা (হালদার), গুরুদাসদা (সিংহ), ভজহরিদা (পাল), ক্ষিতীশদা (সেনগুপ্ত), নৃপেনদা (বসু), সুনীতিদা (পাল), বঙ্কদা (পাল), কান্তিদা (বিশ্বাস), সুরেনদা (বিশ্বাস), ফণীদা (দে), ব্রজেনদা (ঘোষ), প্রমথদা (শিকদার), কৃষ্ণকালীদা (মিত্র), হিরণ্ময়দা (মুন্সী), মণীন্দ্রদা (সাহা), সুবোধদা (সাহা), গোকুলদা (নন্দী), সুরেনদা (মোদক), সন্তোষদা (মুখার্জ্জী), নগেনদা (চক্রবর্ত্তী), রামদা (বিশ্বাস), কিরণদা (মুখার্জ্জী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), খগেনদা (মৌলিক), ললিতদা (দাস), শৈলেশদা (বিশ্বাস), ব্রজেনদা (চক্রবর্ত্তী), প্রিয়নাথদা (কর্ম্মকার), অশ্বিনীদা (দাস), ভূপেশদা (গুহ), রমেশদা (চক্রবর্তী), ক্ষেত্রদা (ব্যানার্জ্জী), গোপালদা (শাস্ত্রী), নিশিদা (ভট্টাচার্য্য), মনোরঞ্জনদা (আচার্য্য), চারুদা (করণ), জিতেনদা (দলুই), রজনীদা (রায়), বলরামদা (ঘোষ), গঙ্গাদা (মিশ্র), শশাঙ্কদা (ঘোষ),

ননীদা (দে), বঙ্কিমদা (দাস), নরেনদা (ভট্টাচার্য্য), শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী), কালীদা (মিত্র), কালীমোহনদা (বসু), বিজয়দা (মজুমদার), বিশ্বম্ভরদা (মৈত্র), ইন্দুদা (দাশগুপ্ত), যতীনদা (গুহ), নগেনদা (সেন), নরেশদা (অধিকারী), জগদীশদা (রায়), খগেনদা (মালাকার) প্রমুখ শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। যেন এক আনন্দের হাট বসেছে। সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানির দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর স্নিগ্ধ মধুর সঙ্গ উপভোগ করছেন।

একটি দাদার হাতে একখানি বই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি বই রে ?

দাদাটি বললেন—কথাপ্রসঙ্গে প্রথম খণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পড়লি নাকি ?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ! পড়ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন লাগে ?

দাদাটি—খুব ভাল। পড়া শেষ না-ক'রে ছাড়তে ইচ্ছা করে না। আর, অন্যান্য বইয়ের তুলনায় এ-বইয়ের ভাষা খুব সহজ হয়েছে।

রবিদা (ব্যানার্জ্জী)—আপনার এই সুন্দর বইগুলির কথা বহু লোকে জানে না। আপনার বইগুলি কলকাতার ভাল-ভাল বইয়ের দোকানে যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা হ'লে ভাল হয়। আর, বিজ্ঞাপনও দেওয়া দরকার। আপনার সর্ব্বতোমুখী ভাবধারা-সম্বন্ধে বাইরের লোক কোন খবর পায় না। যদি বইগুলি হাতের কাছে পায়, তাহ'লে যারা আগ্রহশীল তারা কিনে পড়তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যদি বড়খোকার সঙ্গে কথা ব'লে দায়িত্ব নিয়ে ব্যবস্থা কর, তাহ'লে হয়।

কান্তিদা (বিশ্বাস)—সৎসঙ্গী-ভাইদের ভিতর অনেকে, এমন-কি কর্ম্মী'রাও আপনার বই ভাল-ক'রে পড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু আমাদের বই নয়, এইগুলি এবং সঙ্গে-সঙ্গে অন্যান্য বই পড়া খুব দরকার। নিজের ভাব ও বোধটা যদি খুব পাকা না হয়, তাহ'লে অন্যকে ভাল ক'রে বোঝান যায় না। প'ড়ে-প'ড়ে, ভেবে-ভেবে, ক'রে-ক'রে, ব'লে-ব'লে, শুনে-শুনে idea (চিন্তা)-গুলিকে normal (সহজ) ক'রে ফেলা লাগে। তখন মানুষের সঙ্গে যাজন করতে গেলে তত্ত্বালোচনা হিসাবে কথাগুলি বের হয় না। অনুভব ও অভিজ্ঞতার ছাপ নিয়ে প্রাণস্পর্শী রকমে বের হয়। কথাগুলি ধার-করা কথার মত হয় না, নিজের জীবনচোয়ান কথার মত হয়। তাই, মানুষ তাতে কান না-দিয়ে

পারে না। 'কানের ভিতর-দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মনপ্রাণ'—এমনতর হয়।

ক্ষেত্রদা (শিকদার)—যাজন তো আমরা করি, কিন্তু মানুষ তো তেমন আকৃষ্ট হয় না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবগুলি ভাল ক'রে মাথায় হজম করা লাগে ও চরিত্রে আয়ত্ত করা লাগে, আর সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, যাজনটা হ'ল একটা psychological operation (মনোবিজ্ঞানসম্মত কর্ম্ম)। যেখানে যখন যাকে যেভাবে যে-কথাটা যতটুকু বললে হয়, ততটুকুই বলতে হবে—উপযুক্ত সেবা, ব্যবহার ও অভিব্যক্তির সঙ্গতি নিয়ে। সঞ্চারণ-অভিজ্ঞতাও চাই। সঞ্চারণ-অভিজ্ঞতা যার যত সুন্দর ও সলীল, সে mass (জনতা)-কেও তত infuse (প্রবুদ্ধ) করতে পারে। কতকগুলি বাহুল্য কথার আমদানি করলেই যে হবে, তা' কিন্তু নয়। তা'তে অনেক সময় ফল উল্টো হয়। যাজন-সঙ্কেতের মধ্যে আমার যে কথাগুলি* দেওয়া আছে ঐগুলি

---

*(১) প্রথম জিনিসই হইল, কাহারও অহংকে আঘাত দিতে নাই; আর মানুষের ধর্ম্মবোধ বা অন্ধবিশ্বাসকে নিন্দা করিতে নাই।

(২) কাহারও সঙ্গে মিশিতে হইলে প্রথমেই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভাবভঙ্গী, চাল-চলনের সহিত তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করা চাই—সঙ্গে-সঙ্গে তাহার জীবনে কী কী চাওয়া আছে, তাহা ঠিক করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

(৩) কেহ যখন কথা কহিতেছে, স্থিরভাবে ধৈর্য্য-সহকারে তাহার সব কথা শোনা চাই-ই। আর, কথাবার্ত্তার ভিতর-হইতে যাহা দিয়া তাহাকে বুঝা যায় ও তাহাতে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় এমনতর সূত্রগুলি সহানুভূতি-সহকারে সূক্ষ্ম বুদ্ধি-মত্তার সহিত সংগ্রহ করা চাই।

(৪) মানুষের অন্তর্নিহিত চাহিদা ও ভাবগুলিকে যথোপযুক্তভাবে অনুধাবনকরতঃ তদনুকূলতার সহিত তৎপরিপূরণে তাহাকে তোমার ভাবে উন্নীত করতঃ আদর্শে উদ্‌গ্রীব করিয়া তোলাই শ্রেয়। মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবরাজিকে, তার অন্তর্নিহিত চাহিদা বা ক্ষুধাকে অবলোকন না-করিয়া তোমার ভাবগুলি তাহাতে অযথা আরোপ করতঃ মানুষকে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিও না।

(৫) কোন যাজকের, অন্ততঃ নিজেদের কথোপকথন ও ব্যবহারের কখনও দোষ ধরিতে নাই। বরং প্রত্যেকের প্রত্যেককে এমনভাবে প্রশংসা করিতে হইবে, যাহাতে মানুষের শ্রদ্ধা স্বতঃই সেই ঋত্বিক্ বা যাজকের দিকে গিয়া ব্যাপকভাবে একটা উন্নতি-

প্রবণতা আনিয়া দেয়। অথচ, অযথা কিছুই বলিতে হইবে না। অন্যান্য দোষ সত্ত্বেও, যাহা নাকি মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার এই ব্যাপারগুলি এতই সুন্দর যাহা সব কুৎসিতকে ঢাকিয়া ফেলিয়া মানুষকে মোহিত করিয়া দেয়—এমনতর রকমে লোকের, বিশেষতঃ ঋত্বিক্ ও যাজকদের গুণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে।

(৬) ততদূর ও ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ প্রশংসা বা গুণকীর্ত্তন করা উচিত, যতক্ষণ বা যতদূর পর্য্যন্ত নিজের আদর্শে ধাক্কা না-লাগে। আর, এই প্রশংসার মধ্য-দিয়াও সম্ভব-মত বড়-বড় মানুষদেরও অবনতির ও পতনের লক্ষণ কোন্‌গুলি, তা' কিছু-কিছু বলিয়া রাখা মন্দ নয়—যেমন, অমুকের যতক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্যে ও আচরণে ইষ্টস্বার্থ ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠা-প্রাণতার প্রতিকূল লক্ষণগুলি না দেখিতে পাইতেছি, ততক্ষণ তাহার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ হইতে বঞ্চিত হইতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হয় না; আর, যখনই যাহার চরিত্রে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠাপ্রাণতার প্রতিকূল লক্ষণগুলি দেখিব, তখনই তাহার লাখ গুণও কিছুতেই আমাব শ্রদ্ধা জাগাইতে পারিবে না,—আমি জানিব, তাহার যাহা-কিছু দেখা যায়, সবগুলি একটা ভয়ানক সাজান-গুছান কপট ভণ্ডামি ছাড়া আর-কিছুই না।

(৭) যদি যজমানের কথার ভিতরে কোনও ঋত্বিক্, প্রতিঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু বা যাজকের কথার এমনতর কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, যাহাতে যজমানের বুঝিবার অন্তরায় হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে এমনতরভাবে বুদ্ধিমত্তার সহিত ব্যাখ্যা করা উচিত যাহাতে ঐ ঋত্বিক্, প্রতিঋত্বিক্, অধ্বর্য্যু বা যাজকের কোনও দোষ না দিয়াও যজমানকে সহজেই বুঝাইয়া দেওয়া যায়।

(৮) যাজন করিতে গেলে এবম্প্রকার সহানুভূতি ও সেবাপূর্ণ সহজনম্য ভাব লইয়া চলা সত্ত্বেও অন্তরে-অন্তরে অটুট আদর্শপ্রাণতা লইয়া fanatically তৎপর প্রাণে বসবাস করিতে হয়। আর, তুমি যে মানুষের মঙ্গললিপ্সু হইয়া প্রতিব্যক্তিতে তোমার আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য উন্মুখ, তা' যেন তোমার ভাব, বাক্য, আচরণ ও ব্যবহারে প্রতি-প্রত্যেকের সান্নিধ্যে তাহার প্রাণস্পর্শী রকম সৃষ্টি না করিয়া শুধুমাত্র একটা নিছক খেলো পাতলামোতে পর্য্যবসিত হইয়া ঠাট্টা, ইয়ারকি বা হাস্যোদ্দীপক রকমের আবহাওয়া তৈরী না-করে অথবা তোমার বেকুবি সরলতায় অযথা বাধার সৃষ্টি না-করে।

(৯) যজমানের কোন বিষয়ে কোন দুর্ব্বলতাকে বিশেষস্থল ব্যতিরেকে কোন প্রকারে ঘৃণা বা আঘাত না করিয়া তাহার ঐ দুর্ব্বলতা যে সহজ-পরিহার্য্য তাহা—

নিজের ঐ-প্রকার দুর্ব্বলতা কতটুকু আদর্শপ্রাণতা লইয়া কী করিয়া কত সহজে অতিক্রম করা হইয়াছিল—উদ্বুদ্ধপ্রাণে ভাব, ভঙ্গী ও ব্যবহারের মধ্য দিয়া—তাহারই বিশদ উদাহরণে তাহাকে উদ্দীপ্ত করতঃ তৎকরণসন্বেগী করিয়া তোলাই দুর্ব্বলতা বা অজ্ঞানতা প্রশমনের শ্রেয় পন্থা।

(১০) নজর রেখ, তোমার অনুমান যেন কখনও তোমার বোধ-ঐশ্বর্য্যকে অবদলিত না-করে।

(১১) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা, অভাব ও প্রয়োজনের ভিতর-দিয়া মিষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন স্বতঃস্বেচ্ছ সেবার সহিত সহজ মীমাংসা ও মহত্তর পরিপূরণে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করিয়া ইষ্টপ্রাণ করিয়া তোলাই হ'চ্ছে প্রকৃষ্ট যাজন।

(১২) মানুষের জন্মগত বিশেষ সংস্কারের সহিত যে সাড়াপ্রবণতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া জাগতিক যাবতীয় বোধগুলিকে তৎসূত্রে সংগ্রহ ও সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া চলে, তাই হ'চ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্যময় সহজাত সংস্কার বা inner sentiment; মানুষের বৃত্তিগুলিকে আহত না-করিয়া চাহিদাগুলিকে সমুন্নত সম্বেগশালী করতঃ তাহাদের অন্তর্নিহিত inner sentiment-কে প্রবোধনা ও সম্বেগোদ্দীপ্তির সহিত এমনতরভাবে ইষ্টোন্নত করিয়া তুলিতে হয়, যাহাতে তাহার কর্ম্মপ্রেরণা প্রশ্ন-শূন্য সহজ-তৎপরতায় বাস্তবভাবে দক্ষ হইয়া ওঠে।

(১৩) নিজের সাধনাদি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী—যাহা নিত্য করণীয় তাহা তো করিতে হইবেই। আর, চলায় কৃতার্থ হওয়ার সঙ্কেত চারিটি প্রত্যহ রিহার্শাল দিয়া ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। আবার, নিজেদের পুস্তকাদি ও তজ্জাতীয় পুস্তক যাহা-কিছু সবগুলি নিত্য যথাশক্তি অধ্যয়ন করিয়া যতদূর সম্ভব যত বেশি প্রস্তুত থাকা যায়, ততই ভাল।

(১৪) তুমি নিজের কিংবা নিজের ভরণীয়দিগের জন্য কাহারও নিকট হইতে যতদূর সম্ভব কিছুই চাহিও না এবং গ্রহণ করিও না, কিন্তু আগ্রহ-তৎপর হইয়া কেহ যদি তোমাকে কিছু দেয়, পরম-কৃতার্থপ্রাণ অভিব্যক্তির সহিত উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহা গ্রহণ করিও—ফিরাইয়া দিও না। মানুষকে দক্ষ করার চালনী—তোমার ইষ্টপ্রীতিপ্রসূ ঐ দক্ষিণা যাহা পাও, মানুষের শক্তি-উদ্দীপনী ঐ পাওয়া লইয়াই তৃপ্ত ও জীবনপোষণে সমৃদ্ধ হইও।

(১৫) তোমার শরীর, মন, বাক্য ও অর্থ যদি কেহ কাহারও জীবন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে তোমার নিকটে আর্ত্ত হইয়া যাচ্ঞা করে, তুমি তোমার সামর্থ্যমত কিছুতেই কাহাকেও 'না' বলিয়া ফিরাইও না। সহজতঃ ও ন্যায়তঃ কাহারও কোন প্রার্থনায়

অভ্যাসগত ক'রে ফেলতে হয়। যাজন করার পর ভেবে দেখতে হয়, ঐ নির্দ্দেশগুলি থেকে ব্যতিক্রম কতখানি হয়েছে। পরে যাজন করার সময় ঐ-জাতীয় ভুল যাতে না-হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। 'How to win friends and influence people' (বন্ধুলাভের এবং লোককে প্রভাবিত করার উপায়) বইখানিও ভাল ক'রে পড়তে হয়। ঐ-সব নির্দ্দেশও আচরণগত ক'রে ফেলতে হয়। প্রথমটা ভুলত্রুটি হবেই, তাতে ঘাবড়াতে নেই। করা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্রমাগত চালাতে-চালাতে তবে জিনিসগুলি আয়ত্ত হয়। যাজনের সব চাইতে বড় লাভ আত্মশিক্ষা।... যাজন-সম্পর্কে যে যতই কৌশলী হোক না-কেন, প্রধান কথা কিন্তু হ'ল—ইষ্টের সঙ্গে অচ্যুত সক্রিয় যোগ। সেইটে না-থাকলে অন্য যত জ্ঞানই থাক-না-কেন, সব নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

আজকাল নানা স্থানে দুর্ব্বৃত্তদের উৎপাত ও অত্যাচার হ'চ্ছে, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই স্বস্তিসেবকদের দরকার। আমার আগে থাকতে মনে ডাকে, তাই দু'বছর ধ'রে বলছি। আমার মনে হয়, তোমাদের ব্যক্তিগতভাবে যার-যার বন্দুকের লাইসেন্স নেওয়া সম্ভব, তা' নেওয়া ভাল। বন্দুক থাকলে অসময়ে কাজ দেয়। স্বস্তিসেবকদের, শুধু স্বস্তিসেবকদের কেন অন্যান্যদেরও যথাসম্ভব লাঠিখেলা,

---

যত পার 'না' বাক্যই ব্যবহার করিও না। কোন অস্বাভাবিক ব্যাপারেও 'না' উচ্চারণ না-করিয়া বরং তাহা মঙ্গলে সমাবেশ ও সমাধান করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হও।

(১৬) সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বব্যাপারে স্ত্রীলোকদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মানযোগ্য দূরত্বকে নজরে রাখিয়া আয়ত্ত রাখিও।

(১৭) প্রত্যেকের বিশেষতঃ যজমানদের সমস্ত আপদবিপদে আশা, ভরসা এবং বাস্তব সাহায্যে যাহাতে তাহারা বিধ্বস্তি ও বাধাবিপত্তিকে অনায়াসে এড়াইয়া জীবন ও বৃদ্ধির আনন্দে উদ্দীপ্ত থাকে এবম্প্রকার সেবার জন্য সবসময় তৎপর থাকিও।

(১৮) যদি তুমি মানুষের আচার-ব্যবহার, আলোচনার ভিতর-দিয়ে তার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে এমনতর রকমে এনে ফেলতে পার, যাতে সর্ব্বতোভাবে তোমার ইষ্টানুকূল যা'-কিছু, তাকে সমর্থন না-করাই তার নিজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, আহাম্মকী ও পারিপার্শ্বিকের নিকট বিদ্রূপাত্মক হ'য়েই ওঠে, আর কোন দিক্-দিয়েই রেহাই থাকে না, তার নিজেরই কর্ম্ম নিজেকে শত ধিক্কারে পদদলিত, নিষ্পেষিত ক'রে চলতে থাকে,—সেই হ'চ্ছে প্রকৃতপক্ষে যাজনের মোক্ষম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেষণ।

ছোরাখেলা, যুযুৎসু, মুষ্টিযুদ্ধ, সাইকেল চড়া, মোটর চালান, ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, একক্রমে বহু মাইল হাঁটা, বহুক্ষণ পরিশ্রম করা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শীত-আতপ ইত্যাদি সহ্য করতে অভ্যস্ত হওয়া ইত্যাদি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধিও চাই। সব রকম প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'য়ে তাকে শুভাবহ ক'রে তুলতে গেলে যে-প্রস্তুতির প্রয়োজন, আমাদের অনেকেরই সেই প্রস্তুতি নেই। তোমরা ঋত্বিক্‌রা যদি সেইভাবে প্রস্তুত হও, তোমাদের দেখে মানুষ ঢের উপকৃত হবে। তোমাদের হওয়া চাই—জীবনের প্রতীক, বীর্য্যের প্রতীক, অভ্যুদয়ের প্রতীক, কল্যাণের প্রতীক, সংহতির প্রতীক, শান্তির প্রতীক, অমৃতের প্রতীক।……চারিদিকের অবস্থা অত্যন্ত ঘোরাল, কিন্তু এই ঘোরাল অবস্থা দেখেই আমার আবার আশা হয়, তোমাদের বড় হবার পরম সুযোগ সমুপস্থিত আজ। কারণ, দেশকে বাঁচাতে গেলে এর সমাধান করতেই হবে তোমাদের, আর এর সমাধান করা মানে, বিরাট শক্তি ও সামঞ্জস্যের অধিকারী হওয়া।

নরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের তরফ থেকে কী করা পরমপিতার অভিপ্রেত তা' কী ক'রে বুঝব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা মঙ্গলস্বরূপ, জীবনস্বরূপ। সপরিবেশ যাতে মঙ্গলের পথে চ'লে জীবনে উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারি ; প্রবৃত্তির পথে চ'লে যাতে অকল্যাণকে ডেকে না-আনি ; নিজেদের ভিতর প্রেম, প্রীতি, সেবা ও সংহতি যাতে বাড়ে ; বিরোধ ও বিচ্ছেদ যাতে ঠাঁই না-পায়,—তাই-ই পরমপিতার অভিপ্রেত ব'লে ধ'রে নিতে পারেন। ভাল করা চাই। ভাল হওয়া চাই। সুখ, শান্তি ও তৃপ্তি বেড়ে ওঠা চাই। অবনতির পথ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে যাওয়া চাই। আর, উন্নতির পথে প্রশস্ত হ'য়ে চলা চাই। নিজেদের চেষ্টায় এটা করতে হবে। বিনাশের বীজ ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে চারিদিকে, তাকে খতম ক'রে অমৃতের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নৈরাশ্য বা নেতিবাচক চিন্তা বা বাক্যের প্রশ্রয় দেওয়া ভাল না,—ওতে nerve (স্নায়ু) ঢিলে হ'য়ে যায়। জীবনই যখন সাধ্য ও কাম্য, তখন অযথা তার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে যাই কেন ? অবাঞ্ছনীয় বহু-কিছু আমরা পাই। তার কারণ আমার মনে হয়, অসতর্ক মুহূর্ত্তে, দুর্ব্বলতা ও অবসাদের বশে আমরা সেগুলি হয়তো আমাদের অজ্ঞাতসারে চেয়ে বসি, এবং যাতে ঐগুলির প্রাপ্তি ঘটে, তেমনতর চলনায় চলি। ভালমন্দ যা'-কিছু আমরা পাই, তা' সাধনা ক'রেই পাই।

নরেনদা—কেউই তো চায় না তার খারাপ হোক, কিন্তু তবুও খারাপ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ মুখে বলে যে সে খারাপ চায় না, কিন্তু তার কাজ দেখে বোঝা

যায় সে খারাপ চায় কি না। যে খারাপ চায় না, তার লক্ষণ হ'ল—সে বাস্তবে উৎসমুখী চলনে চলে,—পিতা, মাতা, ও গুরুর আনন্দবিধানই তার কাছে বড় হ'য়ে ওঠে। তার আর-একটা পরখ হ'ল—পরিবেশের ভাল করবার প্রবৃত্তি। অনেকে পরিবেশের ক্ষতি ক'রে নিজেদের ভাল করতে চায়, তার মানে তারা নিজেদের ভাল চায় না। কারণ, কারও ক্ষতি করতে গেলে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই হবে। নিজের ক্ষতি না-ক'রে অন্যের ক্ষতি করা যায় না। সবার জীবন এক-সুতোয় গাঁথা। অপরের ভাল-করা ছাড়া নিজের ভাল হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা অজ্ঞ। তাই, নিজেদের ভাল চাইলেও চলি এমনভাবে যাতে খারাপটাই এসে পড়ে।

কালীদা (মিত্র)—এ অজ্ঞতা যাবে কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত আমরা উৎসমুখী হব, ইষ্টনিষ্ঠ হব—সক্রিয় তৎপরতায়, ততই অজ্ঞতা বিদায় নেবে। তাঁর প্রতি ভক্তি, ভালবাসা যত বাড়বে, ততই তা' ছড়িয়ে পড়বে যা'-কিছুর উপর। পোকাটাকেও মনে হবে পরমাত্মীয়। প্রতিটি সত্তার যাতে সুখ হয়, সন্তোষ হয়, সংবৃদ্ধি হয় তার জন্য জান-প্রাণ ঢেলে করতে ইচ্ছে যাবে। এই যে ইষ্টানুগ আগ্রহবিধুর সেবাসন্দীপনী নন্দনমুখর চলনা—তা' নিজের স্বার্থের মধ্যে সবার স্বার্থের এবং সবার স্বার্থের মধ্যে নিজের স্বার্থের সমাবেশ দেখতে পায়। এই দৃষ্টি হ'ল প্রেমের দৃষ্টি। আর, প্রেমের দৃষ্টি যেখানে, জ্ঞানের দৃষ্টিও সেখানে।

কালীদা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই দৃষ্টি আমাদের খুলে যায় !

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কি ! আমি তো এই জন্য লালায়িত হ'য়ে আছি। তবে, এটা শুধু philosophically (দার্শনিকভাবে) ও intellectually (বুদ্ধি-গতভাবে) বুঝলে হবে না। দৈনন্দিন চলনার ভিতর এই বুঝের পরিচয় দিতে হবে যথাসম্ভব। ইষ্টের প্রীত্যর্থে প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত ইষ্টপুরুষকে সেবা-পূজায় পরিতৃপ্ত করবার আকুল ধান্ধা নিয়ে চলতে হবে বাস্তবে। এতে ইষ্টানুরাগ ও লোক-প্রীতি দুই-ই ফন্ ফন্ ক'রে বেড়ে উঠবে। একটু কর, সোনা ! একটু কর। নিজেকে করার স্রোতে ফেলে দিলে দেখতে পাবে—ঐ পথ বেয়ে পরমপিতার দয়া বন্যার মত নেমে আসছে।

কালীদা—আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ কেমন হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'এক তরী করে পারাপার'। Love (প্রেম)-ই হ'ল সব-কিছুর basis (ভিত্তি)। দেশে যত মানুষ, যত দল বা যত সম্প্রদায়ই থাক্-না-কেন, তারা কোন-একজনকে ভালবেসে পরস্পর স্বার্থান্বিত হওয়া চাই। তবে বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন

ক'রে সব এক ছাঁচে ঢেলে মিল করার বুদ্ধি ভাল না। তাতে কেউ কিছু দিতেও পারবে না, নিতেও পারবে না, বরং নষ্ট পাবে। দিতে ও নিতে পারে সেই—যার নিজস্ব কিছু আছে। যার ব্যক্তিত্ব নেই, বৈশিষ্ট্য নেই, সে দেবেই বা কী, আর নেবেই বা কী? সে তো জড়পিণ্ডের মত কেবল অন্যের দ্বারা utilized (ব্যবহৃত) হবে। তাই, বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণের প্রতি রাষ্ট্রের বিশেষ নজর দিতে হবে। শুভ বৈশিষ্ট্য-গুলি যদি পরিপুষ্ট হয়, তাহ'লে পারস্পরিক আদান-প্রদানে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্ব্ববিধ অভাব ও প্রয়োজনই পরিপূরিত হবে। তাই, রাষ্ট্রের বিশেষ লক্ষ্য থাকা উচিত বিবাহ ও বর্ণাশ্রমের উপর। বর্ণাশ্রমের প্রধান কথা হ'চ্ছে—জন্মগত সংস্কারানুপাতিক শিক্ষা, যোগ্যতা ও জীবিকা অর্জ্জন। বাস্তব অভিজ্ঞতাই বল, আর বিজ্ঞানই বল—সব দিক্ দিয়েই এটা সমর্থনযোগ্য। যার ঝোঁক যে-দিকে, সে যে সেই দিকেই ভাল করবে, এ-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে? 'বর্ণ' মানে আমি বুঝি, অন্তর-অনুরঞ্জনী স্বতঃ সুক্রিয় আবেগ, আব, এই আবেগ-অনুযায়ী সত্তা-সংস্থিতও হয় তদনুগ। আর, সবার মধ্যে একপ্রাণতা যাতে গজিয়ে ওঠে, সেই জন্য চাই adherence to one Common Ideal (একই আদর্শের প্রতি অনুরাগ)। ঐ Ideal (আদর্শ) আবার এমন হওয়া চাই, যাঁর ভিতর-দিয়ে জাতির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি পরিপূরিত হয়, ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বৈশিষ্ট্য স্ফূর্ত্তি লাভ করে। রাষ্ট্রের সব সময় লক্ষ্য থাকবে, যাতে সৎ-এর প্রবর্দ্ধন ও অসৎ-এর নিরোধ ও নিরাকরণ হয়। এইভাবে আমরা নিজেরা যদি ঐক্যবদ্ধ, দক্ষ ও শক্তিমান্ হ'য়ে দাঁড়াতে পারি, তাহ'লে অপরের বশ্যতামুক্ত হ'তে দেরি লাগবে না। আমাদের সামর্থ্যই আমাদের স্বাধীন ক'রে দেবে। স্বাধীন হ'লে আমাদের লক্ষ্য থাকবে, পৃথিবীর অন্য সব দেশকে, অন্য সব জাতিকে বাঁচাবাড়ার পথে কতখানি সাহায্য করতে পারি। কারণ, কোন দেশ বা কোন জাতি যদি দুর্ব্বল থাকে বা পিছিয়ে পড়ে, তার প্রতিক্রিয়ায় শেষপর্য্যন্ত আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে বাধ্য। তাই, মানুষের উন্নতিকল্পে সারা জগতে যাজন করতে হবে, অর্থাৎ ধর্ম্মদান করতে হবে—কারও ভাবে ব্যাঘাত না-ক'রে, বরং প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্যকে পরিপূরণ ক'রে। এতে সারা জগতের সঙ্গে বান্ধব-সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। এবং জগৎও বুঝবে যে ভারতের সত্যই কিছু দেবার আছে। আমি বিশ্বাস করি—এদিন আসছে সামনে। তোমরা দাঁড়াতে পারলেই হয়।

নগেন-দা (সেন)—চলার পথে মাঝে-মাঝে অবসাদ আসে, তখন যেন কিছুই ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-রকম সবারই হয়, আবার কেটে যায়। তবে কেন, কিসের থেকে

ঐ ভাবটার সূত্রপাত হ'ল—ভেবে দেখা মন্দ না। অনেক সময় শুধু চিন্তা-বিলাসিতা নিয়ে থাকার ফলে ঐরকম হয়। ভাবা আছে করা নেই, তা' থেকে মনের স্বস্থতা নষ্ট হ'য়ে যায়। একঘেয়ে রকমে চলতে নেই, তাতে উল্লাস থাকে না। আর, যাজনটা নিত্যসহচর ক'রে রাখতে হয় জীবনের। অবসাদ নিয়েও যাজন করতে সুরু করলে দেখা যায়—যাজন করতে-করতে ধীরে ধীরে মন চাঙ্গা হ'য়ে ওঠে। বিবেক-বিরুদ্ধ চলনেও চলতে নেই, ওতেও মন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। বিবেকিতার প্রথম লক্ষণ হ'ল—নিজের প্রতি যেমনতর আচরণ পছন্দ না-কর, অন্যের প্রতি তেমনতর আচরণ না-করা। যেটা অসৎ বা অন্যায় ব'লে জান, তা' কখনও প্রশ্রয় দেবে না। পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধ সংঘাতেও কখনও-কখনও মন নিস্তেজ হ'য়ে পড়তে চায়। সেখানে ভেবে দেখতে হয়, নিজের দোষ কতখানি। নিজের দোষ থাকলে তা' ঠিক করতে হয়। আর, যদি দেখা যায় যে নিজের দোষ বিশেষ নেই, অন্যপক্ষ অযথা আঘাত দিয়েছে, তখন রাগ বা অভিমান না-ক'রে, তার সম্বন্ধে সহানুভূতির সঙ্গে ভাবতে হয় যে, সে বোধহয় ঝোঁকের মাথায় এ-রকম বলেছে বা করেছে। এইভাবে মাথাটাকে ভারমুক্ত ক'রে ফেলতে হয়। মনটাকে ব্যথিত হ'য়ে থাকতে দিলে তৎকালীন মানসিক কষ্ট তো আছেই, তাছাড়া অন্যের দোষের ধ্যান মাথায় লেগে থাকলে নিজের অজ্ঞাতসারে ঐ দোষ চরিত্রে বাসা বাঁধে, তার সঙ্গে বা অপরের সঙ্গে অজানিতে ঐ রকম আচরণ এসে পড়ে। আবার, পরমপিতার ও পরিবেশের দয়া ও ক্ষমা আমরা কিন্তু সর্ব্বদাই আশা করি; আমরা যদি পরিবেশের দোষ অন্তরের সঙ্গে ক্ষমা না-করি, তাহ'লে তা' পাব কি ক'রে? যদি কখনও শারীরিক কারণে মন খারাপ হয়; তখন ঔষধ, খাদ্য, ব্যায়াম, খেলাধুলো ইত্যাদির সাহায্যে মনের পরিবর্ত্তন করা যায়। মন যখন অবসাদগ্রস্ত হয়, তখন একাকী নিষ্কর্ম্মা অবস্থায় থাকতে নেই। অন্ততঃ, এমন কোন জায়গায় যেয়ে গল্পগুজব করাও ভাল, যাতে মনটা অন্যমনস্ক ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হ'য়ে ওঠে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থচিন্তায় বিব্রত হ'লে মন ভারাক্রান্ত ও অবসন্ন হবেই। অন্যথা নিযুক্ত হওয়াই তখন একমাত্র প্রতিকার। এইসব নানা কারণ ঘটে। তাই, বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয়, এবং যে-অবস্থায় যা' করণীয় তা' করতে হয়।

১৮ই পৌষ, সোমবার, ১৩৫০ (ইং ৩।১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। কাছে ভক্তবৃন্দ উপস্থিত। তিনি পরম আপনজনের মত সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে কথাবার্ত্তা বলছেন।

একটি মাকে বললেন—তোকে কেমন যেন মনমরা মতন মনে হ'চ্ছে, শরীর ভাল

আছে তো?

মা'টি বললেন—শরীর ভালই আছে। তবে সংসারে শান্তিতে থাকার জো নাই। সব সময় মনের উপর ঘা খেতে থাকলে কত সহ্য করা যায়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলেছিস খুব ঠিক কথা। কিন্তু মনে-মনে একটা জিদ যদি করিস যে যত খারাপ ব্যবহারই তোর উপর হোক, তুই তা' হজম ক'রে নিবি, আর শুধু হজম করা নয়, এমন ব্যবহার করবি, যাতে অন্যের মনে অনুতাপ আসে ও তার পরিবর্ত্তন হয়, তাহ'লে কিন্তু এই কণ্টকময় অবস্থাটাই তোর ও তার উভয়ের মঙ্গলের কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়।

উক্ত মা—আমি অনেক ভাল ব্যবহার ক'রে দেখেছি, তাঁর পরিবর্ত্তন হবার নয়। যত ভাল ব্যবহার করা যায়, ততই দুর্ব্যবহার করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ-সম্বন্ধে নিরাশ হ'লে কি চলে? অনেক সহ্য লাগে, অনেক ধৈর্য্য লাগে, কার মনে কোন্ সময় পরিবর্ত্তন আসে তার কি ঠিক আছে? আর, তার যদি পরিবর্ত্তন না-ও হয়, তুমি যদি আজীবন এই চেষ্টা ক'রে যাও, তাহ'লে তাতে তোমায় অন্ততঃ লাভ। ভিতরে গরম রেখে বাইরে শুধু লোক-দেখান ভাল ব্যবহার করলে হবে না। নিজেকে তার অবস্থায় ফেলে ভেবে দেখতে হবে, কেন সে এমন করে। তাতে একটা সহানুভূতি আসবে, মমতা আসবে, তাতে হজম করার শক্তি পাবে। কাজটা খুব শক্ত, কিন্তু মন তৈরী ক'রে নিলে এর মধ্যেই আবার আমোদ পাওয়া যায়। ভেবেই নিবি যে সে তোকে অকথা-কুকথা ক'বে, গালি দেবে। তা' যতই দিক না, তুই মনকে দুঃখিত বা উত্তেজিত হ'তে দিবি না। বরং বুদ্ধি আঁটবি—কি ক'রে তার রাগটাকে জল ক'রে দিতে পারিস। সে যত গরম হবে, তুই ততই নরম ও মিষ্টি হ'বি। গালটা যেন গাল নয়, মধুবর্ষণ—এমনতর ভাব। এইরকম যদি কিছুদিন করতে পারিস, তাহ'লে দেখবি—সে নিজেই নিজের আচরণে লজ্জিত ও দুঃখিত হবে।

মা'টি হতভম্বের মত তাকিয়ে রইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—তুই ঘাবড়াস ক্যান্? আমরা যেমন পছন্দ করি তেমন না-পেতে পারি, এবং যা' পছন্দ করি না তা' পেতে পারি, কিন্তু সেই অবাঞ্ছনীয় অবস্থার মধ্যে প'ড়ে তা' সইতে, বইতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে নিজেদের এমনতর গুণের অধিকারী ক'রে তুলতে পারি, যার ফলে জীবনটা একটা অভাবনীয় সার্থকতা খুঁজে পেতে পারে। যেভাবে বললাম, ঐভাবে যদি চলতে পারিস, তা'হলে দেখবি, আজকের দুঃখ, অশান্তি কত ক'মে যাবে, আর অন্তরের সম্পদ্ কতখানি বেড়ে যাবে। দুঃখই পরমপিতার আশীর্ব্বাদ হ'য়ে উঠতে পারে, যদি আমরা তাকে তা'

ক'রে নিতে জানি। কোন মানুষ বেকায়দার মধ্যে পড়লে আমি দেখি—সে কী করে। যাদের ভিতরে মাল আছে, তাদের প্রায়ই দেখা যায়—তারা ওর ভিতর-দিয়ে লাভবান্ হয়। রাজসাহীর মধু ক্ষ্যাপা ছিল, সে হাতের উপর একটা চাল রেখে বলত, দুনিয়াটা একটা চাল। পরিস্থিতি যেমনই থাক্-না-কেন, নিজের চাল-চলন ঠিক ক'রে নিতে পারলে সুখের কিন্তু অভাব নেই দুনিয়ায়। মনটাকে যেভাবে রাজী করান যায়, সেইভাবে রাজী হ'তে অভ্যস্ত হয়; যে-রঙে রাঙান যায়, সে-রঙেই রঙীন হ'য়ে ওঠে; যে-খাতে বইয়ে দেওয়া যায়, সেই-খাতেই ব'য়ে চলে—এই যা' ভরসা মানুষের। তাই, চলতে জানলে অনেক অবস্থার প্রতিকার হয়। আর, যার প্রতিকার হবার নয়, তাও স্বচ্ছন্দে হজম ক'রে নেওয়া যায়।

মা'টি বললেন—আপনি যখন বলেন, তখন তো মনে হয়—এইভাবে চলব। কিন্তু অবস্থার মধ্যে পড়লে তো আর পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল ক'রে নামধ্যান করতে হয়। তাতে চলনা সজাগ হয়। আর, জোর ক'রে এই অভ্যাস করতে হয়।

বীরভূমের হরেনদা (সাহা) বললেন—বাবা, আমাদের জেলায় বড় জলকষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা স্বস্তি-সেবক সংগ্রহ ক'রে খাল-বিল-পুষ্করিণী সংস্কার, tubewell (নলকূপ) পোতা ইত্যাদি কাজ যদি কর, তাহ'লে এর প্রতিকার হ'তে পারে। যে-কাজই করতে চাও, দীক্ষিতের সংখ্যা খুবই বাড়ান লাগে। দেশে জনসংখ্যা যতই থাক্-না-কেন, তা' দিয়ে কিন্তু জনবল হয় না—যদি তারা কোন আদর্শে সংহত না-হয়। জনবল তখনই হয়, যখনই পারস্পরিকতা গজায়। আর, পারস্পরিকতা গজায় একাদর্শপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে।

যামিনীদা (রায়চৌধুরী)—অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, দেশের দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা দূর করবার জন্য আপনারা কী করছেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা কী বলতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা যা' করছ, তাই তোমরা বলবে। আমি সারাজীবন দেখলাম—মানুষকে বাইরে থেকে দিয়ে বিশেষ কিছু করা যায় না। সব চাইতে বড় জিনিস হ'ল adjustment of character (চারিত্রিক নিয়ন্ত্রণ)। যে-চিন্তা, চলা, বলা ও করার ভিতর-দিয়ে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা ঘুচে যায়—সেই চিন্তা, চলা, বলা ও করায় তাকে অভ্যস্ত ক'রে তোলা। তোমরা যে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নী, সদাচার ইত্যাদি নিজেরা পালন করছ ও অন্যকে দিয়ে করাচ্ছ, এতে শুধু দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা কেন, বহু সমস্যারই সমাধান হবে। শুধু mechanically (যান্ত্রিকভাবে)

করলে হবে না, volitional urge (ইচ্ছাপূর্ণ আকুতি) গজিয়ে দিতে হবে। ইষ্টের ও ইষ্টার্থে পরিবেশের তোষণ, পোষণ ও সেবার জন্য যদি কোন মানুষ প্রকৃতই আগ্রহান্বিত হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে সে যে কোন্ দিক-দিয়ে পথ বের ক'রে কী ক'রে ফেলে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রত্যেকটা মানুষের কিছু-না-কিছু জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ্ থাকেই। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধি প্রবল হ'য়ে উঠলে ঐ বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ্ ইষ্টানুগ সেবায় সার্থক ক'রে তোলার বুদ্ধি ক'মে যায়, মোটপর auto-initiative serving zeal (স্বতঃপ্রবৃত্ত সেবার উৎসাহ) নিভে আসে। তাতে মানুষ idle (অলস) হয়, inefficient (অযোগ্য) হয়, dull (বোকা) হ'য়ে ওঠে, inquisitive observation (অনুসন্ধিৎসু পর্য্যবেক্ষণ)-ও ক'মে যায়, মানুষের কদর বোঝে না, মানুষকে আপন করতে পারে না। আর, এইগুলিই হ'ল দারিদ্র্য, বেকার-সমস্যা ইত্যাদির মূল। কিন্তু ইষ্টানুগ সেবাবুদ্ধি কোনভাবে যদি চরিত্রের মধ্যে মাথাতোলা দিয়ে ওঠে, তাহ'লে সে সব সময় তালে থাকে যাতে তাকে-দিয়ে মানুষের সুখ-সুবিধা বেড়ে যায়। পয়সার ধান্ধা, পেটের ধান্ধা বাদ দিয়ে ঐ ধান্ধায় চলতে-চলতে, করতে-করতে, মানুষ তার প্রকৃতিগত কর্ম্ম ও বৃত্তি চিনে নিয়ে সেই ভাবে আত্মনিয়োগ ক'রে কৃতকার্য্য হ'তে পারে। সেবার লওয়াজিমা বাড়াতে হবে, আর মাথা খাটিয়ে অতন্দ্র-ভাবে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। পয়সা আসুক বা না-আসুক, মানুষের সেবা করার সুযোগ কখনও ছাড়তে নেই, কখনও নিষ্কর্ম্মা থাকতে নেই। ব'সে থাকার চেয়ে বেগার খাটা ভাল। নেশা থাকবে মানুষকে উপচয়ী ক'রে তোলা—তা' যেভাবে যতখানি পারা যায়। প্রকৃত যাজনবুদ্ধি যাকে বলে তা' প্রত্যেকের মজ্জাগত ক'রে দিতে হবে। নিজের স্বার্থ বলতেই যেন সে বোঝে—পরিবেশের সত্তাসংগত স্বার্থ ; আর, তার জন্য তার সাধ্যমত করতে যেন ত্রুটি না-করে। এতে চরিত্র উপার্জ্জন হয়, মানুষ উপার্জ্জন হয়, অর্থ উপার্জ্জন হয়—সব উপার্জ্জন একসঙ্গে হয়। এইভাবে economic problem-এর (অর্থনৈতিক সমস্যার) সমাধান না-করলে মানুষের উদ্ভাবনী বুদ্ধি বাড়বে না। দেশের মানুষ গোলামী করা ছাড়া স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের পথ পাবে না।

যামিনীদা—রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা যদি সহায়ক না-হয়, তাহ'লে ব্যক্তিবিশেষ যতই সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হোক-না-কেন, তার কিছু করা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার ফল আছেই, আর, তোমরা এখন আর ২।৪ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নও। তোমরা লাখো-লাখো আছ, ক্রমাগত এতগুলি লোক মিলে যদি মূল কথাগুলি পালন করতে থাক ও চারাতে থাক, তাহ'লে হাওয়া বদলে যাবে।

সুলতান-সাহেবের চাটাইয়ের মত সারা দেশ ছেয়ে যাওয়াও অসম্ভব না। ভক্তি, বিশ্বাস, আবেগ ও চরিত্র নিয়ে মানুষের দোরে-দোরে যাও, বার-বার সবাইকে শোনাও, নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম ও বিশ্রামের কথা ভুলে যাও। বৃহত্তর পরিবেশের মঙ্গল-বিধান না-করতে পারা পর্য্যন্ত তুমি নিজেই যে মহাবিপন্ন—এ-কথাটা কখনও ভুলে যেও না। বিপদ্ তোমারই, দায় তোমারই। যারা বোঝে না, জানে না, খতায় না, তারা তো ঠাওর পায় না, কোথায় চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ইন্দুদাকে (বসু) বললেন—একটা কথা মনে থাকতে-থাকতে তোকে ব'লে রাখি—আজকাল বাইরের অনেক রোগীপত্তর চিকিৎসার সাহায্যের জন্য আসে। সব ওষুধ বিনাপয়সায় দেওয়া তো কঠিন কথা। তাই বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইম্যুনিটি, বি. কে. পাল, এম. ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি নানা কোম্পানীকে ধ'রে যদি কতকগুলি ওষুধ জোগাড় ক'রে পাঠাতে পারিস, তাহ'লে কিন্তু ভাল হয়।

ইন্দুদা—আমার তো জানাশুনো নেই। যাহোক চেষ্টা করব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানাশুনো ক'রে নিলেই জানাশুনো হ'য়ে যাবে। পরমপিতা সারা জগৎটাই আমাদের সামনে রেখে দিয়েছেন। বান্ধবোচিত সদ্ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে আমরা যত লোককে বন্ধু ক'রে তুলতে পারব, ততই আমাদের asset (সম্পদ্) বেড়ে যাবে। পরমপিতার দয়ায় জীবনের পথ, বৃদ্ধির পথ এন্তার খোলা আমাদের সামনে। শুধু বিধিমাফিক ক'রে গেলেই হ'ল। ভাবনার কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। প্রতিটি কথার ভিতর-দিয়ে ঠিকরে পড়ছে আশা, ভরসা, উদ্দীপনার অনির্ব্বাণ অনলজ্যোতি।

সুশীলদা (বসু)—দেশের দিকে, জগতের দিকে তাকালে মনে হয় ধর্ম্ম, ইষ্ট ও সত্তাপোষণী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্থান যেন এখানে অতি সংকীর্ণ। সর্ব্বত্র বিপরীত চলন। এত বড় বিপুল বিরুদ্ধ-পরিবেশের মধ্যে আমরা মুষ্টিমেয় লোক কতদিনে কতটুকু করতে পারব, ভেবে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, প্রবৃত্তিমূলক কোন আন্দোলন হ'লে তা' যত শীঘ্র প্রসার লাভ করে, প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণমূলক কোন আন্দোলন কিন্তু তত শীঘ্র প্রসার লাভ করতে চায় না। মানুষ একে এড়িয়ে থাকতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দই পাতে দেখেছেন তো! এক হাঁড়ি দুধের মধ্যে হয়তো এতটুকু (হাত-দিয়ে দেখালেন) দম্বল দেয়, আর তাতেই গোটা হাঁড়ির দুধটা দই হ'য়ে যায়। এ হয় কিন্তু ঐ দম্বল ও দুধের সংযোগে। দম্বলের ভিতর এমন শক্তি থাকে, যা' দুধকে দইতে পরিণত করতে পারে, আর দুধের ভিতর এমন property (উপাদান)

থাকে, যা' দইয়ের দম্বলের সংস্পর্শে দই হ'য়ে উঠতে পারে। জলের ভিতর দম্বল দিলে তাতে কিন্তু দই হয় না, আর দম্বল যদি ঠিক ও মাত্রামত না-হয়, তাহলে কিন্তু ভাল দুধেও উপযুক্ত সময়ে ভাল দই বসে না। অবশ্য, যে-পাত্রে দই বসাতে হবে, সে-পাত্রও ঠিক থাকা চাই। ঋত্বিক্‌রা হ'ল ঐ দম্বল। তাদের চরিত্র সর্ব্বতোভাবে ইষ্টানুগ হওয়া চাই। তারা যতখানি ইষ্টানুগ চরিত্রের হবে, শ্রদ্ধাবান্‌ ও শুভ-সংস্কারসম্পন্ন লোকগুলি তাদের সান্নিধ্যে এসে তাদের সাহচর্য্য ও যাজনে আবার ততখানি ইষ্টমুখী হ'য়ে ওঠার প্রেরণা পাবে। এইভাবে কিছুসংখ্যক ইষ্টপ্রাণ ও চরিত্রবান্‌ ঋত্বিকের ঘোরাফেরা ও প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে যে বহুলোক অচিরেই প্রভাবান্বিত হ'তে পারে, সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যাদের জন্মগত শুভ-সংস্কার নেই, তাদের দেরি হ'তে পারে, কিন্তু হবে না এমন কথা নয়। কারণ, মানুষ যতই প্রবৃত্তির পথে চলুক, সে কিন্তু মরতে চায় না, বেঁচে থাকতে চায়। তাই বাঁচার তাগিদে দায়-ঠেকে হ'লেও কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অবশ্য, তাদের মাথায় যেমন ক'রে ধরে, তেমন ক'রে তাদের বোঝান চাই। মানুষ যে ভুল করে, অন্যায় করে, তার প্রধান কারণ হ'ল অজ্ঞতা। মানুষের সত্তার ভিতর যদি এই বোধটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে সে অজ্ঞতাবশে নিজের কী সর্ব্বনাশ করছে, নিজের উপর কী দুঃখ ডেকে নিয়ে আসছে, তাহ'লে আত্মরক্ষার তাগিদে খানিকটা সাবধান না হ'য়ে পারে না।

সুশীলদা—মানুষ জেনেশুনেও যে ভুল করে। তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে ভাল ক'রে জানে না। দ্বিতীয় কারণ হ'ল—অভ্যাসের দাসত্ব। তাই, সদ্‌গুরুর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিতে হয়, আর, সদভ্যাসের অনুশীলনে ব্যাপৃত যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করতে হয়। এ-ছাড়া কোন পথ নেই। আবার, ইষ্টানুগ চলন আপনার কাছে যত উপভোগ্য, আনন্দদায়ক ও রসাল হ'য়ে উঠবে, এক-কথায় স্বভাবগত হ'য়ে উঠবে, ততই কিন্তু তা' আপনার ভেতর থেকে অন্যের ভেতর চারিয়ে যাবে। ভক্তিমান্‌ লোকের সঙ্গ-সাহচর্য্যে তাই মানুষ যা' উপকৃত হয়, তার তুলনা হয় না। তার স্পর্শে মানুষের সুপ্ত সদ্‌বৃত্তিগুলি জেগে ওঠার সুযোগ পায়। মানুষের সদ্‌বৃত্তি জাগাতে হবে ও তাকেই শক্তিমান্‌ ক'রে তুলতে হবে। একেই বলে ধর্ম্মের সঞ্চারণা।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে বললেন—কেষ্টদা তপোবন আবার ভাল-ক'রে গ'ড়ে তুলতে চাচ্ছে, ভাল মাষ্টার যোগাড় ক'রে দিতে পারিস নাকি চেষ্টা ক'রে দেখিস। কয়েকজন জোগাড় হয়েছে, আর ক'জন দরকার আছে শুনে যাস।

দাদাটি বললেন—আচ্ছা !

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চুনী ! আমাকে একটা ভাল কলম কিনে দিবি নাকি ? (কাউকে দিতে চান) ।

চুনীদা (রায়চৌধুরী—হ্যাঁ ! কী কলম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেফার্স । কলমটা তোর মত সুন্দর হওয়া চাই ! গড়ন, পেটন, লেখন কোন দিক্ দিয়ে কোন খুঁত থাকবে না ।

চুনীদা হেসে বললেন—কলকাতা গিয়ে ব্যবস্থা করব ।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—এইবার টিকে দেবার যোগাড়যন্ত্র কর । কলকাতার ওরা থাকতে-থাকতে ওদের কাছে লিম্প পাঠাবার কথা ব'লে দাও ।

প্যারীদা (নন্দী)—প্রত্যেকবার সাধারণতঃ জানুয়ারী মাসের শেষের দিকে দেওয়া হয়, এখনও দেরি আছে ।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোমরা যেমন ক্ষিপ্রকর্ম্মা, তাতে এখন তোড়জোড় সুরু করলে জানুয়ারীর শেষাশেষি যেয়ে টিকে দিতে পারবে । এখন যদি দেরি আছে বলে ব'সে থাক, তাহ'লে আরও একমাস পিছিয়ে যাবে ।

প্যারীদা—না ! আমি আজই কলকাতার দাদাদের কাছে ব'লে দেব ।

হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত)—ঠাকুর ! আপনি বলেন, ধর্ম্ম থাকলে তার সঙ্গে অর্থ থাকেই । কিন্তু ধর্ম্মপথে চলে যারা, তাদেরই তো অর্থকষ্ট বেশি ক'রে পেতে হয় । এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাতারাতি কিছু হয় না । সবটারই একটা সময় আছে । ব্যবসা-বাণিজ্য যারা করে, তারাই কি একদিনে টাকার মালিক হয় ? তবে ধর্ম্মের ভেক নিয়ে চলা আর ধর্ম্ম-করা কিন্তু এক কথা নয় । ধর্ম্মজীবন মানে প্রচণ্ড কর্ম্মময় জীবন, আর সে-কর্ম্ম ধৃতিপোষণী কর্ম্ম, অস্তিত্বপোষণী কর্ম্ম—যা' পরিবেশকে উচ্ছল ক'রে তোলে । তাই, ধার্ম্মিক চলনে যে চলে, সে চা'ক বা না-চা'ক, মানুষের স্বতঃস্বেচ্ছ আবদান স্বতঃই সে পায় । কিন্তু এই পাওয়ার লোভে যে ধর্ম্ম করে, তার করাটাই perfect (নিখুঁত) হয় না, তাই পায়ও না ! আবার, ধর্ম্মাচরণ যার প্রকৃতিগত—বিশেষ কোন স্বার্থপর প্রত্যাশা-প্রণোদিত নয়, সে অভাবের ভিতর থাকলেও এ-কথা ভাবে না—ধর্ম্ম ক'রে আমার হ'ল কী ? সক্রিয় ধর্ম্মাচরণই তার পরম পরিতৃপ্তির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায় । লাখ ঐশ্বর্য্যের বিনিময়েও সে সেই আত্মপ্রসাদ ত্যাগ করতে চায় না ; আবার, শত দুঃখকষ্টও তাকে তার পথ থেকে টলাতে পারে না । সুখ বা দুঃখ কোনটাই তাকে তার আদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না । ধর্ম্মে এতখানি দৃঢ়-

প্রতিষ্ঠিত যে, অর্থের তোয়াক্কা সে কমই করে। অর্থই তার সেবা ক'রে ধন্য হয়। মানুষ যে অল্পেই বিচলিত হ'য়ে পড়ে, তার কারণ—বাস্তবভাবে ধর্ম্মের সেবায় সর্ব্বক্ষণ মত্ত-মসগুল হ'য়ে থাকে না। নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় ধর্ম্মনিরতির একটা পরম অবদান এই যে তা' অন্তরের উৎসাহ ও আনন্দকে মলিন হ'তে দেয় কমই। আরাম বা কষ্টের মধ্যে প'ড়ে ঐ নিরতি বা ব্যাপৃতি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে পড়লে তখনই আঁধার ঘনায়ে আসে। প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ কাউকে কখনও অসুখী বা অভাব-পীড়িত করতে পারে না। তবে, চলার পথে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি কী আছে, সেটা বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হয় ও আত্ম-সংশোধন ক'রে চলতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার দিকে চেয়ে বললেন—আজ দুপুরে খাওয়া বেশি হ'য়ে গেছে। খাওয়ার পাতে মিষ্টি থাকলি ওজন ঠিক থাকে না। এখন যেন জুত লাগতিছে না।

প্যারীদা—ও কিছু না। একটু ওষুধ খেলে এবং বেড়ালে টেড়ালে ঠিক হ'য়ে যাবে।

নিবারণদা (বাগচী)—আজকাল চোর, জোচ্চোর ও ঠগবাজ যারা তারা এমন নূতন-নূতন কৌশলে লোকের সর্ব্বনাশ করে যে লোক তাদের সন্দেহ করবার অবকাশ পায় না। যে-রকম অবস্থা, তাতে প্রত্যেককেই সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা লাগে। কিন্তু সেও তো একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। যারা নিজেরা অসৎ তারা বরং অন্যকে সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়। তাই, তারা বরং বেঁচে যায়। কিন্তু যারা সৎলোক, তারা স্বভাবতঃই অন্যকে নিজের মত সৎ মনে করে এবং সেইজন্যই প্রতারিত হয় বেশি। এমন অবস্থায় সৎ লোকদের আত্মরক্ষা করাই তো কঠিন!

শ্রীশ্রীঠাকুর সকৌতুকে নিবারণদার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—কথা যা' কইছ ভুল কওনি, কিন্তু এর মধ্যেও ফাঁক আছে। সৎ হওয়া বড় সোজা কথা নয়। অসৎ-এর কবলে যে প'ড়ে যায়, যে অসৎকে চিনতে পারে না, হজম করতে পারে না, অতিক্রম করতে পারে না, সে কিন্তু প্রকৃত সৎ কিনা সন্দেহের। সৎ যে হবে সে হবে বুদ্ধিমানের শিরোমণি; অসৎ-এর সৎমুখোশী জারিজুরি যা' তা' সে লহমায় ধ'রে ফেলবে, তার চোখ এড়াবে না। আর, অন্যকে সব সময় সন্দেহের চোখে দেখার কথা যা' বলছ, তার কোন দরকার করে না। দরকার হ'ল সর্ব্বদা alert (সতর্ক) থাকা ও keen observation (তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ) নিয়ে চলা। সন্দেহ-ঝোঁকা মন হ'লে judgment (বিচার) blundering (ভ্রান্তিপূর্ণ) হ'তে পারে, ভাল যে তাকেও সন্দেহ ক'রে তার ভালটা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু alert (সতর্ক)

হ'য়ে uncoloured observation (নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণ) নিয়ে চললে যেটা যা', তাকে তাই ব'লে ধরতে অসুবিধা হয় না।

শরৎদা (হালদার)—আমাদের মত মানুষের পক্ষে uncoloured observation (অরঞ্জিল পর্য্যবেক্ষণ) যে অসম্ভব ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতটা ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হবেন, ততটা uncoloured (অরঞ্জিল) থাকতে পারবেন। নইলে, বাস্তবতাকে না দেখে নিজের ধারণা-অনুযায়ী যা-কিছুকে দেখার দায় থেকে মুক্তি পাবেন না। আর, বাস্তবে যে বা যা' যেমনই হোক-না-কেন, তাকে সত্তাসম্বর্দ্ধনী ক'রে তুলতে গেলেও চাই ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্নতা। সমস্যা-সম্বন্ধে শুধু সচেতন হ'লে চলবে না, তার সমাধানও করতে হবে সঙ্গে-সঙ্গে। দোষ বা গলদের কথা নিয়ে যতই সমালোচনা করি না কেন, তাতে ফায়দা কিছু হবে না। অবস্থা আরো জটিল হবে। জীবনের খোরাক পাব না তা' থেকে। ওগুলি থেকে রেহাইয়ের পন্থা আবিষ্কার করতে হবে। আর, সেই রেহাইয়ের পন্থা হ'ল—সক্রিয়ভাবে ইষ্টনিদেশ পালন ক'রে চলা, বহন ক'রে চলা, মূর্ত্ত ক'রে তোলা। যাতে সবার ভিতর এই প্রবণতা জাগে, তার জন্য আড়েহাতে লাগতে হবে।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে ডাকতে বললেন। কেষ্টদা আসলে সবাইকে নিয়ে বেড়াতে বের হলেন।

২০শে পৌষ, বুধবার, ১৩৫০ (ইং ৫।১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। কলকাতা থেকে একটি দাদা কয়েকটি ওষুধ নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলি প্যারীদার কাছে রাখতে দিলেন। দিয়ে বললেন—যে-সব ওষুধ তোর কাছে রাখতে দিই, সেগুলি একটা খাতায় লিখে রাখিস, যাতে জিজ্ঞাসা করলেই খাতা দেখে তাড়াতাড়ি বলতে পারিস কি-কি ওষুধ তোর কাছে আছে। আবার ও-থেকে কোন ওষুধ যদি কাউকে দেওয়া হয়, তাও লিখে রাখিস।

প্যারীদা—অনেক সময় তাড়াতাড়িতে লিখতে ভুল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ সব বাজে কৈফিয়ৎ আমার কাছে দিবি না। ভাল অভ্যাস যা' করণীয়, তা' করবিই। নানারকম সদভ্যাস আয়ত্ত ক'রে শরীর-মনকে পরমপিতার সেবায় সুপটু যন্ত্রে পরিণত ক'রে ফেলতে হয়। মানুষের সীমায়িত জীবন অসীম কার্য্যকরী হ'য়ে উঠতে পারে সুষ্ঠু সদ্ব্যবহারের ফলে।

শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য)—মাঝে-মাঝে মনে হয়, এত ক'রে হবে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব করার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকবে প্রিয়পরমকে খুশি করা। পরিবেশের সেবা করব, তাও জানব, প্রতি ঘটে-ঘটে তিনি আছেন, আর সেই তাঁকেই নন্দিত করছি আমি। এই ভাবটা জাগলে করাটা তখন কসরতের ব্যাপার থাকে না, উপভোগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়। কাজের সঙ্গে-সঙ্গে চাই নাম, স্মরণ, মনন, অনুধ্যান। একটা প্রীতিমধুর-ভাবের অভিষেক যদি না থাকে অন্তরে, তাহ'লে রস পাওয়া যায় না। সেই জন্য ভাবমুখী হ'য়ে থাকতে হয়।

মণিদা (কর)—ভাবমুখী হ'য়ে থাকা মানে কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবমুখী হ'য়ে থাকা মানে হওয়া-মুখী হ'য়ে থাকা। চলায় কৃতার্থ হওয়ার সঙ্কেত যেগুলি' আছে, ওগুলি ভাল ক'রে অনুশীলন করতে হয়। যা' ভাব, ভক্তি ও অনুরাগকে পুষ্ট করে, তাকেই আমন্ত্রণ করতে হয়, আর যা' তাতে ব্যাঘাত জন্মায়, তাকে আমল দিতে নেই।

প্রফুল্ল—কেউ-কেউ বলেন, জগতে এক-ই আছেন, তাই বহুত্বের বোধ অজ্ঞানতা-প্রসূত। এ কথা কি ঠিক ?

---

* ১। তুমি যাই থাক না কেন, করায় আর বলায়, চলতে থাক ঠিক তেমনিতর চাল-চলন নিয়ে, যেন তুমি আপ্রাণ ও অটুটভাবে আদর্শপ্রাণ, আর ভাবও তুমি তাই —এতে যদি তুমি ভিতরে-ভিতরে আদর্শে ধর্ম্মপ্রেমোন্মাদ হ'য়ে পড়, তাতেও ক্ষতি নাই।

২। তোমার পারিপার্শ্বিকের কোন একেরই হউক বা বহুরই হউক, সহানুভূতি-সম্পন্ন মনোযোগ সহকারে ভাব ও চলন দেখে ঠিক ক'রে নিও, কি রকম ভঙ্গীতে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা ব্যবহার করিলে তাহার হৃদয়কে তোমার আদর্শে জয় করিতে পার,—তোমার সেবা তাহার প্রতি তেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াই চালাও।

৩। তোমার মনে কী আছে কিংবা মনে তুমি কেমনতর, তার প্রতি কোনরূপ খেয়াল না-ক'রে, যা' করণীয়—তেজ, উদ্যম ও নিরন্তরতাকে নিয়ে বিবেচনার সঙ্গে ক'রে যাও।

৪। এই করতে গেলে করার রাস্তায় দুটো বিপদ্ আসতে পারে—একটি go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি), আর একটি libido-র distortion (সুরতের বিকৃতি)। ঘাবড়ে যেও না, একটু নজর রেখো তাদের প্রতি, কৃতকার্য্যতা কৃতার্থতাকে নিয়ে তোমাকে সার্থকতায় সম্রাট ক'রে রাখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একও যেমন ঠিক, বহুও তেমনি ঠিক। তবে একেরই বহু, বহুর মধ্যে আছে এক। একের এই রকমারি প্রকাশের বৈশিষ্ট্য যদি না-ধরতে পার, তবে সেটাও অজ্ঞান। আবার, বহুত্বের ভিতরকার ঐক্য যদি না-ধরতে পার সেটাও অজ্ঞান। আলুর ভিতর মুলো আছে আবার মুলোর ভিতরও আলু আছে, কিন্তু আলুও মুলো নয়, বা মুলোও আলু নয়, আলুর একটা বিশিষ্ট যৌগিক সত্তা আছে যা' তাকে আলু ক'রে তুলেছে, মুলোর একটা বিশিষ্ট যৌগিক সত্তা আছে, যা' তাকে মুলো ক'রে তুলেছে। বিভিন্ন জিনিসের সাংগঠনিক সংস্থিতির পরিচয় না জেনে যদি তাদের এক ব'লে ছেড়ে দিই, তাহ'লে আমাদের জ্ঞান বাড়বে না অজ্ঞান বাড়বে, তা' ভাল ক'রে বুঝতে পারি না। বিজ্ঞান বাদ দিয়ে যে দার্শনিকতা তা' বিভ্রান্তিকেই আমন্ত্রণ ক'রে থাকে।

প্রমথদা (দে)—আপনি যত কথা বলেন, তার বেশির ভাগই কর্ত্তব্যের কথা, অধিকারের কথা তার ভিতর খুব কম। কিন্তু মানুষের অধিকারেরও তো একটা দিক্ আছে। কর্ত্তব্য করা সত্ত্বেও যদি কেউ তার অধিকারলাভে বঞ্চিত হয়, সেখানে কি তার ন্যায্য দাবী নিয়ে জোরের সংগে দাঁড়ান ভাল নয়? তা' যদি না দাঁড়াতে পারে, তাহ'লে সেটা কি তার পক্ষে দোষ নয়? অধিকার-প্রতিষ্ঠাও তো মানুষের একটা করণীয়!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, কর্ত্তব্য করতে পারলে অধিকার আপনা থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ওর জন্য লড়াপেটা করতে হয় না। করণীয় করাটা মানুষের নিজের হাতের মধ্যে। নিজের হাতের মধ্যে যেটা আছে, সেইটে যদি ভালভাবে করা যায়, তাহ'লে আমার প্রয়োজনীয় যা' অন্যের হাতের মধ্যে আছে, তা' আয়ত্ত হবার পথ সাধারণতঃ খুলে যায়। নিজের করণীয় সুষ্ঠুভাবে করা সত্ত্বেও অন্যে যেখানে অন্যায়, অবিচার ও বঞ্চনা করে, সেখানে তার বিহিত প্রতিকার যাতে হয়, তা' করাই ভাল। অন্যায়ের প্রতিকার যদি না করা যায়, তাতে যে শুধু নিজের ক্ষতি, তা' নয়, তাতে অন্যেরও ক্ষতি। সত্তা পরমপিতার সম্পদ্, তাকে ব্যাহত হ'তে দেবার অধিকার কারও নেই, তা' নিজেরই হোক বা অপরেরই হোক। যে অন্যায় করে, তার নিজের ভালর জন্যও তাকে সংশোধন করা দরকার। কারণ, ঐ অন্যায়ের যদি সংশোধন না হয়, তাহ'লে ঐ অন্যায়ই তাকে বিপন্ন ক'রে তুলবে। তা' হ'তে দেওয়া কি ঠিক? তাই, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমরা যেন আক্রোশ বা হিংসার বশীভূত হ'য়ে না পড়ি। 'স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা'—এই কথার থেকে আমার ভাল লাগে 'ধর্ম্মের' প্রতিষ্ঠা। ধর্ম্ম মানে তাই, যা' সপরিবেশ নিজের বাঁচাবাড়াকে ধ'রে রাখে। ধর্ম্মের জন্য যখন

আমি সংগ্রাম করি তখন নিছক আত্মস্বার্থের জন্য সংগ্রাম করি না, সবার স্বার্থের জন্য সংগ্রাম করি। এতে আবিলতা থেকে অনেকখানি মুক্ত থাকা যায়।

প্রমথদা—পৃথিবীর ইতিহাসে দেখতে পাওয়া যায়, মানুষ ধর্ম্মের নামেও যথেষ্ট অধর্ম্ম ক'রে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মের অর্থ কী, তা' বোধ হয় ভাল ক'রে বোঝে না, তাই, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করে। যারা অজ্ঞতার দরুন অন্যায় করে, সে অন্যায় একদিন হয়তো থামতে পারে। কিন্তু যারা বুঝে-সুঝেও ধর্ম্ম ও নীতির বুলি আউড়ে প্রবৃত্তির কণ্ডুয়ন চরিতার্থ করতে চায়, তাদের নিয়েই ভাবনার কথা। যারা জ্ঞান-পাপী, যারা নিজেকে ও অপরকে ফাঁকি দিয়েই সুখ পায়, তাদের একমাত্র শিক্ষক হ'ল কর্ম্মফল। একান্ত বেকায়দায় যখন পড়ে তখন বুঝতে পারে, নিজেদের কতখানি ক্ষতি করেছে। সব জিনিসের মত ধর্ম্মেরও যে বিকৃতি না আছে, তা' নয়। তার একমাত্র প্রতিকার হ'ল বাস্তব ধর্ম্মপ্রাণতা, বাস্তব ইষ্টপ্রাণতা। সব জটিলতা সরল হ'য়ে যায় ধর্ম্মের আচরণের ভিতর-দিয়ে। ধর্ম্মের সেই আচরণ দেখলে অন্যেও প্রবুদ্ধ হয়, উপকৃত হয়। মানুষ নিজের ভাল যতদিন চায়, ততদিন প্রকৃত ধর্ম্মের বিরোধী হ'তে পারে না।

গোপেনদা (রায়)--কেউ-কেউ বলেন, গাহ'স্থ্য আশ্রমে মানুষ পূর্ণতালাভ করতে পারে না ; কারণ, গৃহী যদি মোক্ষপন্থী হয়, তাহ'লে গৃহধর্ম্ম ঠিক-ঠিক পালন করতে পারে না, আর মোক্ষপন্থী যদি না হয়, তাহ'লে ধর্ম্ম, অর্থ, কামের সেবা যতই করুক না কেন, তাতে তার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয় না। সত্যিই কি তাই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমি মোক্ষপন্থী ব'লে কিছু বুঝি না। আমি বুঝি ইষ্টপন্থী হওয়ার কথা। মানুষ যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টকে পায় ও সক্রিয় নিষ্ঠায় তাঁকে অনুসরণ ক'রে চলে, তবে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই তার জীবনে সহজলভ্য হ'য়ে ওঠে। মোক্ষ মানে প্রবৃত্তির অনুভূতি ও বন্ধন হ'তে মুক্তি। মানুষের ইষ্টানুরাগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাঁর মোক্ষও লাভ হয় তদনুপাতিক। মোক্ষ মানে যদি কেউ বোঝে ইহবিমুখতা, তা' কিন্তু ঠিক নয়। বরং আমাদের ঘর, সংসার, সমাজ ও পরিবেশকে এমন ক'রে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে তা' ইষ্টেরই লীলাক্ষেত্র হ'য়ে ওঠে। আমি যা' বুঝি তা' এমনতর। আর, ভগবান্ মনু তো শুনেছি গাহ'স্থ্য আশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলেছেন। কারণ, গৃহস্থই অপর তিন আশ্রমীকে ভরণ ক'রে থাকে। শ্রম, অর্থ, বিত্ত, দারা, পুত্র, দান, ধ্যান, তপস্যা সব-কিছু দিয়ে একটা মানুষ যদি ইষ্ট ও ধর্ম্মের সেবায় রত থাকে, পরিবেশের সেবায় রত থাকে, এবং সেই সেবার ক্ষেত্রকে যদি সে বিস্তারমুখী ক'রে তোলে, তাহ'লে তার জীবন চরম সার্থকতা লাভ

করবে না কেন, বুঝতে পারি না। অবশ্য, পূর্ণতার কোন নির্দ্দিষ্ট মাত্রা নেই, আরো-আরো আছে। গার্হস্থ্য আশ্রম আত্মোন্নতির অন্তরায় তো নয়ই, বরং মনুসংহিতার মধ্যে এমনতর কথা আছে যে গার্হস্থ্য আশ্রমের ভিতর-দিয়ে না গেলে ব্রাহ্মী তনু হয় না। আবার, অন্যত্র এমন কথাও বলেছেন যে গার্হস্থ্য আশ্রম বাদ দিয়ে মোক্ষলাভের ইচ্ছা করলে অধোগতি হয়।

হরিদা (গোস্বামী)—এ-কথা খুব স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ
মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।"

(বেদাধ্যয়ন, ব্রত, হোম, ত্রৈবিদ্যনামক ব্রত, দেব-ঋষি-পিতৃতর্পণ, গৃহস্থাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, পঞ্চমহাযজ্ঞ ও অন্যান্য যজ্ঞ—এইগুলি দেহকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত করিয়া তোলে।)

আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে—

"অনধীত্য দ্বিজো বেদাননুৎপাদ্য তথা সুতান্
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ।"

(দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন না-করিয়া, সন্তানোৎপাদন না-করিয়া এবং যজ্ঞানুষ্ঠান না-করিয়া মোক্ষলাভের ইচ্ছা করিলে অধোগতি লাভ করেন।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখ, মোক্ষের সংগে গার্হস্থ্য আশ্রমের কোন বিরোধ নেই। বরং গার্হস্থ্য আশ্রম বাদ দিয়ে মোক্ষলাভের চেষ্টা করলে তাতে অধোগতির আশঙ্কা আছে।

কালীদা (সেন)—প্রত্যেককেই বিয়ে-থাওয়া করতে হবে, ঘর-সংসার করতে হবে, আর কেউ চিরকুমার থেকে মোক্ষলাভের চেষ্টা করলে তার অধোগতি হবে—এ-কথা যিনিই বলুন, ঠিক বুঝতে পারা যায় না। সংসার করলেই যদি মানুষের ভাল হ'ত, তাহ'লে সংসারী মানুষের এত নীচতা, হীনতা কেন? আধ্যাত্মিক উন্নতি তো দূরের কথা, বেশির ভাগেরই তো অবনতি হ'তে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—২।৪ জন হয়তো এমন থাকতে পারেন, যাদের পক্ষে চিরকুমার থেকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবনযাপন করাই শ্রেয়। কিন্তু সেটা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। গার্হস্থ্য আশ্রমের গুরুদায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের ভিতর যারা আদর্শ ঠিক রেখে চলতে পারে, তারা অনেকখানি শক্ত ও পোক্ত হয়। আবার, গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ না-করলে সুপ্রজননের সম্ভাবনা নষ্ট হ'য়ে যায়, একটা বংশে উন্নতি-প্রগতির ধারাটা বন্ধ হ'য়ে

গেলে, তা' যে প্রকারান্তরে ব্যক্তির, বংশের ও সমাজের অধোগতির কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ? কে জানে কার সন্তান-ধারার ভিতর-দিয়ে কালে কত বড় একজন বিরাট মানুষের আবির্ভাব হ'তে পারে ? সে-শুভ সম্ভাবনাকে কি নষ্ট করা ভাল ? স্বার্থপরের মত শুধু নিজের সারা সেরে গেলে হবে না, সমাজ-সংস্থিতির কথা ভাবতে হবে, সমাজের ভাবী কল্যাণের কথা ভাবতে হবে। এ-ভাবনা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই জড়িত। স্বার্থপর খামখেয়ালে বা ঝামেলা এড়াবার জন্য এ-ভাবনা থেকে বিচ্যুত হ'লে উন্নতির বদলে অবনতি, বিস্তারের বদলে সংকীর্ণতাই আসা সম্ভব। ………আর, আমাদের শাস্ত্র তো এমন কথা বলেনি যে যেমন-তেমন ক'রে সংসার করলেই হ'ল। প্রথম চাই ইষ্টানুরাগ। ইষ্টানুরাগ-অধ্যুষিত সুগঠিত, সংযত, বলিষ্ঠ চরিত্র যদি না থাকে, তাহ'লে বিয়ে-থাওয়া ক'রে, ঘর-সংসার নিয়ে মানুষের যে কী অবস্থা হয়, তা' তো চোখের সামনে দেখতেই পাচ্ছ। একে কিন্তু সংসার-করা বলে না।……তাই, যা-ই করতে যাও না-কেন, প্রথম লক্ষ্য হ'ল ইষ্টানুরাগ। ঐ সম্বল ট্যাঁকে ক'রে ভবসমুদ্রের মধ্যে যেখানেই পড়-না-কেন, ত'রে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরভাইকে (রায়চৌধুরী) বললেন—আমাদের যদি শত-শত রিম কাগজের দরকার হয়, তাহ'লে কন্ট্রোলের দামে যোগাড় ক'রে দিতে পারিস ?

সুধীরভাই—চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। আপনার দয়া থাকলে যোগাড় হওয়া অসম্ভব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আমার আবার দয়া কিসের ? আমার হ'ল গরজ। ঠেকায় প'ড়ে চাচ্ছি। দয়া তোদের যারা চেষ্টা করবি ও তাদের যারা সুযোগ দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই হেসে ফেললেন।

সুধীরভাই—আমি খোঁজ নেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে কাজ হাসিল হয়, তা' করাই চাই।

একটি দাদা একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে বললেন—আমি তার কাছে গিয়েছিলাম একজন রোগীর ওষুধের জন্য কিছু সংগ্রহের আশায়। অযথা এমন চড়া-চড়া কথা শুনিয়ে দিল যে নিজেকে বড় অপমানিত মনে হ'চ্ছে। আমি তো আর নিজের জন্য যাইনি যে আমাকে কথা শোনায় ? লোকটার খুব দেমাক হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে-হাসতে বললেন—অল্পেতেই অত চ'টে যাস কেন ? সে কী অবস্থায় ছিল, কেনই বা ওভাবে বলল, তাও তো ভেবে দেখবি। কারও কাছে কোন কথা পাড়তে গেলে তার হাবভাব ও অবস্থা লক্ষ্য ক'রে পাড়তে হয়। আর, চাইতে হয় এমন ক'রে, যাতে মানুষ বিরক্ত না হ'য়ে উদ্দীপ্ত হয়, উৎফুল্ল হয়, অনুকম্পা-পরায়ণ হ'য়ে

ওঠে! তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে—তুমি নিজের জন্য চাচ্ছ না, এইজন্য যেন মানুষের মাথা কিনে বসেছ। যার জন্যই বা যে জন্যই কারও কাছে কিছু চাও, যেখানে তুমি প্রার্থী, সেখানে তোমার জানা চাই, কেমন ক'রে তার সহানুভূতির উদ্রেক করতে হয়। নিজের ত্রুটি কোথায় তা' না দেখে এই যে পরের দোষ গেয়ে বেড়াও, এতে কিন্তু ভাল হয় না। অবশ্য, সেও যে ঠিক করেছে, এ-কথা আমি বলি না। তবে, অন্যের দোষ না দেখে নিজের দোষ দেখা ভাল।……আর, অহঙ্কারের ভিক্ষা ভাল না। আবার, এমনতর দৈন্যজীর্ণ রকমেও চাইতে নেই, যাতে মানুষের অন্তর অবসন্ন হ'য়ে ওঠে। সহজভাবে সক্রিয় সহানুভূতির উদ্বোধনা যাতে হয়, তেমনতরভাবে চাইতে হয়।

সুধাংশুদা (মৈত্র) এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্যে বললেন—ক্যাপেল (Capel) কী বলে?

সুধাংশুদা—ওর যখন যেটা খটকা লাগে, তখন সে-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, শোনে, বোঝে, কিন্তু নিজের মনোভাব পরিষ্কার ক'রে ব্যক্ত করে না। প্রশ্নগুলি শুনে মনে হয়, লোকটা বুদ্ধিমান্ ও চিন্তাশীল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ, যে-সে তালে-বেতালে যাজন ক'রে ওকে যেন উত্যক্ত না করে। আর, ওর যেন কোন অসুবিধা না হয় এখানে।

সুধাংশুদা (সহাস্যে)—এখানে উৎকট উৎসাহী তো অনেকে আছে, তারা সুযোগ পেলে এলোধাবাড়ি যাজন করতে ছাড়ে না। তবে ক্যাপেল এখানকার ধরন বুঝে গেছে, কার সঙ্গে কিভাবে কথাবার্ত্তা বলতে হয়, তা' বোঝে। তাই, যাকে এড়িয়ে চলতে চায়, নির্ব্বিবাদে এড়িয়ে চলতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে একটু হাসলেন।

দোখল প্রামাণিককে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খুশি হ'য়ে কুশলপ্রশ্নাদি করতে লাগলেন। কথায়-কথায় শুনলেন, তাদের পাড়ার একটি মেয়ের বিয়ে। শুনে ঔৎসুক্যভরে ওদের বিয়ে-থাওয়ার রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশ্নচ্ছলে নানা কথা জেনে নিলেন। পরে বললেন—মেয়ে কখনও খারাপ বংশে দিতে নেই। ক্ষেত যতই ভাল হোক-না-কেন, বেছন যদি ক্ষেতের উপযুক্ত না-হয়, তাহ'লে যেমন ফসল ভাল হয় না, তেমনি মেয়ে যতই ভাল হোক-না-কেন, ছেলে যদি তার যোগ্য না-হয়, তাহ'লে কিন্তু কাচ্চা-বাচ্চা ভাল হয় না। মেয়েও সে-ছেলের ঘর ক'রে সুখ পায় না।

দোখল—তা' ঠিক কইছেন ঠাকুর! ভাল বংশের মানুষ যদি গরীবও হয়, তাও তাদের আচার-ব্যবহারে শান্তি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি অনেক দেখিছ, শুনিছ, তাই তোমার হিসেবের মধ্যি আছে।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—আজকাল বংশমর্য্যাদার কথা বললে, অনেকে সেটাকে সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক ব'লে মনে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, পিতৃপুরুষের কথা ভেবে বা ব'লে গৌরব বোধ করে না। উৎস-সম্বন্ধে যাদের এই অবজ্ঞা, তারা ভগবদ্ভক্ত হবে বা দেশপ্রেমিক হবে বা অন্যকে ন্যায্য মর্য্যাদা দিয়ে চলবে, সে বড় কঠিন কথা। যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা বোঝে না, সে নিজের মর্য্যাদাও বোঝে না, আর যে নিজের মর্য্যাদা বোঝে না, সে অন্যের মর্য্যাদাও বোঝে না। মানুষের ভিতর কতকগুলি basic sentiment (মৌলিক ভাবানুকম্পিতা) থাকে, সেইগুলিকে আশ্রয় ক'রে আরো বহু healthy sentiment (জীবনীয় ভাবানুকম্পিতা) দানা বেঁধে ওঠে। বংশমর্য্যাদাবোধ, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি ইত্যাদি হ'ল basic sentiment-এর (মৌলিক ভাবানুকম্পিতার) অন্তর্গত। এগুলি খতম হ'য়ে গেলে অন্য সদ্‌গুণগুলি দাঁড়াবে কিসের উপর? কোন-কিছু গজিয়ে তুলতে গেলে তার জন্য জমি চাই তো!

কিরণদা (মুখোপাধ্যায়)—ঠাকুর! আপনি যোগ্যতা বাড়াবার কথা বলেন, কিন্তু ভিতরে সম্পদ্ না-থাকলে মানুষ যোগ্যতা বাড়ায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা দেশলাইয়ের কাঠিতে যে আগুন হয়, সেই আগুনকে যদি মাত্রামত ইন্ধন দিতে থাকা যায়, তাহ'লে তাই-ই জগৎকে পুড়িয়ে দিতে পারে। যার যা' আছে, সেইটুকু সক্রিয় ও সঞ্জীবিত রেখে বাড়িয়ে চললে, কতদূর যে বাড়তে পারে, তার কোন শেষ নেই। তোমাদের যখন যা' করতে বলি, তখন-তখনই যদি সেইটে করতে চেষ্টা কর, তাহ'লে দেখবে, কতখানি বেড়ে যাবে। আবার, স্বতঃস্বেচ্ছ দায়িত্ব নিয়েও করা লাগে। শ্রেয়ার্থ-পূরণে আগ্রহ-আবেগ নিয়ে যতদিক্ দিয়ে যতখানি অনুশীলনরত থাকা যায়, ততই লাভ। আর, যা-কিছু করবে, তা' করা চাই বিধি-মাফিক, যাতে সাফল্য অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। অতন্দ্রভাবে লেগে থাকা চাই। আলস্য বা অবসাদকে প্রশ্রয় দিতে নেই। আর যতটুকু ক্ষমতা, যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হয়, তার কখনও অপব্যবহার করতে নেই। শক্তি বা যোগ্যতার অপব্যবহার করলে বৃদ্ধির পথে কপাট প'ড়ে যায়। যার যতটুকু যোগ্যতা আছে, তা' দিয়ে যদি সে পরিবেশের উপকার না-ক'রে, অপকার করে, ইষ্টস্বার্থকে উপেক্ষা ক'রে সঙ্কীর্ণ আত্মস্বার্থের সেবা করে, তাহ'লে furtherance (অগ্রগতি) হয় না। কারণ, মনটা যদি প্রসারণশীল থাকে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে একটা জীবনীয় উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, সেই উদ্দীপনাই শক্তি ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সাধনার সহায়ক হয়, কিন্তু মনটা যদি সঙ্কুচিত হ'য়ে চলে, তাহ'লে সেই প্রেরণা আর মেলে না।

২১শে পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১৩৫০ (ইং ৬।১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের সামনের দিকের বারান্দায় হাসি-খুশী মুখে ব'সে আছেন। অনেকেই এসে প্রণামাদি করছেন। কেউ-কেউ প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন। কেউ-কেউ বসছেন। আজ দিনটা একটু মেঘলা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই বললেন—কি রে হরিপদ! রোদ উঠবিনি তো?

হরিপদদা (সাহা) তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—বোঝা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কয় কি রে? রোদ না-উঠলি তো গিছি।

এরপর শীতকালের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে গল্প-সল্প হ'তে লাগল।

একটি মা বললেন—শীতকালে খাবার খুব সুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—এই যা' কথা কইছ একখান। অবশ্য, খাবার-জিনিসের যোগাড়ও থাকা চাই, আবার পেটেরও ক্ষমতা থাকা চাই। সব সুবিধে মানুষের একসঙ্গে হয় না। যার হয়তো ক্ষিদে ও হজমশক্তি আছে, তার হয়তো যোগাড়ের ক্ষমতা নেই! আবার, যার হয়তো প্রচুর আছে, সে হয়তো খেয়ে হজম করতে পারে না।

সুশীলদা (বসু)—বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়, মানুষের জীবনে কতকগুলি অশান্তি ও অসামঞ্জস্য লেগেই থাকে, এটা কি পরমপিতার বিধান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার বিধানও বলতে পারেন আবার মানুষের বিধানও বলতে পারেন। মানুষের চলার ভিতর এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণতা থাকে, যার দরুন শান্তি ও সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে। আবার, যে যতই ভালভাবে চলুক-না-কেন, সে দেখতে পায়, তার বাঁচাবাড়া একক ব্যাপার নয়—তা' অন্যের সঙ্গে জড়ান। আর এই সপরিবেশ বাঁচাবাড়ার জন্য এমন অনেক-কিছু প্রয়োজন যা' তার আয়ত্তের বাইরে। তাই, এই অসামঞ্জস্যের সমাধান যাতে হয়, সে-বিষয়ে তাকে তৎপর হ'তে হয়। এইটেই হ'ল প্রাকৃতিক বিধান। মানুষ এইভাবে অনায়ত্তকে আয়ত্ত করে ও তার ভিতর-দিয়ে বেড়ে চলে। অভাব ও অপূর্ণতার বোধ যদি না থাকত, তাহ'লে মানুষের কোন উপকার বা উন্নতি হ'ত কিনা সন্দেহ। তবে অভাব, অশান্তির মধ্যেও মানুষ শান্তি পায় যদি আদর্শকে নিয়ে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। ঐ উন্মাদনা থাকলে সংসারের দুঃখ-জ্বালা গায় বেঁধে কম, আর সেগুলির সমাধানও সহজ হ'য়ে ওঠে। তাই, one thing needful (একটা জিনিস প্রয়োজন) যা' হ'ল আদর্শপ্রাণ হওয়া ও অন্যকেও আদর্শ-প্রাণ ক'রে তোলা।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। কেমিক্যাল ওয়ার্কস্-এর কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে কথা উঠল। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একাধারে একজন ভাল চিকিৎসক ও গবেষণা-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভাল কেমিষ্ট পেতাম, তাহ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হ'ত। আমার যদি খুঁচিয়ে কাজ করাতে হয়, তাতে ভাল হয় না। অনুসন্ধিৎসা নিয়ে নিজে পড়ে, শোনে, দেখে, হাতেকলমে করে, দরকার মত প্রশ্ন করে, আবার লোকের কষ্ট নিবারণের আগ্রহে সেবাবুদ্ধির প্রণোদনায় বাস্তব সমস্যাগুলি নিয়ে মাথা ঘামায়—এমনতর দেখলে তাদের প্রাণপণ সাহায্য করতে ইচ্ছা করে। সেইরকম লোক হ'লে পরমপিতার দয়ায় অনেক-কিছু বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু উপযুক্ত লোকই মেলে না। তাই, যা' করতে চাই, তা' আর হ'য়ে ওঠে না।

সুশীলদা—আমাদের এখন বিশেষভাবে কোন্-কোন্ বিষয়ের প্রতি নজর-দিয়ে চলতে হবে, যদি বলেন, তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' বলার তা' তো ঢের বলেছি এবং বলছিও। এখন চাই সেগুলি চারিয়ে দেওয়া ও ক'রে তোলা। তাই, প্রথম দরকার উপযুক্ত মানুষ। এই মানুষ-গুলির চাই তীব্র আদর্শনিষ্ঠা ও অসৎনিরোধী পরাক্রম। অসৎনিরোধী পরাক্রম না থাকলে অসৎ-এর আক্রমণ হ'তে নিজেকে ও অন্যকে রক্ষা করা যায় না, তাই বাঁচাই অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। দুর্ব্বলতার দরুন আমরা অনেক সময় অসৎ ও অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে চলি, তার ফলে অসৎ ও অন্যায় শক্তিমান্ হ'য়ে জীবনকেই বিধ্বস্ত করতে উদ্যত হয়। এর প্রতিবিধান করাই চাই। আর চাই, জীবনীয় অনুচলনের উৎকর্ষ-সম্পাদনী কৃষ্টি যা' ঐতিহ্যের উপর সংগ্রথিত, যার উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে মানুষ উন্নতির পথে অবাধ হ'য়ে চলতে পারে। এই মূল ঠিক না ক'রে অন্য যত যাই করা যাক-না-কেন, তা' স্থায়িত্ব লাভ করে না।

সুবোধদা (সেন)—অর্থনৈতিক সমস্যা তো দেশের একটা প্রধান সমস্যা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শপ্রাণ হওয়ার মধ্যেই আছে বাঁচাবাড়ার পথে যতরকম সমস্যা আছে, সেগুলির সমাধান ক'রে চলা। তাকেই বলে ধর্ম্ম, তাই তা' ব্যক্তিমাত্রেরই সম্বর্দ্ধনী কল্যাণ-উৎস। ধর্ম্মের সঙ্গেই জড়িত আছে বৈশিষ্ট্যসম্মত শিক্ষায় সুপোক্ত হ'য়ে সমৃদ্ধির পথে চলা। আর, তারই অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'ল—কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদির উৎকর্ষ সাধন। তাই, অর্থনৈতিক সমস্যাকে বিচ্ছিন্নভাবে ভাবলে চলবে না। অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে গেলে চাই সুষ্ঠু যোগ্যতা। আর, এই যোগ্যতা লাভ করতে গেলে চাই সুপ্রজনন। সুপ্রজননের ভিত্তি হিসাবে চাই সুবিবাহ। সব দিকে সমান তালে নজর দিতে হবে। নইলে ঘরেই বল আর বাইরেই

বল—সমীচীন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে, বর্দ্ধনার কৃষ্টি নিয়ে, তার পরিচর্য্যা ক'রে প্রত্যেক ব্যষ্টির উন্নতি করা সম্ভব হ'য়ে উঠবে কিনা সন্দেহ। দুঃখ-দুর্দ্দশার ঝড় ঝাপটা এলে, তা' হ'তে আত্মরক্ষা করা কঠিনই হ'য়ে উঠবে। যাই কর আর তাই কর—অন্যের আহার্য্য হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

সুশীলদা—অসৎ-নিরোধের নামে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ পরিবেশের সঙ্গে শত্রুতা বাড়িয়ে তোলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন মানুষের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নেই, শত্রুতা আছে মানুষের ভিতরকার সেই প্রবৃত্তির সঙ্গে, যা' জীবনের সঙ্গে শত্রুতা কবে। নিজের ভিতরে যদি তেমন কোন ঝোঁক বা প্রবৃত্তি থাকে, আগে জেহাদ ঘোষণা কবা লাগবে তার বিরুদ্ধে। তাহ'লেই অন্যের ভিতব অসৎ যা' আছে, তা' নিরোধের ক্ষমতা জন্মাবে। সাধারণভাবে আদর্শ অক্ষুণ্ন রেখে সবার সঙ্গে বান্ধব-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে চলাফেরা করাই শ্রেয়। তবে, অসৎ-নিবোধ জীবনীয় সমৃদ্ধির এক পরম সম্পদ্। দেখা যায়, মানুষ যখন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, তখন তার power of resistance (রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা) ক'মে যায়, এবং সহজেই সে রোগ-ব্যাধির কবলে প'ড়ে যায়। শরীরের বেলায়ও এটা যেমন সত্য, মনের বেলায়ও এটা তেমনি সত্য। মন যখন মানুষের দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে, তখন নিজের বা অপরের ভিতরকার অসৎ যা', তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস পায় না। ভাবে, অত ঝামেলা দিয়ে কাম কী? কোনভাবে দিন চ'লে গেলে হ'ল। অনেকে একটা সাধুতার ভান নিয়ে চুপ ক'রে থাকতে চায়। কিন্তু অসৎ-নিবোধী সংগ্রাম এড়িয়ে চ'লে সাধু হওয়া যায় না। সাধু হওয়া মানে নিষ্পাদন-সৌকর্য্যশীল হওয়া। তাতে লাগে বল, বীর্য্য, পরাক্রম, কৌশল, দরদ, কর্ম্মক্ষমতা। এইসব গুণ না-থাকলে অস্তিত্ব সুদৃঢ় হয় না, জলের উপর শেওলার মত ভাসতে থাকে—যার স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নেইকো। তাই, তার জীবনে নিষ্ঠারও বিকাশ হয় না। নিষ্ঠা মানে অটুট ধৃতিচর্য্যা নিয়ে নিশ্চিতভাবে থাকা। নিষ্ঠা থাকলে তার ব্যত্যয়ী যা', তার সঙ্গে কেউ কখনও আপোষ ক'রে চলতে চায় না। কিন্তু সে সবারই সত্তাস্বার্থী হওয়ায়, তার মানুষের সঙ্গে অন্যায্য বিরোধ বাধে না।

একটি মা এক বালতি জল নিচেয় রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছেন। ইতিমধ্যে একটা গরু এসে সেই বালতিতে মুখ দিয়েছে। মা'টি প্রণাম ক'রে ফিরে যেয়ে দেখেন, গরুটা বালতির জলে মুখ দিয়েছে। তাই দেখে ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাকে প্রহার করতে উদ্যত হলেন। সেদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখ পড়তেই আর্ত্তভাবে বললেন—

করিস কী রে? করিস কী?

মা'টি বললেন—কত কষ্ট ক'রে জল তুলে এনেছি, প্রণাম ক'রে আসতে-না আসতেই মুখ দিয়ে ফেলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)– তুই তো স্বেচ্ছায় ওকে একটু জল খাইয়ে পুণ্য করবি না, তাই ও নিজে তোকে সাহায্য করল।

মা'টি হেসে বললেন—কল থেকে জল তোলার যে কষ্ট তাতে আর পুণ্য করার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-প্রবৃত্তি থাক বা না-থাক, একটা প্রাণী তেষ্টার সময় জল খাচ্ছে, সেই সময় তাকে বাধা দেওয়া কি ভাল ? আর, বাধা দিয়েই বা তোর কী লাভ ? ঐ জল তো তোর কোন কাজে লাগবে না।

উক্ত মা—অত ভাবিনি। দেখেই রাগ হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাগ করবার আগে ভেবে দেখবার অভ্যাস করলে প্রায়ই দেখা যায়, রাগ করাটা বোকামি।

উমাদা (বাগচী)—আপনি অসৎ-নিরোধের কথা যেমন বললেন, তাতে আমাদের দেশ যদি কোনদিন স্বাধীন হয়, তাহ'লে পুলিশ, মিলিটারী, কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদিও তো প্রচুর পরিমাণে রাখা প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিশ, মিলিটারী, কামান, গোলা, বারুদ ইত্যাদির যে প্রয়োজন নেই, আমি এমন কথা বলি না। কিন্তু শুধু ঐ দিয়ে ভিতর ও বাইরের উপদ্রব দমন করা যায় না। মানুষের ভিতর মহত্তর গুণ যেগুলি আছে, উপযুক্ত বিবাহ, শিক্ষা, দীক্ষা, যাজন, সেবা, প্রীতি, সৎ দৃষ্টান্ত ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে সেগুলি জাগিয়ে তুলতে হবে। যারা তাতে সাড়া দেবে না, তারা যাতে উচ্ছৃঙ্খল চলনে চ'লে অন্যের ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা থাকাই চাই। শাসনের ভয়ে মানুষের চারিত্রিক পরিবর্ত্তন না হ'লেও, ওতেও বাহ্যিক শৃঙ্খলা অনেকখানি বজায় থাকে। তাই, প্রয়োজনমত তার ব্যবস্থা রাখাই লাগে। বাস্তবতার বোধবর্জ্জিত চলন কখনও শুভকর হয় না। তবে, যাই করা যাক—দেশবিদেশের সবাই যাতে ভিতর থেকে গ'ড়ে ওঠে, সে-চেষ্টা অব্যাহত রাখতেই হবে। আর, এই চেষ্টা করতে হবে ব'লে যেন আমরা বাহ্যিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে উদাসীন না-হই। তাতে কিন্তু অস্তিত্ব বিপন্ন হ'য়ে উঠতে পারে। যা-কিছু করতে হবে, সপরিবেশ অস্তিবৃদ্ধির জন্য—এই কথাটা ভুললে চলবে না। শক্তি যদি এই লক্ষ্যকে বিপর্য্যস্ত করে, তাহ'লে তা' কিন্তু শয়তানেরই উত্তরসাধক।

যোগেশদা (চক্রবর্ত্তী)—আজকাল দেশে একদল সমাজ-সংস্কারক দেখা যায়, যারা মনে করেন, পাশ্চাত্যের মত আমাদের দেশেও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকলে নারী-

সমাজের প্রতি সামাজিক ন্যায়-বিচারের পরাকাষ্ঠা দেখান হবে। তাই, এ অধিকার স্বীকৃত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ক্ষোভের সঙ্গে)—ওরা যা' ক'রে পস্তাচ্ছে, আমাদের তা' না-করলে চলবে কেন? যেগুলি আমাদের সমাজের পক্ষে গৌরবের, সেইগুলি নিয়ে আমরা বিব্রত ও লজ্জিত বোধ করি, এটা যে কতখানি অন্তঃসারশূন্যতা ও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক তা' ব'লে শেষ করা যায় না। বিবাহবিচ্ছেদপ্রথা যদি চালু হয়, তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। পরিবারে ও সমাজে এখনও যে সুখশান্তিটুকু আছে, তা' আর থাকবে না। পুরুষ ও নারী যাতে সুস্থ থাকতে পারে, স্বস্থ থাকতে পারে, আত্মস্থ থাকতে পারে, তৃপ্ত থাকতে পারে এবং স্ব-স্ব সহজাত সংস্কার-অনুযায়ী জীবন-সংগ্রামের সব ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য ক'রে সত্তাকে আপূরিত ক'রে চলতে পারে, সেই দাঁড়াটাই নষ্ট হ'য়ে যাবে। নারীর সতীত্ব বিদায় নেবে চিরদিনের জন্য। অচ্ছেদ্য প্রীতি বন্ধনের বদলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আসবে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। কেউ নিজেকে নিরাপদ মনে করবে না। কামলালসাই হবে পরস্পরের বন্ধনের একমাত্র সূত্র। পরস্পরকে স'য়ে-ব'য়ে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিবেশ সকলের প্রতি মমতাবদ্ধ হ'য়ে সারাজীবন মিলিত সত্তা নিয়ে সংসার করার পরিকল্পনা উবে যাবে, তাই, ভালবাসা শিকড় গাড়ার সুযোগ পাবে কম। কারণ, পারস্পরিক বাস্তব অনুকম্পার ভিতর দিয়ে যে স্বতঃস্বেচ্ছ প্রীতি সহজ হ'য়ে ওঠে, তার ভিত্তিই যাবে আলগা হ'য়ে। সামান্য দুঃখ, দারিদ্র্য, মনোমালিন্য, সঙ্কট ও সংক্ষোভের সময় মনে হবে বিবাহ-বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পাবার কথা। এককথায়, ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও প্রীতির আপ্রাণ উন্মাদনা, যা' অন্তঃকরণকে সুসংস্থ ক'রে সুসন্দীপনায় স্ত্রী-পুরুষের সত্তাকে ঐক্যসম্বদ্ধ ক'রে তোলে, তার কর্ম্ম তো নিকেশ হ'তেই থাকবে; তাছাড়া, এমন দিনও আসতে পারে, যখন হয়তো মানুষ জানবে না, কেউ তার মা আছে বা স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী ইত্যাদি ব'লে কেউ আছে। স্নেহপ্রীতির বন্ধন বা আশ্রয় ব'লে কারও কিছু থাকবে না। সেদিন বাওরার মত হতাশ-বুকে পথে-পথে ঘুরে বেড়ান ছাড়া তার আর কী করণীয় থাকবে বুঝতে পারি না। লোকসমাজে থেকে সমৃদ্ধির দিকে সুচেতন হ'য়ে সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম ক'রে সাঁতার কেটে চলাই কঠিন হ'য়ে উঠবে। কারণ, অন্তঃকরণে একটা স্থির অভিনিবেশ বন্ধমূল হ'য়ে উঠবে, তার আপনার ব'লে কেউ নেই —পৃথিবীর বুকে সে নিছক একা। আজকে যে তার স্ত্রী, কাল সে অন্যের স্ত্রী, আজকে যে একজনের মা, কাল সে তার পিতা ছাড়া অন্য পুরুষের ছেলের মা। আজকে যে গৃহিণীকে অবলম্বন ক'রে গৃহস্থালী উচ্ছল হ'য়ে চলছে, তা' চলতেই পারবে

না। সে হয়তো হবে অন্যের স্বার্থসম্ভোগের ক্রীড়নকমাত্র। এইভাবে জীবনের স্থায়িত্বের সুসংস্থ কাঠামোটা চুরমার হ'য়ে ভেঙ্গে পড়বে। ভাল যারা আছে, তারাও পরিবেশের ঐ প্রভাবে সংক্রামিত হ'য়ে উঠবে। অনেকেই ঐ আবহাওয়ায় প'ড়ে বিবেককে ভোঁতা ক'রে ওরই সমর্থন ক'রে চলতে সুরু-করবে, ফলে উচ্ছৃঙ্খল-বিশৃঙ্খলা সমস্ত রাষ্ট্রকে, সমাজকে, পরিবার ও পরিবেশকে শাসন করতে থাকবে। তাদের সু-নিয়ন্ত্রিত করবার, সংবর্দ্ধনায় সন্দীপ্ত করবার কেউ থাকবে না। দুর্নীতি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আধিপত্য করতে থাকবে দেশের উপর। এর ভিতর-দিয়ে যে-সব জাতকেব আবির্ভাব হবে তারাও হবে সংবর্দ্ধনবিরোধী। আবার, পিতামাতার দাম্পত্য-জীবন ব্যতিক্রম-দুষ্ট হওয়ার ফলে সন্তান-সন্ততির ভিতর মস্তিষ্ক-বিকৃতি, ব্যতিক্রমী চিন্তা, চলন, বিধ্বস্ত, ছেদপ্রবণ ব্যক্তিত্বের বহুল আবির্ভাব হ'তে থাকবে, সত্তাবিরোধী, সংহতি-বিরোধী ও কৃষ্টি-বিরোধী চলনই হবে তাদেব স্বভাবধর্ম্ম। তারা নিজেরা ভ্রষ্ট-চরিত্র হ'য়ে পরিবেশকেও সর্ব্বনাশের পথে বিভ্রান্ত ক'রে চলতে থাকবে।

যোগেশদা—বিবাহ-বিচ্ছেদ যারা অনুমোদন করেন, তাবা এ-কথা বলেন না যে, সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। অনিবার্য্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই তারা এ-পথটা খোলা রাখতে চান, যাতে অপরিহার্য্য-স্থলে এটার সুযোগ গ্রহণ ক'রে হতভাগ্য নারীপুরুষ অসহনীয় ব্যর্থতা ও জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যেখানে শাস্ত্রানুযায়ী বিবাহই অসিদ্ধ। যেমন প্রতিলোম বিবাহ। বিবাহ যেখানে অসিদ্ধ, সেখানে বিচ্ছেদের কথা আসে না। নইলে শাস্ত্রসিদ্ধ বিবাহ যেখানে, তা' অচ্ছেদ্য ও অচ্যুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ফলকথা, সদৃশঘরে বিধিমাফিক সঙ্গতিশীল বিবাহ যদি হয়, সেখানে মিল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। বিবাহের আগে সব দিক্ দেখেশুনে মিল ক'রে বিবাহ দিতে হয়। বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য ও অচ্যুত—স্বামী-স্ত্রীর মনে এই স্বীকৃতি থাকলে, তাতে পারস্পরিক প্রীতি, ক্ষমা, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও সেবার ভিতর দিয়ে উভয়ের ব্যত্যয়ী চলন ক্রম-নিয়ন্ত্রণে সঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। তাতে বিশৃঙ্খলা অনেকখানি সুশৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে থাকে। সুপ্রজননের আশাও অনেকখানি মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে, এবং ছিন্নব্যক্তিত্বের আমদানি হয় কমই। আর, মানুষ যদি দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও আপনজনের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন না করে, তার দোষ-ত্রুটি থাকলেও তা' দরদের সঙ্গে স'য়ে-ব'য়ে নেয়, তাতে তার যে খুব-একটা ক্ষতি হয়, তা' কিন্তু নয়। বরং নারীপুরুষ এর ভিতর-দিয়ে অনেকখানি মহত্ত্ব অর্জ্জন করে। ভাল যে, তাকে তো সবাই ভালবাসতে পারে। মন্দ যে, তাকে ক'জন ভালবাসতে পারে? এই ভালবাসা পেয়ে আবার দেখা যায়,

কতজনের জীবন বদলে যায়। স্বামী হয়তো মাতাল, বেশ্যাসক্ত, স্ত্রীর উপর অকথ্য অত্যাচার করে; সেই স্বামী স্ত্রীর সেবাপরিচর্য্যায় সোনার মানুষ হ'য়ে যায়। এরকম ঘটনা যথেষ্ট ঘটে। স্ত্রীর অত্যাচারও পুরুষরা কম সহ্য করে না। এইভাবে সংসার চলে। ছেলেটা যদি বেয়াড়া হয়, তাহ'লে কি তাকে তাড়িয়ে দিতে হবে নাকি? তাহ'লে সে দাঁড়াবে কোথায়? কোন্ আশ্বাসে, কিসের আশায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে চেষ্টা করবে? ভালবাসাই তো মানুষকে বাঁচায়, ভালবাসাই তো মানুষকে ফেরায়। সংসারে যদি তার অনটন প'ড়ে যায়, তবে সংসার চলবে কি ক'রে? জুড়েগুড়ে থাকবে কি ক'রে? বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে সাময়িক ঠাঁইনাড়া হ'য়ে থাকতে পারে। কিন্তু নারায়ণ সাক্ষ্য ক'রে যে-বিবাহ হয় সে বিবাহ হ'ল একটা sacrament (পূত-অনুষ্ঠান), তার বিচ্ছেদ হবে কেন? দুটো-চারটে ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমোদন যদি থাকে, তাহ'লে দেখা যাবে, অনেকেই তার সুযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। ব্যত্যয়ী চলনওয়ালা যারা, তারা আবার নিজেদের দল বাড়াতে কসুর করবে না।...কোন্‌টায় সুবিধা বেশি, অসুবিধা কম—ভেবে দেখতে হয়। যে-সব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে, তাদের তো শুনি, পারিবারিক জীবনে অশান্তির অন্ত নেই। আমরা কি খাল কেটে সেই কুমীর ডেকে আনব? বিবাহ-বিচ্ছেদ হ'লে ছেলেমেয়েরা মা থাকতে মা পাবে না, বাবা থাকতে বাবা পাবে না—এইরকম একটা অসহায় অবস্থার সৃষ্টি হবে। আপনি-আমি যদি ঐ অবস্থায় পড়ি, তাহ'লে কেমন লাগে?

ধীরে-ধীরে মেঘলা কেটে গিয়ে রোদ উঠেছে। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশি। গায়ের চাদরটা খুলে ফেললেন। বঙ্কিমদাকে দেখে বললেন—এই যে রয়টার এসে গেছে। সংবাদ কী কও দেখি!

বঙ্কিমদা (রায়)—নূতন সংবাদ কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—নূতন সংবাদ যখন দিলে না, তাহ'লে কও—শাস্-ধাতুর মানে কী-কী আছে।

বঙ্কিমদা বই দেখে এসে বললেন—শাসন, উপদেশ, অনুশাসন, আশা, প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর -শাস্ত্র কথা তো শাস্-ধাতু থেকে, তাই না?

বঙ্কিমদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন। তিনি কথায়-কথায় বললেন—আজকালকার শিক্ষিত লোক যারা, তাদের বেশির ভাগই শাস্ত্রীয় অনুশাসনের তাৎপর্য্য বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে, আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে পরিচয় নেই।

দৃষ্টিভঙ্গীই* উল্টো হ'য়ে গেছে। তাই, নিজেদের জীবন-দাঁড়াকে অগ্রাহ্য করতে দ্বিধা বোধ হয় না। কিন্তু ইষ্ট, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও জাতীয় মেরুদণ্ডকে বরবাদ করার বুদ্ধি যদি হয়, তাহ'লে মানুষের নিজস্ব ব'লে কিছু থাকে না। সে-অবস্থায় পরপদলেহী কুকুরের মত দ্বারে-দ্বারে ঘোরা ছাড়া পথ থাকে না। কারণ, ব্যক্তিত্বের যে গড়ন থাকলে পরিবেশের সেবার ভিতর-দিয়ে মানুষ সৎ ও স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে, সেই গড়নই যায় ভেঙ্গে। ফলে, শিশ্নোদরপূরণী সন্ধিৎসায় অন্নবস্ত্রের লোভে, পয়সার লোভে, মিথ্যা অভিমানের লোভে আত্মবিক্রয় ক'রে নানারকম হীনবৃত্তি অবলম্বন করা-ছাড়া উপায় থাকে না। শ্রেয়পন্থী যারা, তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হওয়া উচিত—অশ্রেয়-পন্থী যারা, তাদের ঐ শ্রেয়কৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ক'রে শ্রেয়সন্দীপ্ত ক'রে তোলা। কিন্তু আমরা শ্রেয়ের কোলে থেকেও তাকে উপেক্ষা ক'রে অধঃপাতের উপাসক হবার জন্য লোলুপ হ'য়ে উঠেছি। এ নিতান্ত দুর্দ্দৈব-ছাড়া আর কিছু নয়।

কেষ্টদা—এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর কারণ হ'ল যাজনের অভাব। আমরা যে কত বড় সম্পদের অধিকারী, তা' আমবা নিজেরাও বুঝি না, মানুষের কাছে যাজনও করি না, বা সে-সম্বন্ধে আমরা যাজিতও হই না। তাই তার মূল্য-সম্বন্ধে সচেতন হ'তে পারি না। ভারত যুগ-যুগ ধ'রে নানা অত্যাচার সহ্য ক'রেও, এখনও যে এতখানি জীবনীয় ঐশ্বর্য্য নিয়ে বেঁচে আছে, তার কারণ, ভারতের অমৃতময় কৃষ্টির প্রতি এখনও দেশের লোকের নেশা একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও এখনও জাতির রক্ত বহুলাংশে ঠিক আছে ব'লেই মনে হয়। কিন্তু এই সম্পদ্ যদি নষ্ট হ'য়ে যায়, তাহ'লে ধরাই যাবে না, কার ভিতর কী সংস্কার সক্রিয় হ'য়ে আছে, আর কিসের অনুপ্রেরণায়ই বা কে চলছে। আবার, এই সংস্কারগুলি যার ভিতর যেমনতর নিখুঁত, সেগুলি শরীরটাকেও ঐ বিশেষত্ব অনুযায়ী তেমনভাবে ক্রিয়াশীল ক'রে গঠন ক'রে থাকে। আবার, ঐ অমনতর গঠনের ফলেই বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী উন্নত বিবর্ত্তনের সম্ভাব্যতা তাদের মধ্যে প্রাঞ্জল হ'য়ে থাকে। তাই বলি, প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধাপূত অন্তঃকরণে সমৃদ্ধিতে সুশোভিত ক'রে আপনারা প্রতিপ্রত্যেকে আদর্শনিষ্ঠ চলনে সুসম্বুদ্ধ ও অনুশীলনশীল হ'য়ে চলুন। আদর্শ মানে, যাঁকে দেখে নিজের জীবনকে পরিচালিত করা যায়—তাঁর প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন শ্রদ্ধায়। ঐ ভিত্তিতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বাস্তবভাবে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে জীবন-সম্বেগী power of resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) কে বাড়িয়ে বৈশিষ্ট্যসম্মত বর্দ্ধনায় একায়িত হ'য়ে উঠুন। এককথায়, বহু থেকেও এক হ'য়ে অচ্ছেদ্য বান্ধব-বন্ধনে প্রবল প্রাচুর্য্যে উৎকর্ষ-

উচ্ছল হ'য়ে ভরদুনিয়াটাকে ঐ উচ্ছলতায় সচ্ছল ক'রে তুলুন। সেদিন যদি আসে, সে-যুগ যদি আসে, আর তা' যদি স্রোতশীলবর্দ্ধনায় আপনাদের অন্তঃকরণ প্লাবিত ক'রে চলে—আর তা' চিরদিনের জন্য, চিরযুগের জন্য,—এই মর্ত্ত্যই প্রতিটি ব্যষ্টির ভিতরে স্বর্গ হ'য়ে উঠবে—তাও চিরদিনের জন্য,—তা' স্বাস্থ্যে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, কৃষ্টিতে, সমৃদ্ধির উচ্ছল আলোড়নায় সব-সকলকে উচ্ছল ক'রে তুলে। এর ফলে সারা দেশ সাহসী আপ্যায়নায় সমস্ত অশুভকে সমীচীনভাবে resist (নিরোধ) ক'রে,—সন্দীপনার প্রতুল সম্বেগে একায়িত অন্তর-বন্ধন নিয়ে প্রত্যেকের অন্তঃস্থ শত্রুকে দমন ক'রে, দেবত্বের পূজা ও উৎসর্গে সমীচীন অর্ঘ্য-নিবেদনে স্বস্তি ও সমৃদ্ধিকে আবাহন ক'রে চলবে।

২০শে চৈত্র, রবিবার, ১৩৫০ (ইং ২। ৪। ১৯৪৪)

আজ রামনবমী। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নাট্যমণ্ডপের পাশে একটা চেয়ারে ব'সে আছেন। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শশধরদা (সরকার), কালীদা (ব্যানার্জী), শ্রীশদা (রায়চৌধুরী), কমলদা (ভট্টাচার্য্য), নন্দদা (মোদক), জিতেনদা (চ্যাটার্জী), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জী), হরেনদা (ভদ্র), ইন্দুদা (মিত্র) প্রমুখ অনেকেই আছেন। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'চ্ছে। এমন সময় শরৎদা (হালদার) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—শরৎদা! কোথায় গিছলেন?

শরৎদা—তপোবনে রামনবমী-উৎসব ছিল, সেখানে গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেমন হ'ল?

শরৎদা—ভালই।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—গল্প ক'রে বলেন। না-হ'লে কি রস হয়?

শরৎদা—সকালে মাষ্টারমশায়রা ছেলেপেলেদের নিয়ে বিনতি-প্রার্থনার পর গান ও শোভাযাত্রা করেছেন, তা' তো আপনি জানেন। বিকালে শ্রীরামচন্দ্রের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সভা ক'রে আলোচনা করা হ'ল। পাবনা কলেজের অধ্যাপক অমিয়বাবু সভাপতি হয়েছিলেন। আশ্রমের দাদা ও মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনে গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতা ইত্যাদি করল। তা' বেশ ভালই করল, ছেলেপেলেদের বেশ সাহস আছে। একটুও ঘাবড়ায়নি। তারপর আমি, সত্যদা, প্রফুল্ল, ভারতদা, অমিয়বাবু বললাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশেষ কথা কী-কী বলা হ'ল?

শরৎদা—রামায়ণের ভিতর আর্য্য ও দ্রাবিড় জাতি ও সভ্যতার মিলনের ইতিহাস যে পাওয়া যায়, সেই কথা আলোচনা হ'ল। আদর্শ পুরুষ হিসাবে শ্রীরামচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, অসৎ-নিরোধ, চাতুর্ব্বর্ণ্যের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ও বলা হয়েছে। আদর্শ ভক্ত হিসাবে হনুমানের কথাও হয়েছে। মোটামুটি সবারটা মিলিয়ে কোন দিক্ই বাদ পড়েনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদার কাছে যা' শুনি, তাতে মূল বাল্মীকির রামায়ণ আমাদের খুব ভাল ক'রে পড়া উচিত। মূল বেদ, উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ, সংহিতা ইত্যাদি পড়া দরকার। এইগুলি না পড়লে আর্য্যকৃষ্টি কী বস্তু, সে-সম্বন্ধে ধারণা হয় না। তাই, সংস্কৃতও ভাল ক'রে শেখা লাগে, যাতে টীকাটিপ্পনীর সাহায্য-ব্যতিরেকে বইগুলি প'ড়ে বোঝা যায়।

কেষ্টদা—আজকাল অনেক গ্রন্থের ইংরাজী ও বাংলায় তর্জ্জমা হয়েছে। কিন্তু মূল না-বুঝে তর্জ্জমার উপর নির্ভর করলে অনেকখানি বাদ প'ড়ে যায়। সংস্কৃত-ভাষারই একটা মহিমা আছে। পড়লে মনটা যেন সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে। · ···রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদির মধ্যে বিপুল বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। রামচন্দ্র ভরতকে প্রশ্নচ্ছলে রাজকার্য্য-সম্বন্ধে যে-সব উপদেশ দিয়েছেন তার তুলনা মেলে না। রামায়ণের ভিতর যে এ-সব জিনিস আছে, তা' কৃত্তিবাসের রামায়ণ প'ড়ে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামচন্দ্র ভরতকে রাজকার্য্য-সম্বন্ধে কী বলেছিলেন ?

কেষ্টদা—আমার সব ভাল ক'রে মনে নেই। তবে এইভাবের কথা আছে—তুমি গুণী ও যোগ্য ব্যক্তিকে বহু মান প্রদর্শন ক'রে থাক তো ? বীর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বংশজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ লোকদের মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করেছ তো ? তুমি তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রণা কর তো ? তোমাদের মন্ত্রণা লোকের মধ্যে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে না তো ? তুমি যথাসময়ে শয্যাত্যাগ কর তো ? রাত্রিশেষে অর্থলাভের চিন্তা কর তো ? তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ ক'রেও একজন বিদ্বান্কে সংগ্রহ করতে চেষ্টা কর তো ? অযোগ্য লোককে যোগ্যস্থানে ও যোগ্য লোকদের অযোগ্যস্থানে নিয়োগ কর না তো ? যে-সব অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাদের পিতৃপুরুষ যোগ্যতার সঙ্গে অমাত্যের কাজ করেছেন, যারা ভিতরে-বাইরে পবিত্র—সেই সব শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে শ্রেষ্ঠকাজে নিযুক্ত করেছ তো ? রাজ্যমধ্যে কোন প্রজা অযথা উৎপীড়িত হয় না তো ? শত্রুকে পরাস্ত করতে পটু, সাহসী বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, সৎকুলজাত, শুদ্ধাচারী, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করেছ তো ? বিশেষ নৈপুণ্য যাদের আছে তাদের তুমি পুরস্কৃত ও সম্মানিত ক'রে থাক তো ? প্রত্যেকের প্রাপ্য বেতন সময়মত দিয়ে থাক তো ?

রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গ তোমার প্রতি অনুরক্ত আছেন তো? তোমার কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁরা মিলিত হ'য়ে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছেন তো? বিদ্বান্, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিচক্ষণ এবং তোমার জনপদের অধিবাসীকেই দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করেছ তো? স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে প্রধান-প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সংবাদ চরগণ-দ্বারা অবগত থাক তো? চরগণ পরস্পর-বিরোধী তথ্য পরিবেষণ করলে তার কারণ নির্ণয় ক'রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে থাক তো? প্রজাগণ সুখে আছে তো? তারা দিন-দিন স্ব-স্ব কর্ম্ম ক'রে সমৃদ্ধ হ'চ্ছে তো? তোমার আয় বেশি, ব্যয় কম হ'চ্ছে তো? ধনাগার অর্থশূন্য হ'চ্ছে না তো? অপরাধীদের ধনলোভে ছেড়ে দেওয়া হয় না তো? তুমি সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের প্রয়োগ যথাস্থানে ক'রে থাক তো? তুমি ইন্দ্রিয়গণকে জয় করতে সচেষ্ট থাক তো? অগ্নি, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক এই পাঁচ রকমের দৈববিপদের প্রতিকারের জন্য তুমি যত্নশীল থাক তো? সন্ধিবিগ্রহাদি যথাস্থানে প্রয়োগ কর তো?—আরো অনেক কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত মূল্যবান্। আর দেখেন, ইন্দ্রিয়জয়ের উপর কতখানি জোর। মানুষ যদি প্রবৃত্তির দাস হয়, তাহ'লে কোন বড় কাজ করতে পারে না। ক্ষমতার আসনে যারা থাকবে—অর্থ, প্রতিপত্তি যাদের হাতে থাকবে, তারা যদি ইষ্টপ্রাণ ও সুনিয়ন্ত্রিত না-হয়, তাহ'লে বিপদেরই কথা। সেইজন্য রাজাদের জ্ঞানবৃদ্ধ ও বিজ্ঞ আচার্য্যের সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সেবা করার কথা আছে। এটা শুধু রাজাদের নয়, সকলেরই করণীয়। আচার্য্য মানে, যিনি সৎ-আচরণসিদ্ধ, অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার আচরণে অভ্যস্ত। অমনতর প্রাজ্ঞ আচার্য্যের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণী অনুষ্ঠানে রত না-থাকলে মানুষ যে কোন্ সময় ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় লিপ্ত হ'য়ে পড়ে, তা' সে নিজেই ঠিক পায় না। রাজাই হোক, ফকিরই হোক, প্রবৃত্তিপরায়ণতাই মানুষকে হীনবল ক'রে তোলে। যে নিজেকে জয় করতে পারে না, সে অন্যকেও জয় করতে পারে না। তাই, আত্মজয়ী হবার জন্য সচেষ্ট থাকতে হয়। তার মানে এ নয় যে, ঐহিক উন্নতি ও সমৃদ্ধিকে উপেক্ষা করতে হবে। বরং সমাজ ও রাষ্ট্রকে এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে যাতে জীবনের ভিত্তিটা অটুট ও নিনড় হ'য়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যশক্তি, ক্ষাত্রশক্তি, বৈশ্যশক্তি, শূদ্রশক্তি—সবটারই বিপুল অভ্যুত্থান চাই, কিন্তু সবটা হওয়া চাই ধর্ম্ম, ইষ্ট ও কৃষ্টি-অনুগ। এই সমন্বয় না-হ'লে জীবনই অচল হ'য়ে পড়বে।

শরৎদা—কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতিই তো মুখ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোনটা বাদ-দিয়ে কোনটা নয়। সবটা মিলিয়ে মানুষের জীবন, আর তা' অখণ্ড। অস্তিত্বের ভৌতিক স্থিতিটাকে বাদ দিয়ে যদি আত্মিক বিকাশের

কথা ভাবতে যাই, তাহ'লে আত্মিক বিকাশ হবে কার এবং কিসের উপর দাঁড়িয়ে। আবার, আত্মিক বিকাশের দিক্‌টা বাদ দিয়ে যদি শুধু ভৌতিক স্থিতি ও সমৃদ্ধির কথাই বড় ক'রে দেখি, তবে আসুরিক প্রবৃত্তির প্রভুত্ব এতখানি বেড়ে যাবে যে, তাই-ই নিজের ও অপরের বিনাশের হেতু হ'য়ে উঠবে। Balance (সমতা) থাকবে না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। চতুর্দ্দিকে ঝিল্লীর রব। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। সবাই নীরবে ধ্যানস্থ হ'য়ে ব'সে আছেন। কেউ-কেউ এসে প্রণাম ক'রে চ'লে যাচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পরে হরেনদা (ভদ্র) জিজ্ঞাসা করলেন—রামায়ণের মধ্যে যে অহল্যার শাপমুক্তির কথা পাওয়া যায়, সে-ব্যাপারটা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহল্যা ছিলেন গৌতম ঋষির স্ত্রী। কিন্তু তিনি নিজের দুর্ব্বলতা-বশে ও অন্যের প্রলোভনে পাতিব্রত্য থেকে ভ্রষ্টা হন। তাতে গৌতম তাঁকে অভিশাপ দেন, এবং তিনি পাষাণের মত হ'য়ে যান। পাষাণের মত হ'য়ে যাওয়া মানে, বোধশক্তি-রহিত হ'য়ে যাওয়া—যাকে বলে callous হওয়া। মানুষ পাপের পথে, বিশেষতঃ ব্যভিচারের পথে চললে তাতে তার বুদ্ধি-বিবেচনা ও সাড়াশীলতা অনেকখানি নীরেট হ'য়ে যায়। ভালমন্দ বিচারক্ষমতা হ্রাস পায়, আস্তে-আস্তে জবুথবুর মত হ'য়ে পড়ে। অহল্যারও তাই হয়েছিল। আস্তে-আস্তে জড়ত্ব এসে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে রামচন্দ্র যখন গৌতমের আশ্রমে আসেন, রামচন্দ্রের চরণস্পর্শে তাঁর শাপমোচন হয় অর্থাৎ পাপজনিত জড়ত্বমুক্ত হ'য়ে গতিশীল পবিত্র জীবনের অধিকারী হন। আমি যা' শুনেছি, তাতে এমনতরই মনে হয়। মানুষ যতই পাপ করুক, সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত হ'তে পারে, যদি পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎ-সংস্রবে তদনুপ্রাণনায় তন্মুখী চলনে ব্রতী হয়। চরণস্পর্শ মানে চলন-স্পর্শ। তাঁকে দেখে আমাদের চলন তাঁর চলন ছুঁয়ে চলা চাই। আমাদের চলনের মধ্যে যদি তাঁর চলনের পরশ ফুটে না ওঠে, তাহ'লে কিন্তু যতই সান্নিধ্যলাভ হোক না কেন, তাতে কিছু হবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেলেন। তারপর আশ্রমের সামনের দিকে ফিরে আসলেন। আসতে-আসতে বললেন—তপোবনের মধ্যে যেমন একটা নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, এই রকমটা বজায় থাকে, তাহ'লে হয়।

কেষ্টদাকে বললেন—আপনি যেমন যাতায়াত করছেন তেমনি করবেন। আমিও ভারতদাকে বলেছি, মাষ্টারমশায়দের নিয়ে এসে মাঝে-মাঝে আপনার কাছে ব'সে আলাপ-আলোচনা করতে। যদি বিশেষ লক্ষ্য না রাখেন, তাহ'লে মামুলী আর দশটা স্কুলের মত হবে। আমি যা' চাচ্ছি, তা' আর হবে না। তপোবন ভাল ক'রে গ'ড়ে

তুলতে পারলে কিন্তু এর ভিতর-দিয়ে অনেক কাজ হ'তে পারে।

কেষ্টদা—আমি তো লেগেই আছি পিছনে। দেখি কী করা যায়।

কথাবার্ত্তা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে এসে বাঁধের ধারে খোলা জায়গায় চৌকীতে বসলেন। গরমকাল, দক্ষিণ দিক্ থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে মাঝে মাঝে। তাতে বেশ একটা আমেজ লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আসার পর অনেকেই এসে জুটলেন। হরিপদদাকে (সাহা) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভাল বংশলোচন যোগাড় করতে পারিস ?

হরিপদদা—এখন তো খোঁজে নেই। খোঁজ করে দেখতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাজারে যা' কিনতে পাওয়া যায়, প্রায়ই তার মধ্যে কৃত্রিমতা থাকে। ভাল জিনিস জোগাড় করতে পারলে কাজ হ'ত। একজনকে দিতাম। তুই নিজেও খোঁজ করিস আর বীরেনদাকেও বলিস।

হরিপদদা—আচ্ছা!

যশোহরের একটি ভাই বললেন—আমাদের গ্রামের একটা রাস্তায় বহুদিন পর্য্যন্ত মাটি তোলা হয় না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে আবেদন-নিবেদন করা হয়, তাতেও কোন ফল হয় না। কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত মাটি না-পড়ায় রাস্তাটার বর্ষাকালে যা' অবস্থা হয় তা' আর বলার না। আগামী বর্ষাকালে আবার দুরবস্থায় পড়তে হবে—এই কথা ভেবে আমরা গ্রামস্থ সৎসঙ্গীরা স্থির করি যে, কোন দিক্ থেকে কোন সাহায্য পাই বা না পাই, আমরা নিজেরাই মাটি তুলতে সুরু ক'রে দেব। এই সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী কাজ সুরু করার পর গ্রামের আরো বহু লোক, বিশেষতঃ যুবকেরা এসে আমাদের সঙ্গে কাজে যোগ দেয়। পরমপিতার দয়ায় সবার সমবেত চেষ্টায় রাস্তাটি খুব ভালভাবে মেরামত হয়েছে। এতে গ্রামের লোক সৎসঙ্গের প্রতি খুব সশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। আমাদের ভিতরও একটা বিশ্বাস এসেছে যে চেষ্টা করলে কঠিন কাজও করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল! খুব ভাল! এইভাবে যত করবা ততই দেখবা—অজ্ঞাতসারে বড় হ'য়ে উঠছ। পরমুখাপেক্ষী না হ'য়ে সব ব্যাপারে আমরা নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে যত পরচর্য্যী হ'তে পারি ততই ভাল। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—Heaven helps those, who help themselves. (যারা নিজেরা চেষ্টা করে, ভগবান্ তাদের সহায় হন)। সৎকাজে পরিবেশ থেকে অনেক বাধাবিঘ্ন আসতে পারে, কিন্তু সৎকাজ করায় এমন একটা আত্মপ্রসাদ ও উল্লাস আসে, ভিতর থেকে এমন একটা সাহস ও বল পাওয়া যায় যে, তাই-ই মানুষকে কৃতকার্য্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে

যায়। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে পরমপিতার অধিষ্ঠান আছে। সেই অন্তরস্থ পরমপিতা প্রীত ও নন্দিত হন—যখন আমরা ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামুখর হয়ে কল্যাণ-চিন্তা, কল্যাণ-কথা ও কল্যাণ-কর্ম্মে বাস্তবভাবে নিযুক্ত হই। এমনতর কাজের সঙ্গে-সঙ্গে পরমপিতার দয়া ওতপ্রোতভাবে নিবদ্ধ থাকে।

হেমাঙ্গদা (দাশগুপ্ত)—মানুষ যদি ইষ্টগ্রহণ না ক'রে লোকের কল্যাণ যাতে হয় তেমনতর চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্ম নিয়ে চলে, তাতে তার অন্তরস্থ পরমপিতা তৃপ্ত হন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা-সংরক্ষণী ও সত্তা-সংবর্দ্ধনী চিন্তা, চলন ও বাক্য হ'লেই তিনি তৃপ্ত হন। কিন্তু মানুষ ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠামুখর না-হ'লে প্রবৃত্তির কবলে প'ড়ে যায়। প্রবৃত্তির কবলে থেকে সত্তা-সংরক্ষণী ও সত্তা-সংবর্দ্ধনী কাজ করতে গেলে, তার মধ্যে অনেক ভেজাল এসে পড়ে। ভাল করতে যেয়েও অনেক মন্দের আমদানি ক'রে ফেলে। আর, ঐ মন্দের শুভবিন্যাস করতে পারে কমই। কারণ, শুভে বিন্যাস করতে চাই জীবন্ত শুভ অর্থাৎ ইষ্ট, যিনি হলেন balance-imparting agent (সমতা-সঞ্চারী হোতা)। তাই, sincerely (আন্তরিকভাবে) কেউ যদি মানুষের ভাল করতে চায়, সে ইষ্টগ্রহণ করেই। মানুষের ভাল চায়, অথচ ইষ্টগ্রহণ করতে চায় না বা ইষ্টগ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ করে না, তার মানে—প্রকৃত ভাল কী, সে-সম্বন্ধে তার ধারণা নেই, কিংবা এই ভাল করবার চাহিদার পিছনে আছে কোন প্রবৃত্তির প্ররোচনা—যেমন অর্থ, মান, যশ, প্রতিপত্তি, মেয়েছেলে ইত্যাদির উপর লোভ।

দেবেনদা (রায়)—সব সময় তো এই রকম দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে এই রকম দেখা যায় না, সেখানে বুঝতে হবে, তার ইষ্ট বা গুরুস্থানীয় কেউ আছেন, এবং তাঁর প্রীতি ও প্রতিষ্ঠা-কামনায় ঘুরছে সে। মোদ্দাকথা, মানুষ নিরালম্ব হ'য়ে ঝুলে থাকতে পারে না। সেই ইষ্টস্বার্থীও হবে না, প্রবৃত্তি-স্বার্থীও হবে না, এমনতর হ'তে পারে না। একদিকে ঝোঁক না-থাকলে, আর-একদিকে ঝোঁক থাকবেই।

অনিলদা (সরকার)—ইষ্টকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও পরিবেশের মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করে না, এমনতর লোকও তো অনেক পাওয়া যায়। ইষ্টকে পাওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ-সম্বন্ধে এমন ঔদাসীন্য থাকে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে শুধু নাম কা ওয়াস্তে গ্রহণ করলেই ইষ্টকে পাওয়া হয় না। ইষ্টকে যে পায়, ধীরে-ধীরে ইষ্টের স্বভাব তাকে অল্পবিস্তর পেয়ে বসে। সেও দরদী হয়, সেবাপ্রাণ হয়, পরিবেশের স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। ক্লেশ-সুখপ্রিয় ইষ্টদরদ

নিয়ে পরিবেশের পরিপালন, পরিপোষণ ও পরিপূরণের চেষ্টা নেই, সেজন্য মনের মধ্যে কোন ছটফটানি নেই, অথচ ইষ্টকে ভালবাসে খুব, সে-ভালবাসা প্রায়ই সঙ্কীর্ণ স্বার্থদুষ্ট। নিজের স্বার্থের জন্য ইষ্টকে ভালবাসা ভালবাসার লক্ষণ নয়কো। ইষ্টকে যে ভালবাসে সে ইষ্টস্বার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে নেয়, এবং তার পরিপূরণ যাতে হয় তাই-ই ক'রে চলে। তাই, পরিবেশের মঙ্গলসাধনে সে কখনও নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। কারণ, সে জানে, এই নিশ্চেষ্টতায় ইষ্টার্থই ব্যাহত হবে।

আশুদা (দত্ত)—কেউ যদি কোন বিষয়ে আমাকে কোন আশা-ভরসা দেয় এবং সেই আশা-ভরসার উপর নির্ভর ক'রে আমি কাউকে যদি কোন কথা দিই, এবং পরে যদি সে তার কথা না-রাখে, তাহ'লে সে অবস্থায় আমার কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি কাউকে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট কথা দিয়ে থাক, তাহ'লে সে-কথা তোমার রক্ষা করাই উচিত। সেইজন্য কাউকে কোন পাকা কথা দিতে গেলে হিসাব ক'রে দেওয়া লাগে। অন্যের আশা-ভরসার উপর নির্ভর ক'রে নির্দ্দিষ্ট কথা দেওয়া চলে না। বড় জোর বলা যায়, আমার একজনের কাছ থেকে পাবার আশা আছে, যদি পাই, তাহ'লে তোমাকে দেব।

আশুদা—যে আশা-ভরসা দেয়, সে যদি খুব নির্ভরযোগ্য লোক হয়, তাহ'লেও কি তার কথার উপর দাঁড়িয়ে নির্দ্দিষ্ট কথা দেওয়া যায় না ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত নির্ভরযোগ্য লোকই হোক না কেন, ভবিষ্যতের গর্ভে কী আছে, কারও জানা নেই। অভাবনীয় কত ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অবস্থার চাপে প'ড়ে কথা রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠতে পারে। সেইজন্য কারও কথার উপর নির্ভর ক'রে অন্যকে নির্দ্দিষ্ট কথা না-দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। একটা 'যদি' দিয়ে যদি বল, তাহ'লে অনেকখানি পথ খোলা থাকে। এগুলি অভ্যাসের ব্যাপার। কথা ঠিক রেখে চলতে না-পারলে মানুষের ব্যক্তিত্ব বাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাধারমণদাকে (জোয়ারদার) বললেন—ফন্দী আঁটতিছিস তো মাথায় ?

(শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে সস্তায় স্বয়ংসম্পূর্ণ মজবুত বাড়ি করার পরিকল্পনা করতে বলেছেন।)

রাধারমণদা—আজ্ঞে হ্যাঁ! কিন্তু এখন জিনিসপত্রের যে দাম, তাতে আজকাল কিছু করতে গেলে ঢের খরচ প'ড়ে যাবে। তবে, যখন যে-বাজারই থাক্ না কেন, তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খরচে যাতে ভাল কাজ হয়, সে-ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লেই হ'ল। জিনিসপত্র, মিস্ত্রী, মজুর—সবকিছুই তো আগের

থেকে আল্লা। তার তুমি কী করবা ?

দেবী-ভাই (চক্রবর্ত্তী)—ঠাকুর! ধরুন, আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যদি বুঝি যে চা খাওয়াটা খারাপ, এবং চা যদি আমি নিজে না খাই, সে-অবস্থায় আমি অন্যকে যদি চা খেতে নিষেধ করি, তাহ'লে সেটা কি আমার পক্ষে অন্যায় হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' অন্যায় হবে কেন ? কিন্তু সোজাসুজি নিষেধ না ক'রে, তুমি চা খেয়ে কী কী অসুবিধা বোধ করতে এবং কেন ছাড়লে—তা' বলা ভাল। প্রত্যেকের পক্ষেই চা খারাপ কিনা, এবং খারাপ হ'লেও কোন্-কোন্ অবস্থায় ও কোন্ মাত্রায় খারাপ, আবার তা' কারও-কারও পক্ষে ভাল কিনা, ভাল হ'লেও কোন্ অবস্থায় ও কোন্ মাত্রায় ভাল—এ-সম্বন্ধে তোমার যদি একটা কার্য্য-কারণ-সমন্বিত সুষ্ঠু বুঝ না-থাকে, তাহ'লে শুধু তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে সেই মতটা সবার উপর চাপাতে গেলে অসুবিধার কারণ ঘটতে পারে।

কালীদা (সেন)—আমিষ আহারের বিরুদ্ধে যখন আমরা বলি, তখনও তো এই যুক্তি উঠতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের শরীবের উপর আমিষ-আহারের কী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেটা যদি আমরা বিজ্ঞান-সম্মত পন্থায় জানি, তাহ'লে নিঃসংশয়ে বলা যায়—মানুষের পক্ষে সাধারণতঃ নিরামিষ-আহারই শ্রেয়। আবার, বাঁচার প্রয়োজনে অপরিহার্য্য ক্ষেত্রে কেউ যদি আমিষ গ্রহণ করে, তাহ'লে সেটা যে অন্যায় হবে তা' তো নয়। চায়ের গুণাগুণ-সম্বন্ধে কেউ যদি বোঝে যে মানুষের শরীরের পক্ষে তা' সাধারণতঃ অপকারী, তাহ'লে সে-কথা তো তার সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিতই।

কালীদা—মাছমাংস খাওয়ায় আপত্তির কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীর, মন ও জীবনের পক্ষে যদি ভাল হ'ত, আপত্তি করতে যায় কে ? ভালই তো চাই আমরা, না আর-কিছু ? আমার মনে হয়, মাছমাংসের জৈবকোষের উপাদান আমাদের শরীরে প্রবেশ ক'রে শরীরস্থ জৈবকোষে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও সংঘাত সৃষ্টি ক'রে কোষবিভাজনকে অত্যন্ত দ্রুত ক'রে তোলে। এতে সাময়িক শারীরিক পুষ্টি হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত আয়ুতে টান পড়ে ব'লে মনে হয়। কারণ, স্বাভাবিক নিয়মে যে বাড়তিটা হয়তো কুড়ি বছর ধ'রে হবার কথা, সেটা হয়তো দশ বছরের মধ্যেই হ'য়ে গেল। তারপরই আরম্ভ হয় প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, মাছমাংস খেলে শরীরের মধ্যে একটা বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাতে স্নায়ু ও মস্তিষ্ককোষগুলি চঞ্চল, দুর্ব্বল, স্থৈর্য্য-সাম্য-ও-ক্রমাগতিহারা হ'য়ে ওঠে। সূক্ষ্ম সাড়াগুলি ভাল ক'রে ধরতেই পারে না। একদিন মাছ খেলে অন্ততঃ ২।৩ সপ্তাহ তার জের থাকে। ২।৩ সপ্তাহ

পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ঠিক-ঠিকভাবে আসতে চায় না, কেমন যেন রাহুগ্রস্ত হ'য়ে থাকে। এ আমি নিজে বার-বার পরখ ক'রে দেখেছি। বড়-বড় ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকেরাও আমিষাহারের বিরুদ্ধে এবং নিরামিষ আহারের পক্ষে অনেক কথা বলেছেন। আবার, এর উল্টো কথাও হয়তো পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মনে হয়, যারা উন্নততর জীবন-যাপন করতে চায় ও সুস্থ দেহে, স্বচ্ছন্দ মনে ক্রমাগতি নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করতে চায়, তাদের নিরামিষ খাওয়াই উচিত।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে একবার কাজলভাইয়েব ঘরে গেলেন।

সেখান থেকে এসে বললেন—সরোজিনী! দেখ্ তো কী রান্না হ'চ্ছে।

সরোজিনীমা শ্রীশ্রীবড়মার কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে বললেন মুগের ডাল ও ছানা দিয়ে আলু-পটলের ঝোল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটু হাত পা ছাড়িয়ে শুয়ে আপনমনে গুন্-গুন্ ক'বে একটা গান ধরেছেন। নবমীর চাঁদের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর চাঁদমুখে। ভক্তবৃন্দ অপলকনেত্রে সেই অপরূপ শোভা নিরীক্ষণ করছেন।

২১শে চৈত্র, সোমবার, ১৩৫০ (ইং ৩। ৪। ১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। কাছে অনেকেই আছেন। এমন সময় প্রমথদা (দে) এসে আশ্রমে একটি কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স চালু করার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করতে পারেন। কিন্তু করতে গেলে এমনভাবে করা লাগে, যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। হিসাবপত্র খুব ভালভাবে রাখতে হয়। 'কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স' এই নাম দিলেই যে সংশ্লিষ্ট সকলে সক্রিয় দায়িত্ব নেয় ও সহযোগী হয়, তা' কিন্তু নয়। আপনার মাথায় থাকা চাই যে যা-কিছু দায়িত্ব আপনার উপর। কেউ যদি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা না-করে, তাহ'লে তাকে দোষ দিলে চলবে না। আপনার ভাবতে হবে, তার সহযোগিতালাভের জন্য আপনার কী করণীয় আছে এবং কী করা হয়নি। এইভাবে নিজেকে যদি সম্পূর্ণভাবে দায়ী করেন, তাহ'লে কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স করা চলে। যদি ভেবে বসেন, অন্যেও আপনার মত কর্ত্তব্যবুদ্ধিসম্পন্ন, এবং তার যতটুকু করবার তা' সে করবেই, তাহ'লে কিন্তু ঠ'কে যাবেন। আমাদের দেশে অনেক জায়গাতেই যে কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয় না, তার কারণ উপযুক্ত লোকের অভাব।

প্রমথদা—একক যদি সব দিক্ দেখতে হয়, সব কাজ করতে হয়, তাহ'লে তো

কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার কোন মানে থাকে না। দশজনের সমবেত ও সমবায়ী প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা চালু থাকবে, প্রত্যেকেই তার দ্বারা উপকৃত হবে—এইজন্যই তো কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা। যারা স্বেচ্ছায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমবায় সমিতি গঠন করে, তাদের অধিকাংশ যদি একজনের উপর ভার দিয়ে স'রে দাঁড়ায়, এবং যার উপর নির্ভর করে সে যদি সুষ্ঠুভাবে সব কাজ পরিচালনা করেও, তাহ'লেও তো যারা দায়িত্ব এড়িয়ে স'রে দাঁড়ায়, তাদের কোন শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা হয় না। সে-দিক্ দিয়েও তো তাদের ক্ষতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যে-ক্ষতির কথা বলছেন, সে ক্ষতি সম্বন্ধে যাদের বোধ আছে, তারা তো অমন ক'রে স'রে দাঁড়ায় না। তবে, সবার কাছ থেকে সমান দায়িত্ববোধ আশা করা ঠিক নয়। যে যেমন, সে তেমন। রাতারাতি একটা বৈঠক বা প্রস্তাব ক'রে কোন কাজ আরম্ভ করলেই মানুষের চরিত্র বা অভ্যাস বদলে যায় না। কে কেমন, কার কাছ থেকে কতখানি আশা করা যেতে পারে, সে-সম্বন্ধে একটা বুঝ থাকা চাই। তবে একজনের এমন সঙ্কল্প থাকা চাই যে কেউ যদি কিছু না-ও করে, সে-ই সব করবে, কিছুতেই হটবে না। ঐ রকম একজন থাকলে, সেই-ই হয় ঐ সংস্থার প্রাণ। তার প্রেরণা ও দৃষ্টান্তের ভিতর-দিয়ে অন্য যাদের তৈরী হবার মত সম্পদ্ আছে, তারা তৈরী হ'য়ে ওঠে।

প্রমথদা—যার অতখানি শক্তি-সামর্থ্য আছে, সে সমবায়-প্রথায় কাজ-কারবার করতে যাবে কেন? সে তো স্বাধীনভাবে কাজ-কারবার করবে। কারণ, তাতে কাজটা তার ব্যক্তিগত অধিকারে থাকবে এবং সম্পূর্ণ লাভটা সে একাই উপভোগ করতে পারবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবেশের ভিতর যদি যোগ্যতা সঞ্চার ক'রে তাদের উন্নত ক'রে তোলা যায়, তাহ'লে লাভ বই ক্ষতি নেই। কারণ, পরিবেশকে বাদ দিয়ে বা উপেক্ষা ক'রে একটা লোক একক যদি উন্নত হয়, তাহ'লে পরিবেশ তার প্রতিকূল হ'য়ে ওঠে। আবার, পরিবেশ যদি দুর্ব্বল ও দুঃস্থ হ'য়ে পড়ে, তাহ'লে সবল ও ধনী যে, তারও আহরণের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকে। ধরেন, মানুষ একসময় খুব লম্বা সুদে টাকা ধার দিত। যাদের ঐভাবে ধার দিত, তাদের মঙ্গলা-মঙ্গলের দিকে না-চাওয়ায় কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে গেছে; আর আজ ঋণসালিশী বোর্ড ক'রে এমন আইন ক'রে দিয়েছে যে সুদখোররাই অসুবিধায় প'ড়ে গেছে। ব্যক্তিগত কাজ-কারবারে যে কোন দোষ আছে, তা' নয়। কিন্তু পরিবেশের দিকে না চাইলে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে। শেষ পর্য্যন্ত নিজেরই ক্ষতি হবে।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—পরিবেশের স্বার্থের দিকে না চাইলে বা পরিবেশকে উন্নত ক'রে না-তুললে যে নিজেরই ক্ষতি, সেটা অনেকেই তো বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝতে যে পারে না, সে তো দূরদর্শিতা ও জ্ঞানের অভাব। কিন্তু বুঝতে পারুক আর না পারুক, ফল যা' হবার তা' ধীরে-ধীরে হ'তেই থাকে। একলা ভাল থাকার উপায় ভগবান্ ক'রে দেননি পৃথিবীতে। ভাল থাকার যোগান পেতে হয় যে-পরিবেশের থেকে সেই পরিবেশ যদি ভাল না থাকে, তবে আমার ভাল থাকা দাঁড়াবে কিসের উপর? পরিবেশকে যদি টেনে না-তুলি, পবিবেশই আমাকে টেনে নামাবে। সেইজন্য যাজন-সেবায় পরিবেশকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত ক'রে তোলার চেষ্টায় না-থাকলে ধর্ম্মহানি হয়। ধর্ম্মহানি মানে বাঁচাবাড়ার হানি। বাঁচাবাড়ার ব্যাপারে পরিবেশের সঙ্গে যে কি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তা' নিজেরা ভাল ক'রে বোঝ, অন্যকেও ভাল ক'রে বোঝাও। মানুষ বুঝতে না-পেরে অনেক ভুল করে, সেই অবুঝ অবস্থাটা ঘুচিয়ে দাও। মনে রেখ—টাকা যদি সম্পদ্ও হয়, তবু তা' প্রাণহীন সম্পদ্, আর মানুষ হ'ল জীয়ন্ত সম্পদ্। এই জীয়ন্ত সম্পদের সমাদরে যেন কোন ত্রুটি না হয়। একটা সাধারণ মানুষও যদি উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে, সে যা' পারে, তার তুলনা হয় না।

এরপর খগেনদাকে (তপাদার) বললেন—কন্‌ফারেন্স আসছে। কাজকাম যা' করা লাগে খেপু, কেষ্টদা, প্রমথদা, বঙ্কিম—এদের কাছে শুনে এখন থেকে করতে থাক। এই কন্‌ফারেন্সে অনেক লোক হয়। দেখো, কারও যেন কোন অসুবিধা না হয়।

খগেনদা—আচ্ছা।

গুরুদাসদা (ব্যানার্জ্জী)—আমাদের কাছে অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আপনাদের আশ্রমে যেমন পল্লী-উন্নয়ন-পরিকল্পনা রূপায়িত ক'রে তুলেছেন, আপনারা বাইরে গিয়ে তা' না ক'রে শুধু দীক্ষা দিয়ে বেড়ান কেন? আপনাদের আশ্রমে যেমন করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় তেমন যদি করেন, তাহ'লে তো লোকের খুব উপকার হয়। কিন্তু সেদিকে তো আপনাদের নজর দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু করতে গেলেই চাই লোকগুলির মধ্যে একটা বন্ধন। দীক্ষাই হ'ল সেই বন্ধন। তার ভিতর-দিয়ে আসে পারস্পরিকতা, সঙ্ঘবদ্ধতা। তখন প্রত্যেকেরই বুদ্ধি হয় অপরকে দেখা, অপরের জন্য করা। যার যেমন বৈশিষ্ট্য, যার যেমন ক্ষমতা, সে তেমনি করে। এর ভিতর-দিয়ে প্রয়োজনবশে যেখানে যেমন গজিয়ে ওঠা সম্ভব, সেখানে তেমনি গজিয়ে ওঠে। আশ্রমেও যা' হবার ঐভাবে হয়েছে। কিন্তু লোকের মাথায় ধরিয়ে দেওয়া লাগে, পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমাবেশ

করিয়ে দেওয়া লাগে—একেই বলে সংগঠন। তাই, উপযুক্ত organiser (সংগঠনকর্ম্মী ও উপযুক্ত initiates (দীক্ষিতগণ)-এর যোগাযোগ যদি হয় এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা যদি থাকে, তাহ'লে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন-বিষয়ক কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান তো নানাজায়গায় গ'ড়ে উঠতেই পারে। কিন্তু তোমরা যে-কাজ করছ, সেইটে হ'ল মূল কাজ। মানুষ যদি ইষ্টপ্রাণ হয়, সুনিয়ন্ত্রিত হয়, অনুসন্ধিৎসু সেবাপরায়ণ হয়, তবে সে সমাজের একটা মস্ত asset (সম্পদ্) হ'য়ে ওঠে। সে যেখানে থাকে, তাকে দিয়েই লোকের উপকার হয়। তোমাদের চরিত্র, অভ্যাস, ব্যবহার এমনতর হওয়া চাই, যা' মানুষকে দেবত্ব-অভিমুখী ক'রে তোলে। সত্তাপোষাণী কুলাচার ও ঐতিহ্য যার যা' আছে, সেগুলি যাতে পরিপালিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। প্রকৃত যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি যাতে প্রত্যেকের মজ্জাগত হ'য়ে যায়, তা' করবেই কি করবে। আর, প্রত্যেকেই যাতে গুরুভাই ও বৃহত্তর পরিবেশের সাধ্যমত সেবা করে, তা' করাই চাই। শুধু মুখে বললে হবে না, এগুলি নিজেরা করতে হবে, অন্যকে দিয়ে করাতে হবে। এ-ছাড়া নিস্তার নেই। আর, বিভিন্ন বিষয়ে আমার যা' বলা আছে, সেগুলি যাতে সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। বইপত্রগুলি নিজেরা ভাল ক'রে পড়তে হয়, অন্যকে দিয়েও পড়াতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা করতে হয় এবং যে-যে বিষয়ে এখনই যা'-যা' করা সম্ভব তা' করা সুরু ক'রে দিতে হয়। শত-শত লোকে বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের শহরে-শহরে ও গ্রামে-গ্রামে গিয়ে এগুলি যদি করতে থাক, তাহ'লে গ্রামের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। তখন প্রত্যেকটি মানুষ হবে প্রত্যেকটি মানুষের জন্য, প্রত্যেকটি শহর ও গ্রাম হবে প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামের জন্য, প্রত্যেকটি জেলা হবে প্রত্যেকটি জেলার জন্য, প্রত্যেকটি প্রদেশ হবে প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য, প্রত্যেকটি সম্প্রদায় হবে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের জন্য, প্রত্যেকটি সমাজ হবে প্রত্যেকটি সমাজের জন্য।

বরিশালের একটি দাদা এসেছেন। তিনি খুব ভাল ঢোলক বাজাতে পারেন। সেইকথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব প্রীত হ'য়ে বললেন—আরো ভাল ক'রে শিখবা। একেবারে চরমে যাওয়া চাই। ভাল ওস্তাদ পেলে তার কাছ থেকে যতটুকু পার শিখে নেবা। এ-সম্বন্ধে কোন বইপত্র থাকলে তাও পড়বা। কোন জিনিস শিখলেই কিন্তু শেখা হ'য়ে গেল না। শেখার অন্ত নেই। বাজনার আরো নতুন-নতুন বোল ও গৎ বের করতে পার কিনা, সে চেষ্টাও করবা। আর, নিজে যেমন শিখবা, অন্যকেও তেমনি শেখাবা। ছেলেপেলেদের মধ্যে এই বিদ্যেটা যদি চারিয়ে দিতে পার, তাহ'লে ভাল হয়। মানুষ যদি বংশপরম্পরায় কোন বিশেষ জিনিসের চর্চা করে, তাহ'লে সেটা

ক্রমেই ফুটে উঠতে থাকে। অবশ্য, বিয়ে ঠিকমত হওয়া লাগে! সঙ্গতিশীল ঘরের সঙ্গতিশীল প্রকৃতির মেয়ে যদি হয় আর ঐ স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যদি প্রবল শ্রদ্ধা ও নেশা থাকে ও তার গুণপনায় যদি মুগ্ধ হয়, তাহ'লে তার গর্ভের সন্তানের মধ্যে পিতার গুণাবলী সংক্রামিত হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

বীরেনদা (মিত্র)—পিতার বিশেষ গুণগুলি তো অনেক সময় সন্তানের মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার অনেক কারণ থাকে। মানুষ যদি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ থেকে কোন গুণ acquire (অর্জ্জন) না ক'রে, inferiority (হীনম্মন্যতা) ও ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) থেকে তা' করে, তাহ'লে তাতে কৃতিত্ব অর্জ্জন করলেও সেটা কিন্তু তার সত্তার সঙ্গে মিশে যায় না। আবার, শ্রদ্ধা ও আগ্রহজনিত অনুশীলনের ফলে কোন গুণ যদি তার সত্তায় গেঁথেও যায়, তাও সন্তানে বর্ত্তাতে পারে না, যদি বিবাহ ও দাম্পত্যজীবন সুপরিচালিত না হয়। আবার, সন্তানের যে inherent trait (অন্তর্নিহিত গুণ) থাকে, তারও unfurlment (বিকাশ)-এর জন্য যে nurture (পোষণ) প্রয়োজন, তাও যদি উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত রকমে না দেওয়া যায়, তাতেও ভিতরে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তা' প্রকাশ পায় না। সেইজন্য সব দিকেই নজর দিতে হয়।

বীরেনদা—সব দিকে নজর দেওয়া বলতে আমাদের কী-কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুগোপযোগিভাবে বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, দশবিধ-সংস্কার ইত্যাদি পরিপালন ক'রে চলতে হবে। ও-সবের ভিতর-দিয়ে মানুষের সহজাত-সংস্কারগুলি বংশপরম্পরায় বজায় থাকবে ও মানুষ সুশিক্ষিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুযোগ্য হ'য়ে উঠবে।

প্রকাশদা (বসু)—বর্ণানুযায়ী কর্ম্ম তো আজকাল অনেকেই করে না এবং করার সুযোগ পায় না। করলে পেটও চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণানুযায়ী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যেখানে জীবিকা অর্জ্জন সম্ভব নয়, সেখানে অন্য কর্ম্মের সঙ্গে বর্ণানুগ কর্ম্মের অনুশীলনটা অন্ততঃ বজায় রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া বর্ণানুযায়ী অর্থাৎ সহজ সংস্কারানুযায়ী কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে জীবিকা আহরণ ব্যক্তির নিজের এবং সমাজের পক্ষেও তো লাভজনক ও সুবিধাজনক। আর, বিয়ের ব্যাপারে যাতে কোন ব্যতিক্রম না হয়, অন্ততঃ সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। ঐটে ঠিক থাকলে instinct (সহজাত সংস্কার)-এর spine (মেরুদণ্ড)-টা ঠিক থাকে। বোঝা যায়, একটা মানুষ কি না কি! সে এমনতর একটা বহুরূপী হ'য়ে ওঠে না, যার আসল রূপটা তার নিজের কাছে বা অন্যের কাছে ধরাই পড়ে না। তাই

ঐ তাদের দিয়ে বরং কিছু আশা করা যায়।

বরিশালের ঐ দাদাটিকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুই তো ঢোলক বাজাস ভাল। দেখিস তো—রকমারি চামড়া ও রকমারি জিনিসের রকমারি সাইজের খোলের সমাবেশ ক'রে নূতন-নূতন ধরনের ঢোলক করা যায় কিনা, যার বাজনা হবে আরো মিষ্টি, আরো গম্ভীর, আরো বিচিত্র।

দাদাটি বললেন—আমি তো ও-সম্বন্ধে কিছু জানি না। তৈরী ঢোলক বাজার থেকে কিনি, আর তাই বাজাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খোঁজ নেওয়া ভাল। জানা ভাল। কোন কিছু ভাল ক'রে শিখতে গেলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি-সম্বন্ধে যদি ভাল জ্ঞান থাকে, তাতে নিজের শিক্ষাটা সম্পূর্ণ হয়। আব, শেখার মধ্যে যদি একটা উদ্ভাবনী ও গবেষণী বুদ্ধি থাকে, তাহ'লে শেখার পরিশ্রমটা তো কষ্টকর ব'লে মনে হয়ই না, বরং অফুরন্ত পরিশ্রম ক'রেও ক্লান্তি আসে কমই। একটা নেশার মত পেয়ে বসে যে নূতন ও উন্নততর কিছু বের করতেই হবে। তাতে অন্যের কিছু হোক বা না-হোক, নিজেরই উপকার হয়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে রোদের তাপও প্রখর হ'য়ে উঠছে। আশ্রমের পূর্বদিকের বাগানে একটি কোকিল কুহুতানে চতুর্দ্দিক মুখরিত ক'রে তুলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দৃষ্টি ওদিকে আকৃষ্ট ক'রে বললেন—কোকিল বেটা মনের আনন্দে ডেকে চলেছে। মানুষের খুশির জন্য পরমপিতা কত ব্যবস্থাই ক'রে রেখেছেন। কিন্তু মানুষ সেদিকে নজর দেয় কমই।

হরিশদা (গুণ)—ঐ খুশিতে তো মানুষের পেট ভরে না, তাই ওদিকে নজর দেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেট ভরতে গেলে কাজ করতে হয়, আর সেই-ই ভাল ক'রে কাজ করতে পারে যার মনে আনন্দ আছে। কষ্টের মধ্যেও সে আনন্দ খুঁজে পায়। তাই জীবন-সংগ্রামে যুঝতে পারে ভাল ক'রে। আর, এই আনন্দের তহবিল বাড়াতে গেলে প্রকৃতি ও পরিবেশের থেকে তো আহরণ করতে হয়। যেমন আহরণ করতে হয়, তেমনি তা' বিতরণ করতে হয়। তবেই জীবন উচ্ছল হ'য়ে চলে—উৎসাহ-উদ্দীপনার প্রাচুর্য্যে। দেখ—যারা পরিবেশের আনন্দে সাড়া দিতে পারে না, দশজনের সঙ্গে খোলামেলাভাবে আনন্দ করতে পারে না, তারা কিন্তু ধীরে-ধীরে মিইয়ে যায়। তাদের কর্ম্মশক্তিও নিস্তেজ হ'য়ে আসে এবং পেটও ভরে না। আবার, একজন যতই কাজের লোক হোক না কেন, তার মধ্যে যদি কোন রসকষ বা স্ফূর্ত্তি না-থাকে, মানুষকে প্রীত করার বুদ্ধি না-থাকে, তাহ'লে লোকে কিন্তু তাকে পছন্দ করে না। লোকের প্রীতি

যে অর্জ্জন করতে পারে না, সেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় কম না। আবার, দারিদ্র্যের সঙ্গে কাজকর্ম্ম না ক'রে শুধু অলসভাবে স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়ায় যারা, তাদেরও কোন দাম থাকে না। কাজও চাই আর সেই সঙ্গে-সঙ্গে চাই—মানসিক প্রফুল্লতা যাতে বজায় থাকে ও বৃদ্ধি পায় তাই করা।

কালিদাসদা (মজুমদার)—মানুষ পরিবেশের আনন্দে সাড়া দিতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের প্রকৃতি এক-একরকম, কেউ-কেউ স্বভাবতঃই বিষণ্ণ বা গম্ভীর প্রকৃতির। আবার, কেউ-কেউ নিজেদের সুখদুঃখ নিয়ে এতই অভিভূত থাকে যে সেই অভিভূতি কাটিয়ে উঠে অন্যদিকে মনোযোগ দিতে পারে না। আবার, অনেকের ভিতর থাকে দ্বেষ, ঈর্ষ্যা,—যার দরুন অন্যের কৃতিত্ব, উন্নতি ও আনন্দে খুশি হওয়া দূরে থাকুক, বরং ভিতরে-ভিতরে একটা জ্বালা বোধ করে। এইরকমটা খুব খারাপ। তুমি যত দুঃখের মধ্যেই থাক, অন্যের সুখে সুখী হওয়ার মত মনোবৃত্তি যদি তোমার থাকে, পরসুখকাতরতা বা পরশ্রীকাতরতা তোমার যদি আদৌ না-থাকে, তাহ'লে তা' তোমার দুঃখের নিরাকরণে যে সহায়ক হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, পরশ্রীকাতরতার মধ্যেই থাকে পরের দোষানুসন্ধানে আগ্রহ, নিজের দোষ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, হীনম্মন্যতা ও সঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ পরকে আপন ব'লে বোধ করতে না-পারা। এগুলি দুঃখেরই সহচর।

রজনীদা (দাস)—একজন বড়লোক বা সুখীলোক যদি আমাকে আপন ব'লে বোধ না-করে, তাহ'লে তাকে আমি আপন ব'লে বোধ করব কিভাবে? সে আমাকে যেমন পর-পর ভাবে, অবহেলা করে, আমারও তো তার প্রতি তেমনিভাব আসবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে যদি তোমাকে অবহেলা করে, সেটা যেমন তার পক্ষে অন্যায়, আর সেইজন্য তুমি তার প্রতি যদি বিদ্বেষভাব পোষণ কর, তাহ'লে সেটাও তোমার পক্ষে তেমন অন্যায়। অন্যের দোষের প্রতিক্রিয়ায় তুমি যদি নিজেকে দুষ্ট হ'তে দাও, তাহ'লে তুমি নিজের বা পরিবেশের পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারবে না। তোমাকে দিয়ে দোষের নিরসন হবে না, দোষ গুণিত হ'য়েই চলবে। তুমি নিজে একটা পঙ্ককুণ্ড হ'য়ে উঠবে। তাই, অন্যের দোষে দুষ্ট না-হ'য়ে যেখানে যেমন শোভন ও সমীচীন তেমনতরভাবে তোমার আদর্শসম্মত করা, বলা ও ভাবা নিয়ে চলবে। সব সময় ভাববে—আমার ঠাকুর এ-অবস্থায় কী করতে বলেন, আর সেইভাবে চলবে। পারিপার্শ্বিক তো তোমার আদর্শ নয় যে তাদের আচরণ অনুসরণ ক'রে চলবে। তোমার অনুসরণীয় যিনি, তাঁকে অনুসরণ ক'রেই চলবে এবং তা' প্রতি পদক্ষেপে। এই চলনে

যদি চল, তাহ'লে নিজেও বাঁচবে, অন্যকেও বাঁচাতে পারবে। তবে অন্যায় বা অসৎ-এর নিরোধে বুদ্ধি, বিবেচনা ও বীর্য্য-সহকারে যেখানে যা' করণীয় তা' কিন্তু করতেই হবে। আর, সৎ-এর সংহতি যাতে বাড়ে, সেজন্যও চেষ্টা করতে হবে।

দুর্গানাথদা (সান্যাল) ভাল একটা ইঁচড় নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে খুশি হ'য়ে বললেন—যান, বাড়ির ভিতর দিয়ে আসেন গিয়ে।

দুর্গানাথদা বাড়ির ভিতর গিয়ে ইঁচড়টা শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে আসলেন। বিষয়-সম্পত্তির কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—হরিদাসভাই (ভদ্র) কী করছে, তা' তো বুঝতে পারি না। অথচ এতে খরচের তো অন্ত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকা যায় যাক। কিন্তু আমি ভাবি, ও যেন এ-কথা বলতে না-পারে—আমি এত বড় একটা কাজ করতে পারতাম, কিন্তু যোগান পেলাম না ব'লে করতে পারলাম না। ওর মনে তো খুব আশা যে কাজ হাসিল করবেই।

দুর্গানাথদা—আপনার কী মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—আমি কি অতশত বুঝি! হ'লাম আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কী জানি?

ঠোঁটটি উলটিয়ে ডান হাতখানি ঘুরিয়ে এমন ক'রে বললেন যে সেই বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে ফেললেন। পরক্ষণেই বললেন—হরিদাস খাটতিছে কিন্তু খুব।

এরপর ঐ প্রসঙ্গে ছেদ পড়ল। শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তামাক খেয়ে বাড়ির ভিতর গেলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নাট্যমণ্ডপের পাশে এসে বসেছেন। কাছে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শচীনদা (গাঙ্গুলী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), মনোহরদা (বসু), হেমদা (শাস্ত্রী), প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী), কালুদা (আইচ), অক্ষয়দা (দেব), শরৎদা (কর্ম্মকার), সুবোধদা (সেন), জিতেনদা (চ্যাটার্জ্জী), জগন্নাথদা (রায়), শিশিরদা (ভৌমিক), ভারতদা (পাট্টাদার), মণিদা (ঘোষ), অনিল (চক্রবর্ত্তী), বিজয়দা (রায়), মহিমাচরণ দে, গোসাঁইমা, সরোজিনীমা, সুরবালামা, রেণুমা, অমূল্যদার মা, অমিয়মা, চারুমা, পশুপতির মা, বিন্দুমা, সরলামা, ফুলমা, কালিদাসদার মা, গৌরীমা, মঙ্গলামা, কুমিল্লার মা প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—একটা মানুষকে আপনি যতক্ষণ তোয়াজ ক'রে চলেন, ততক্ষণ সে আপনাকে সেবা, যত্ন ও আদর করে। আর, যেই তোয়াজে একটু খাঁকতি প'ড়ে যায় বা সঙ্গত কারণে গালমন্দ করেন, অমনি যদি অন্যমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহ'লে বুঝে নেবেন—সে কিন্তু আপনাকে চায় না, চায় আপনার তোয়াজ বা দেওয়া-

খোয়া। আপনাতে অনুরক্ত যে, আপনার বিরূপ ব্যবহারে সে কিন্তু আপনাকে খুশি করবার জন্য আরো আপ্রাণ ও উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। তার অভিমান জাগে না, অনুতাপ জাগে। ভাবে, 'আমার কোথায় যেন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে,' আর তা' ঠিক করতে চেষ্টা করে। এমনতর একটা সম্পর্ক না-থাকলে, তাদের সঙ্গে চ'লে সুখ পাওয়া যায় না।

কেষ্টদা—প্রীতির সম্পর্ক যদি থাকে তাহ'লে একে অপরকে সামান্য কারণে ভুল বোঝে না। সম্পর্কটা যেখানে স্বার্থের সেখানে পানের থেকে চুন খসলেই সর্ব্বনাশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' ঠিক। কিন্তু মানুষ এইটেই বোঝে না যে প্রীতির ভিতর-দিয়ে স্বার্থ সব চাইতে বেশি বজায় থাকে। ভালবেসে কারও জন্য করার ভিতর-দিয়ে নিজেরই যোগ্যতা বেড়ে ওঠে, আর সেই তো মস্ত লাভ। বিশেষ ক'রে কেউ যদি প্রকৃত ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাপন্ন হ'য়ে চলে, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও নানারকমের প্রাপ্তি এসে তাকে ঠেসে ধরে। কিন্তু তাতে তার নজর ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যদি স্বার্থঝোঁকা হ'য়ে পড়ে, তখনই সে পতিত হ'য়ে যায়। অনেক ভক্ত সেইজন্য ঐশ্বর্য্য কামনা করে না, ভাবে, ঐশ্বর্যের মোহে পাছে ভগবানকে ভুলে যায়। কিন্তু চরিত্রের ঐশ্বর্য্য কিছু-না কিছু বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য আমন্ত্রণ করেই।

কিছু সময় সবাই চুপচাপ আছেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন —কন্‌ফারেন্সের জন্য ভাল ক'রে তৈরী হচ্ছেন তো?

কেষ্টদা—হ্যাঁ!

কথায়-কথায় কেষ্টদা বললেন—আমি দেখি, মানুষের ভাল করে যারা, তাদেরই শত্রু হয় বেশি। কারণ, তাদের কাছে মানুষের প্রত্যাশার অন্ত থাকে না, আর সবার সব প্রত্যাশা পূরণ করাও যায় না; কিন্তু যখনই প্রত্যাশাপূরণে বাধা হয়, তখনই মানুষ পূর্ব্বের শত পাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে ঘোঁট পাকাতে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমার ধারণা, মানুষের ভাল করতে গেলে সাধারণতঃ তাদের ভিতর নেওয়ার বুদ্ধির পরিবর্ত্তে দেওয়ার বুদ্ধি সঞ্চারিত করা দরকার। তাতেই মানুষেব যোগ্যতা বাড়ে। আমার বাবার খুব বিচক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলতেন, মানুষের উপকার করা ভাল, কিন্তু এমনভাবে উপকার করতে হয়, যাতে সেই উপকারটাই পাছে নিজের উপর ক্ষতি টেনে আনার কারণ না হয়। তাই, ইষ্টনিষ্ঠ ও চতুর না হ'লে লোকের ভাল করতে গিয়েও মন্দ হ'য়ে যায়। কেষ্টঠাকুরকে বলে চতুর-চূড়ামণি। কোন্ মানুষটাকে, কোন্ situation (অবস্থা)-টাকে কেমন ভাবে deal (পরিচালনা) করতে হবে, কিভাবে তার শুভনিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার কলা-

কৌশল তাঁর নখদর্পণে। শিশুপাল আজীবন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে। কিন্তু শিশুপালের মা'র কাছে শ্রীকৃষ্ণের কথা দেওয়া ছিল যে তার একশত অপরাধ পর্য্যন্ত ক্ষমা করবেন। শত অপরাধ ক্ষমা করার পর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের শেষে ভীষ্মের নির্দ্দেশমত শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের অর্ঘ্যদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় যখন শিশুপাল তার বিরুদ্ধাচরণ করে, তখন শ্রীকৃষ্ণ অগত্যা তাকে বধ করেন। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে এই ব্যাপারটি ঘটে যে, শ্রীকৃষ্ণের পরম শত্রুও তাঁকে দোষ দিতে পারে না। তিনি যেন বিশিষ্ট রাজন্যবর্গের ইচ্ছার মর্য্যাদা রক্ষার্থে এই কাজ করতে বাধ্য হন। আর শিশুপালকে যে তিনি বধ করেন, সে ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য নয়। সে ধর্ম্ম ও কৃষ্টির শত্রু, সমাজের অকল্যাণকারী, এবং তার এই দানবীয় প্রকৃতি কিছুতেই বদলাবার নয়, তার বেঁচে থাকা মানে লোকের ক্ষতি, তাই তিনি তাকে বধ করেন। তাঁর প্রত্যেক কাজের পিছনেই ছিল কুশলকৌশলী মঙ্গলবুদ্ধি।

কেষ্টদা—শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বও কম ছিল না। বকাসুর বধ, অঘাসুর বধ, কালীয় দমন, কংস বধ—সব ব্যাপারেই তাঁর অসামান্য সাহস ও বীর্য্যের পরিচয় দেয়। কংস শ্রীকৃষ্ণকে মারবার জন্য দু'জন মল্লযোদ্ধাকে লাগান, একটা হাতীকে লাগান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শারীরিক বলের কাছে তারা লাগে না, তিনিই তাদের মেরে ফেলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাজবেশ ও মালাচন্দন গ্রহণ, কংসের রক্ষীদের নিধন, কংস নিধন—সব ব্যাপারই এমন দ্রুততালে চকিতে ক'রে ফেলেন যে সবাই হকচকিয়ে যায়। আবার, কংসকে মেরে কিন্তু নিজে রাজা হলেন না। উগ্রসেনকে কারামুক্ত ক'রে তাঁকেই মথুরার সিংহাসনে বসালেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকে চ'লে গেছেন। এখন জায়গাটি নীরব ও নিস্তব্ধ। শুক্লা দশমীর রাত। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারখানিতে ব'সে গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবছেন।

অনেক সময় পরে বীরেনদা বললেন—রাত হয়েছে, এইবার উঠবেন নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনার্ত্ত কণ্ঠে বললেন—আমি যখন এদিক্ থেকে উঠে আশ্রমের দিকে যাই, মনে হয়—আমি কোথায় যাচ্ছি? রোজ সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে, মনে হয়—কেন আমি ঘুম থেকে জাগলাম! কত সময় মনে হয়—মা বুঝি আসবেন এখনই, পরক্ষণেই মনে হয়—মা তো নেই!

৩০শে চৈত্র, বুধবার, ১৩৫০ (ইং ১২।৪।১৯৪৪)

সম্প্রতি ২৪তম ঋত্বিক্-অধিবেশন শেষ হয়েছে। এখনও কর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই

উপস্থিত আছেন। সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে এসে বসেছেন, মুখে তাঁর শুভ্র হাসিটি লেগেই আছে। বহু দাদা এবং মায়েরা তাঁকে ঘিরে আনন্দের মধুচক্র রচনা করেছেন। নানাবিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'চ্ছে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের অমিয়মধুর বাক্যালাপে সকলেরই অন্তর এক নবীন ভাবরসে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠছে।

বিপিনদা (সেন) কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—অনেক সময় খুব ভাল যাজন সত্ত্বেও মানুষ দীক্ষা নেয় না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর ক্ষুধাটা জাগা চাই। তা' না-হ'লে কি শুধু যাজন শুনে দীক্ষা নেয় ? অবশ্য যে-যাজন সদ্‌গুরু গ্রহণের আগ্রহ জাগিয়ে দিতে পারে, তাই-ই প্রকৃত যাজন। শুধু জ্ঞান থাকলে হয় না। ভাব চাই, চরিত্র চাই, ইষ্টে actively charmed (সক্রিয়ভাবে মুগ্ধ) থাকা চাই, উন্মাদনা চাই। নিজের সত্তা ইষ্টানুরঞ্জনায় রঞ্জিত হ'লেই অন্যের সত্তাকে রঞ্জিত ক'রে তোলা যায়। অনেক সময় superfine (অতি সূক্ষ্ম) যাজনে দীক্ষা হয় না, কিন্তু মেঠো যাজনে দীক্ষা হয়। কারণ, তার ভিতর প্রাণের স্পর্শ থাকে। আবার, সবাই যে দীক্ষা নেবে তার কোন মানে নেই। আপনাদের যাজনে যদি মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, স্বামীভক্তি, শিক্ষক ও গুরুজনের প্রতি ভক্তি চারিয়ে যায়, তাতেও উপকার হবে ; তবে সেগুলিও সার্থক হওয়া চাই ইষ্টে।

জিতেনদা (রায়)—আপনি তো এত বলেন, কিন্তু লোকের মাথায় তো ঢোকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—আগে নিজেদের মাথায় ভাল ক'রে ঢুকেছে কিনা সেইটে ভেবে দেখতে হয়। মাথায় ঢোকার পরখ হ'ল তদনুযায়ী কর্ম্ম-ব্যাপৃতি। প্রত্যেকের নিজের মত ক'রে করা লাগে। করাটা যদি আমার হ'ত, তাহ'লে তো কথা ছিল না, কিন্তু করাটা যে আপনাদের।

একটি দাদা একজন ঋত্বিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন যে, তিনি তাঁর কাছে নিজের কতকগুলি চারিত্রিক দুর্ব্বলতার কথা খ্যাপন করেন, কিন্তু পরে ঐ ঋত্বিকের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি ঐ-সব গোপন কথা যাকে-তাকে ব'লে বেড়ান এবং এতে তার মানমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (ক্ষোভের সঙ্গে)—এমনতর যদি হ'য়ে থাকে সে খুব খারাপ কথা। এতে তোমার ক্ষতি যতটুকু হোক বা না-হোক, তার ক্ষতিই হবে বেশি। এমনতর করা এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা। এতে নিজেই সে ঋত্বিক্‌ হিসাবে মর্য্যাদা হারাবে। মানুষের ন্যস্ত বিশ্বাস নষ্ট করলে চরিত্রের কোন দাম থাকে না। আমি ভাবি—ঋত্বিক্‌ হবে মানুষের সহায়, সম্পদ্‌ ও দুর্গ স্বরূপ। সে যদি এমন পাতলা মানুষ হয় তাহ'লে

তো বড় বিপদের কথা। ঋত্বিক্ কেন, কারও এরকম করা উচিত নয়। তবে কারও-কারও বুদ্ধি-বিবেচনা তুখোড় নয়, কোথাও কোন্ কথা বলা উচিত বা উচিত নয়, তা' ঠিক পায় না। হিসেব না ক'রেই কথা বলে। সেটাও খারাপ এবং তার ফলও খারাপ হয়। কিন্তু এমনতর বলার পিছনে কোন খারাপ মতলব থাকে না। যার সম্বন্ধে বলছিস, সেও এমনতরভাবে ব'লে থাকতে পারে। মোকাবিলায় মিলালে ঠিক পাওয়া যায়—আদত ব্যাপারটা কী। অনেকে পারস্পরিক শত্রুতা ও অমিল বাড়াবার জন্য একজনের কথা আর-একজনের কাছে অতিরঞ্জিত ও বিকৃত ক'রে বলে। সে-সব কান-কথার উপর নির্ভর ক'রে বন্ধুবিচ্ছেদ হ'তে দিতে নেই। দুষ্ট লোকের কথায় বিভ্রান্ত হ'য়ে কাউকে ভুল না বোঝ বা কারও উপর অবিচার না-কর সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কোন ব্যাপার শুনেই তৎক্ষণাৎ একটা সিদ্ধান্ত ক'রে নেবে না। আগে সত্য নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা করবে। ভাববে, যার বিরুদ্ধে শুনছ তার স্বপক্ষে কী-কী ভাববার আছে।

দাদাটি বললেন—আমার যদি কোন জিনিস প্রত্যক্ষ জানার মধ্যে থাকে, সেখানে তো মোকাবিলা করার কিছু থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যক্ষ কিছু দেখলেও তার উদ্দেশ্য ও কারণ না-জানলে সে-সম্বন্ধে কিছু বোঝা যায় না। একজনকে হয়তো দেখলে যে সে একজন মাতালের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করে। তা' দেখে লোকটা-সম্বন্ধে তুমি যদি ধারণা ক'রে বস যে মাতালের সঙ্গে যখন অত খাতির, তাহ'লে তারও বোধহয় নেশা করার অভ্যাস আছে, তাহ'লে সেটা কি সব ক্ষেত্রে ঠিক হবে? হয়তো দেখা যাবে, লোকটা সৎপ্রকৃতির এবং মাতালের সঙ্গে মেশে তাকে শোধরাবার জন্য। তাই চিন্তা ও বিচার ক'রে না-দেখলে ঠকতে হয়।

দাদাটি বললেন—তবে আমি আপনার কাছে যে-কথা বললাম, সে-সম্বন্ধে আমি ভাল ক'রে খোঁজ নিয়েছি, কেবল মোকাবিলাটা করিনি তিক্ততার সৃষ্টি হবে এই ভয়ে। যাদের কাছে তিনি বলেছেন, তেমন দুই-একজনও এখানে উপস্থিত আছেন। আপনি চাইলে আপনার সামনেও মোকাবিলা হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা! আমি আগে ওর কাছে শুনি। দরকার হ'লে তোদেরও ডাকবোনে।……ও কি এখন আছে ধারে-কাছে?

দাদাটি বললেন—না! তিনি পাবনা-শহরে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ভুলে যাই, আমাকে পরে মনে করিয়ে দিস।

খগেনদা (মৌলিক)—আমার শরীরটা মাঝে-মাঝে খুব রুক্ষ মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন রে ? পায়খানা পরিষ্কার হয় তো ?

খগেনদা—তা' তেমন ভাল হয় না ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুড় দিয়ে তেঁতুলের সরবৎ ও খাবার পাতে ঘোল খেয়ে দেখতে পারিস। টাটকা শাক-পাতা ও ফল খাবি। খুব ভাল ক'রে তেল মেখে স্নান করবি। আর মেজাজ রুক্ষ করবি না, ওতেও শরীর রুক্ষ হয়।

নগেন ব'লে একটি আই-এ ক্লাসের ছাত্র বলল—ঠাকুর! আমি পরের বাড়িতে থেকে পড়ি, সেখানে আমার নানারকম কাজ করতে হয়, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতে হয়, সেজন্য পড়াশুনো ভাল ক'রে করতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাপের মধ্যে থেকে আগ্রহ-সহকারে যতটুকু করা যায় তাতেও কাজ হয়। কাজ-কাম সেরে রাত্রিবেলায় নিরিবিলিতে ভাল ক'রে পড়বি। শরীরটা ঠিক থাকলে খাটায় লোকসান নেই। পড়ানতে কিন্তু নিজের পড়াও ভাল হয়। আর, অসুবিধার ভিতর-দিয়ে মানুষ হ'লে তাতে কিন্তু নিজের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কত ছেলে আছে, নিজের কাপড়খানা কাচতে পারে না, এক গ্লাস জল ভ'রে খেতে পারে না, মশারিটা টানাতে পারে না, সব ব্যাপারে অপরের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে থাকে। এটা কিন্তু ভাল নয়। যে অপরের সেবা যত কম নিয়ে পারে এবং অপরকে যত বেশি সেবা দিতে পারে, সে তত সুস্থ, সবল, কর্ম্মঠ ও সুখী হ'তে পারে। আত্মনির্ভরশীলতা ও সেবাবুদ্ধি থাকলে মানুষের অর্জ্জনপটুতাও বেড়ে যায়, বেশিদিন তাকে পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে হয় না। তুমি যে-অবস্থার মধ্যে পড়েছ, একদিক্ দিয়ে এটা তোমার বড় হবার পক্ষে একটা মস্ত সুযোগ। তুমি বুঝে-বুঝে তাদের জন্য যতটুকু করতে পার করবে। অনিচ্ছা সহকারে বাধ্য হ'য়ে করা, আর ইচ্ছা ও আগ্রহ-সহকারে করা—এই দুইরকম করার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ আছে। সেবার ভিতর-দিয়ে সে বাড়ির প্রত্যেকের অন্তর জয় ক'রে ফেলা চাই। তখন দেখবা—তারাই তোমার পড়াশুনার সুযোগ ক'রে দেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে।

নগেন—পরের বাড়িতে থেকে কষ্ট ক'রে পড়ার মধ্যে বড় হবার সুযোগ কোথায়? এতে তো কেবল বাধা। আমার সব সময় মনে হয়, আমার বাবা গরীব, তাই আমার এত কষ্ট ক'রে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার বাবা গরীব এবং তোমাকে কষ্ট ক'রে পড়তে হয়, এ দুই-ই হয়তো ঠিক। কিন্তু এই বাধাকে অতিক্রম ক'রে যদি কৃতকার্য্য হ'তে পার, দেখবে, তার ভিতর-দিয়ে কতখানি অভিজ্ঞতা ও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। পরকে আপন করা শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ। সে-শিক্ষা তুমি সহজেই আয়ত্ত করতে পার। কষ্টের

ভিতর-দিয়ে মানুষ হ'লে তোমার আত্মবিশ্বাস ও মনের জোর বেড়ে যাবে। এই সব সদ্‌গুণ থাকলে, তার কি কখনও আটকায় নাকি ?···আর উপকারীর উপকার কখনও ভুলবা না, তার জন্য যতখানি পার, বরাবর ক'রে যাবা। বড় হবার পথ তোমার সামনে খোলাই আছে, এখন তোমার মর্জ্জি হ'লেই হয়। পরমপিতার অঢেল আশীর্ব্বাদ তোমার উপর।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসে জিজ্ঞাসা করলেন—বহুদূরের কোন জায়গা থেকে যদি কেউ দীক্ষা নিতে চায়—যেখানে ধারে-কাছে কোন ঋত্বিক্ নেই—সেখানে কী করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে এসে নিতে পারে বা কোন ঋত্বিক্ সেখানে যেয়ে দীক্ষা দিতে পারে।

কেষ্টদা—তেমনতর সুবিধা না-হ'লে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব যদি আগ্রহ থাকে এবং দীক্ষার প্রার্থনা জানিয়ে যদি চিঠি লেখে তবে through correspondence (চিঠির মাধ্যমে) initiation (দীক্ষা) দেওয়া যায়।

এরপর কেষ্টদা চ'লে গেলেন।

দীক্ষিতের সংখ্যা কিভাবে বৃদ্ধি পায় সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বলতে লাগলেন—দীক্ষার সময় যে-সঙ্কল্পবাক্য গ্রহণ করে সে-কথা অনেকেরই স্মরণ থাকে না। তা' থাকলে কিন্তু যাজন না-ক'রেই পারে না। আর, যত বেশি লোক যাজনমুখর হ'য়ে ওঠে, ততই কিন্তু দীক্ষিতের সংখ্যা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। দীক্ষিতের সংখ্যা বাড়লে তাদের যেমন কল্যাণ, নিজেদেরও তেমনি কল্যাণ, দেশেরও তেমনি কল্যাণ। মানুষের মধ্যে fellow-feeling (পারস্পরিকতা) বেড়েই চলে। কারণ, পরিবেশ যদি ইষ্টমুখী হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে নিজেদেরও ইষ্টপথে চলার পক্ষে সুবিধা হয়। তোমরা যদি সৎ হও, তোমাদের সঙ্গগুণে লোকে যেমন উপকৃত হবে, লোকে যদি সৎ হয়, তাদের সঙ্গগুণে তোমরাও তেমনি উপকৃত হবে।

ফরিদপুরের একজন ব্যবসায়ী দাদা বললেন—আমার দোকানে একজন কর্ম্মচারী রেখেছিলাম, সে ৫০০ টাকার উপর নিয়ে পালিয়েছে, এখন আর তার কোন সন্ধান পাচ্ছি না। তার বাড়ীর ঠিকানাও জানি না যে সন্ধান করব। সৎসঙ্গী ব'লে বিশ্বাস ক'রে রেখেছিলাম, কিন্তু ফল হ'ল উল্টো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি একটা ব্যবসাদার মানুষ, তোমার মুখে একথা শোভা পায় না। একটা লোক রাখতে গেলে দেখেশুনে রাখবে তো ? সৎসঙ্গীই হোক আর যেই হোক,

অজ্ঞাতকুলশীল অর্থাৎ যার সম্বন্ধে তুমি ভাল ক'রে জান না, তেমন কোন লোককে পয়সা-কড়ি সংক্রান্ত কাজে বহাল করতে খুব হিসাব ক'রে দেখতে হয়। আর, তেমন লোক রাখলেও সব সময় কড়া নজর রাখা লাগে, যাতে ফাঁকি দেবার সুযোগ না পায়। কর্ম্মচারী যতই বিশ্বস্ত হোক, নিজের তদ্বির-তদারকে কখনও ঢিল দিতে নেই। নিজে যা' করবার তা' নিজে করবে, দেখাশোনা যতখানি করা দরকার, তাতে কোন ত্রুটি রাখবে না। যাহোক, এরপর থেকে খুব হুঁশিয়ার হবে, যাতে এমনটা না ঘটতে পারে। তার বাড়ি-ঘরের ঠিকানা তোমার আগেই জানা উচিত ছিল এবং তাও খোঁজখবর নিয়ে মিলিয়ে দেখা লাগত ঠিক কিনা ?

উক্ত দাদা—নিজে যতই দেখাশোনা করা যাক, কর্ম্মচারী যদি বিশ্বস্ত না-হয়, তাকে রাখাই বিপজ্জনক। এরপরে লোক রাখতে গেলে কিভাবে রাখব ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের জানাশোনার মধ্যে ধারে-কাছের এমন কোন লোককে রাখা ভাল যার বংশটা ভাল, প্রকৃতিটা সৎ এবং যার তোমার কাছে কিছুটা বাধ্যবাধকতা আছে।

দীনবন্ধুদা (পাল) খুঁটিনাটি নানা অসুবিধার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবিধার লোভ করা ভাল না, অসুবিধাকেই সুবিধা ক'রে নিতে হয়। অসুবিধা একদম না-থাকলে মানুষের effort (প্রচেষ্টা) ক'মে যায়, তাতে মানুষ জড় হ'য়ে যায়। তার ফল ভাল হয় না। তাই ব'লে বেফাঁস চলনে চ'লে অকারণ অসুবিধার আমদানি করা ভাল না। বাঁচাবাড়ার পথে কিছু-কিছু অসুবিধা যদি থাকে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলি জয় করার চেষ্টা যদি থাকে, তাহ'লেই স্বস্থতা বজায় থাকে। কোন মানুষকে যখন দেখি যে নিশ্চেষ্ট আরামের মধ্যে আছে, তখনই মনে হয়, তার লাভের চাইতে ক্ষতিই বেশি হ'চ্ছে। অবশ্য, এই রকমটাই বেশির ভাগ মানুষ পছন্দ করে। ইষ্টার্থী কঠোর প্রচেষ্টায় যারা আরাম পায়, তারাই ভাগ্যবান পৃথিবীতে। শরীর সুস্থ রেখে নিজেকে যতখানি খাটিয়ে নেওয়া যায়, সেই তো ভাল। প্রেয়-প্রীতি যদি থাকে, সেবা-বুভুক্ষা যদি থাকে, তাহ'লে কি কারও অলস থাকার উপায় আছে ? তার যে অপরের জন্য ক'রেই আনন্দ, না-করতে পারলেই অস্বস্তি।

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী)—আপনি যে পরোপকার-প্রবৃত্তির কথা বললেন, এটা কি মানুষের জন্মগত সংস্কার হিসাবে থাকে, না যে-কোন মানুষের ভিতর সঞ্চারিত করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কারও-কারও জন্মগত সংস্কার থাকে, আবার বাইরে থেকেও এটা সঞ্চারিত করা যায়। মানুষ mechanically (যান্ত্রিকভাবে)-ও যদি পরের ভাল

করে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে একটা বিমল-আনন্দ উপভোগ করে। এই আনন্দই তাকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত করে। পরোপকার-প্রবৃত্তির উদ্বোধন যাতে হয়, তেমনতর আচরণ ও ভাবসমন্বিত যাজনও লাগে। একটা মানুষ অজমূর্খ হোক ক্ষতি নাই, কিন্তু তার মধ্যে যদি অনুসন্ধিৎসু ইষ্টপ্রাণ সেবাবুদ্ধি ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তাহ'লে দেখবেন, তার জন্য আর ভাবতে হবে না। সে একভাবে-না-একভাবে ফুটে উঠবেই। ঋত্বিক্ ও শিক্ষকদের মধ্যে এই স্বভাব যদি থাকে, তাহ'লে যে লোকের কত উপকার হয় তা' ব'লে শেষ করা যায় না। আপনারা নিজেরা এইভাবে তৈরী হন, সহস্র সহস্র লোককে এইভাবে তৈরী করুন, তাহ'লে আমি একটু শান্তি পাই। তা' না-করতে পারলে কিছুই হ'ল না।

বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখমুখ ছলছল ক'রে উঠল। আরো কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না।

তামাক সেজে দেওয়া হ'ল। অন্যমনস্কভাবে গড়গড়ার নল টানছেন। মন চলে গেছে যেন কোন্ অজানা রাজ্যে।

কিছু সময় পরে মনোহর ভাইকে (সরকার) দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর কাজ হ'ল তো ?

মনোহর ভাই—হাতে তো অনেক কাজ আছে, কোন্ কাজের কথা বলছেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইয়ের আলমারি।

মনোহর ভাই—এখনও হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাড়াতাড়ি ক'রে দাও লক্ষ্মী! সময়মত কাজ না-হ'লে কি সুখ হয় ?

মনোহর ভাই—আচ্ছা, তাড়াতাড়িই ক'রে দিচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—তাই-ই দাও !

রাজসাহীর একটি বৃদ্ধা মা বললেন—বাবা! আমার ছেলেটি বড় কৃপণ, কেবল পয়সা জমাবে। সংসারে একান্ত প্রয়োজন যা', তাও খরচ করতে চায় না। এই নিয়ে সংসারে মাঝে-মাঝে বড় অশান্তির সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—কী আর করবি ? সে তোদের যেভাবে খাওয়ায়ে-পরায়ে খুশি হয়, তোরাও তাতে খুশি থাকিস। ও নিয়ে হাঙ্গামা করিস না। তোদের খাওয়া-পরায় কষ্ট দেয় না তো ?

উক্ত মা—তা' দেয় না। আর, আমি নিজের জন্য তো ভাবি না, কিন্তু বৌ-ছেলে-মেয়েদের কোন সখ-সৌখীনতা পূরণ করতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না করল। যাহোক, জমায় যে সেও তো তোদেরই জন্য। তবে বেশি কৃপণতা বা অমিতব্যয়িতা কোনটাই ভাল না। কিন্তু মাত্রামত সঞ্চয় ভালই। বুদ্ধিমান্ লোক যারা, তারা ছাওয়াল-পাওয়ালের জন্য টাকা ও বিষয়-আশয় বাড়াবার থেকে তাদের যোগ্যতা বাড়াতে চেষ্টা করে। চরিত্র ও যোগ্যতা যদি না-থাকে, তবে বাপে ক'রে রেখে গেলেও ছেলেয় তা' রক্ষা করতে পারে না, বরং ঐ প্রাচুর্য্যই তার উৎসন্নে যাওয়ার কারণ হয়। তাই, আর যা' করুক আর না-করুক, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দীক্ষার যাতে ভাল ব্যবস্থা করে, সে-দিকে তুই নজর রাখবিই। তার ছেলে-মেয়েদের ভালর জন্য তুই যদি গোপনে ডেকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলিস, তাহ'লে খুশিই হবে। নিজের জন্য ছেলের কাছে কিছু চাস না। কিন্তু কিছু-কিছু দানধ্যান করলে যে পিতৃপুরুষের মর্য্যাদা বজায় থাকে ও বাড়ে, এবং তা' দেখে যে ছেলেপেলেদের মানুষ হবার পক্ষে সুবিধা হয়, সে কথাটাও আস্তে-আস্তে মাথায় ধরিয়ে দিতে হয়। যার যা' প্রকৃতি, সে-সম্বন্ধে সমালোচনা ক'রে কোন লাভ হয় না। তার মনে বা অহঙ্কারে যথাসম্ভব আঘাত না-দিয়ে মোড় ফেরাতে হয়।

সত্যেনদা (মিত্র)—আজকাল ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে যে অশ্রদ্ধা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতিকার খুঁজতে গেলে আগে কারণ খুঁজতে হবে। পিতামাতা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে যদি শ্রেয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও তজ্জনিত শৃঙ্খলা না-দেখে, তাহ'লে ছেলেপেলেদের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে? আর, political (রাজনৈতিক) ও social (সামাজিক) যত রকমের movement (আন্দোলন) আছে দেশে, তাতে কেবল দাবীদাওয়া ও পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার বুদ্ধি। আত্মসমালোচনা, আত্মসংগঠন ও আত্মপ্রস্তুতির কোন movement (আন্দোলন) তো আমরা করি না। তারপর আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, কুলাচার ইত্যাদি আমরা বড়রাই অনেকে মানি না, এ-সবের নামে আমরা নিজেরাই নাক সিটকাই,—এই আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'লে ছেলেপেলেদের ঐ-সব উপসর্গ তো অনিবার্য্য। গাছের গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে কি গাছ বাঁচে? ছেলেপেলেদের দোষ দিলে কী হবে? অনেক বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে মানে না। তার পেটে যে ছেলে হবে সে খুব মাতৃভক্ত হবে, পিতৃভক্ত হবে—এ আশা করেন কী ক'রে? তাই পরিবারগুলিতে হাত দিতে হবে। কতকগুলি নীতি-কথায় হবে না। শ্রদ্ধাভক্তি জাগে এমন আচার-অনুষ্ঠান করতে হবে। এখনই আপনারা সৎসঙ্গী পরিবারগুলিতে ইষ্টভৃতির সঙ্গে-সঙ্গে পিতৃভৃতি ও মাতৃভৃতি চারিয়ে দিতে পারেন। বাপের উচিত ছেলেমেয়েকে দিয়ে রোজ তাদের মাকে দেওয়ান,

মায়ের উচিত তাদের দিয়ে রোজ বাপকে দেওয়ান। যারা দীক্ষা নেয়নি, সে-সব পরিবারেও পিতৃভূতি, মাতৃভূতি easily (সহজে) introduce (প্রবর্ত্তন) করা যায়। আর, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হওয়া চাই আদর্শপরায়ণ। তাদের করা, বলা ও ভাবায় মিল থাকা চাই। তাহ'লেই ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে, আর সেই ব্যক্তিত্বই ছাত্রদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। শিক্ষকদের আবার ছাত্রদের সঙ্গে ক্লাসের বাইরে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা চাই। শিক্ষকের কাছে যদি স্নেহমমতা, সহানুভূতি ও আদর্শানুগ প্রেরণা পায়, তাতে খুব ভাল কাজ হয়। শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে যদি যোগাযোগ থাকে, এবং একটা ছেলেকে সুগঠিত ক'রে তোলার ব্যাপারে তারা পরস্পর যদি সহযোগিতা করেন, তাহ'লে খুবই সুবিধা হয়। কতকগুলি ছেলেকে এমনভাবে তৈরী করা লাগে, যারা আবার অন্য ছেলেদের সদ্ভাবে প্রভাবিত কবতে চেষ্টা করে। ছেলেদের মাধ্যমে ছেলেদের ভিতর যদি একটা বোধ, বিবেচনা, চিন্তাশীলতা ও দায়িত্বপূর্ণ মনোভাব গজিয়ে তোলা যায়, তাহ'লে কাজ সহজ হ'য়ে আসে। ভাল যারা অর্থাৎ আদর্শনিষ্ঠ ও আত্মনিয়ন্ত্রণপরায়ণ যারা, তারা যদি বিচ্ছিন্ন থাকে, সঙ্ঘবদ্ধ না-হয়, তাহ'লে কিন্তু শক্তি হয় না। সেই শক্তিটা সৃষ্টি করা দরকার। আপনারা দাঁড়ালে সব হয়।...যে বড়কে মানে না, তাকেই যদি তার ছোটরা না-মানে, তাহ'লে কিন্তু তার ভাল লাগে না। তাই, অশ্রদ্ধা কেউই পছন্দ করে না। এই বুঝটা ফুটিয়ে দিতে হবে কায়দা ক'রে।... আর, সুস্থ লোকমত গঠনে খবরের কাগজগুলি অনেক সাহায্য করতে পারে। তাদের ধ'রে তাদের দিয়েও লেখাতে হয়।

কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) গল্পচ্ছলে বললেন—জাপানে নাকি এক ধরনের টর্পেডোর কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য আট হাজার এমন দরখাস্তকারী চেয়েছিল যাদের প্রত্যেকে এই পরীক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। তাতে নাকি অল্পদিনের মধ্যে আট হাজারের জায়গায় দশ হাজার দরখাস্ত এসে হাজির হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে দেখেন, জাতির মঙ্গলের জন্য ওরা কতদূর ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। ওদের পন্থার মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু ত্যাগবুদ্ধি যে আছে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই ত্যাগবুদ্ধি আবার রকমারি আছে। কেউ হয়তো হুজুগের মাথায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু শ্রেয়ার্থে সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে হাসিমুখে কষ্ট স্বীকার ক'রে চলতে পারে না। তাতে আরো শক্ত nerve (স্নায়ু) লাগে। তেমন worker (কর্ম্মী) পেলে কী যে ক'রে ফেলা যেত, তার ঠিক ছিল না।

অনিলদা (গাঙ্গুলী) আগামী উৎসবের কথা তুললেন এবং উৎসবের জন্য দেড়লাখ

টাকা তোলার কথা হয়েছে সে-কথাও বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসব ভাল ক'রে করতে পারলে, তার থেকে আমার activity (কাজ)-গুলি float ক'রে (ভেসে) উঠবে। আর, দেড়লাখ টাকা তুলতে গেলে পাঁচলাখ টাকা মাথায় রেখে চেষ্টা করা লাগবে।

শরৎদা (হালদার)—২৫ টাকা ক'রে ব্যক্তিগত অর্ঘ্য অনেকেই দিচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সোল্লাসে)- তিন ঠেলায় হ'য়ে যাবিনি, ভাল ক'রে হাউড় দেন। মনকে পাগল ক'রে তোলা লাগে, মাতাল ক'রে তোলা লাগে, নাচায়ে তোলা লাগে। ফন্দীফিকির বের করতে হয়, আর opposition (বাধা)-গুলি anticipate (পূর্ব্ব আঁচ) ক'রে নিরসন করতে হয়। কোটি-কোটি লোকের দীক্ষা যাতে হয়, তার ব্যবস্থা করতে হয়। আমি যখন দলবল নিয়ে ঘুরতাম, তখন একবার এক ষ্টীমার-শুদ্ধ লোক দীক্ষা নিয়ে ফেলল। নিজেদের ভিতরে একটা climate (আবহাওয়া) সৃষ্টি করা লাগে, সেই climate (আবহাওয়া) তখন বাইরেও ছড়ায়ে পড়ে। এই রকমটা হ'লে 'Let there be light and there was light.' (আলোকের আবির্ভাব হোক, এবং তখনই আলোকের আবির্ভাব হ'ল)—এমনতর হয়। যা' ইচ্ছা করেন—পরম-পিতার দয়ায় লহমায় তাই-ই করতে পারেন—এমনতর বিশ্বাস আসে। কাজের এই যে নমুনার কথা বললাম, touring batch (ভ্রাম্যমাণ দল)-এর কিন্তু তা' demonstrate (প্রদর্শন) করা লাগবে। আবার মনে করিয়ে দিই, man (মানুষ), money (টাকা), material (জিনিসপত্র), land (জমি) -সব দিকেই নজর থাকে যেন। ভারতকে আবার সোনার ভারত ক'রে তোলা চাই।

একটু থেমে পরক্ষণেই বললেন—ক'টা লেখা আছে, দেখিছেন নাকি ?

শরৎদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই প্রফুল্ল! লেখাগুলি শোনাবি নাকি? শরৎদা ওরা সবাই আছে।

প্রফুল্ল—বেলা কিন্তু বেশ হয়েছে এখন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (মাথা ঝাঁকিয়ে)—না-হয়! তুই এখনই শোনা। খোলা গরম থাকতে-থাকতে নিয়ে আয়।

কেষ্টদার বাড়ী থেকে খাতা এনে পড়া হ'ল—

"Never attend anyone with an argumentative approach, but remember—tactful interesting talk with sympathetic hearing and due appreciation brings out blissful active support and embrace

from the core of one's heart."

(কারও সঙ্গে তর্কের ভিতর-দিয়ে অগ্রসর হ'য়ো না, কিন্তু স্মরণ রেখ—সহানুভূতির সঙ্গে অন্যের কথা শোনা, গুণগ্রহণ-মুখরতা ও সুকৌশলী মনোজ্ঞ আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে অন্যের অন্তর-মথিত সুখকর সক্রিয় সমর্থন ও আলিঙ্গন লাভ করা যায়।)

"Tactful, diplomatic, generous shrewdness with forestalled adjustment of affairs—profitable to the principle is the safest mobility of move."

(আগে থেকে বিষয়ের সুচিন্তিত নিয়ন্ত্রণ-সহ আদর্শপোষণী কৌশলী, কূটনৈতিক, উদার চাতুর্য্যই চলার নিরাপদ পন্থা।)

"Never be in clash with the resourceful, intelligent and honourable, but carry your purpose for the principle in so tactful and elating a manner that you may get good, friendly active service which may bring self-complacence to them and you."

(সঙ্গতিসম্পন্ন, বুদ্ধিমান্ ও সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে কখনও সংঘর্ষে লিপ্ত হ'য়ো না, কিন্তু তোমার আদর্শ-পরিপূরণী উদ্দেশ্যকে এমন কৌশল ও প্রফুল্লতার ভিতর-দিয়ে সঞ্চারিত ক'র, যাতে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ শুভ সক্রিয় সেবার অধিকারী হ'তে পার, যা' কিনা তোমাদের এবং তাদের আত্মপ্রসাদের কারণ হ'য়ে ওঠে।)

"Agile, appreciative, tactful consultation with co-operative encouraging responsiveness to friends and active hands is the redeeming token of success."

(বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের সঙ্গে তৎপর, গুণগ্রহণমুখর, কুশলকৌশলী পরামর্শ এবং সমবায়ী, উৎসাহব্যঞ্জক সংবেদনশীলতা সাফল্যের উদ্ধারণী সঙ্কেত।)

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর এক-এক ক'রে অনেকের কাছেই জিজ্ঞাসা করলেন—বোঝা গেল তো ?

সবাই বললেন—হ্যাঁ।

তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এগুলি কিন্তু অভ্যাস করা লাগে।

ত্রৈলোক্যদাকে (চক্রবর্ত্তী) জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার নাটকের সম্বন্ধে লোকে কী বলে ?

ত্রৈলোক্যদা—ভালই বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সব ভাবধারা নিয়ে বই-টই যত লেখা হয়, ততই ভাল। ভাল literature (সাহিত্য) দিয়ে দেশ flood (প্লাবিত) ক'রে দিতে হয়। সুবিধা হ'লে জেলায়-জেলায় নিজেদের প্রেস করতে হয়। আপনারা অনেকে আছেন—আর-একটা কথা মনে থাকতে-থাকতে ব'লে রাখি। কোথাও উৎসবাদির সময় procession (শোভাযাত্রা) করতে হ'লে এমনভাবে করা ভাল, যার ভিতর-দিয়ে আর্য্যকৃষ্টির রূপটা ফুটে ওঠে। সমাজকে আমরা কী করতে চাই তার ছবিটা যেন তার মধ্যে ধরা পড়ে। ভেবে-ভেবে জিনিসটা ঠিক করতে হয়। আমি আগেও বলেছি, এখনও বললাম। কত যে করবার আছে, তার অন্ত নেই। ভাল artist (শিল্পী) পেলে তাকে দিয়ে কৃষ্টি-অনুগ ছবি আঁকিয়ে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। এক-একজনের মাথায় এক-একভাবে জিনিসগুলি ধরে। যার মাথায় যেভাবে ধরে তার কাছে সেইভাবে পরিবেষণ না-করলে হয় না। সেইজন্য লোক বুঝে যাজন করা লাগে।

১লা বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৫১ (ইং ১৪। ৪। ১৯৪৪)

নববর্ষোপলক্ষে শ্রীশ্রীঠাকুর আশীর্ব্বাণী দিলেন। প্রাতে নিভৃতনিবাসে কাজকর্ম্ম সম্পর্কে অনেক কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার কাছে গল্পচ্ছলে বললেন—এবার কর্ম্মীদের রকম দেখে মনে হয়, তারা বেশ চাঙ্গা হয়েছে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—এবার বৈঠকী আলোচনা বার-বার হওয়াতে ভাল কাজ হয়েছে। তাছাড়া আপনার কাছে এসেও কর্ম্মীরা দলে-দলে বসেছে, তাতে খুব inspired (প্রেরণাদীপ্ত) হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নতুন wholetime worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী) ক'জন হ'ল ?

কেষ্টদা—৮।১০ জন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আরো অন্ততঃ ৫০ জন wholetime worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী) immediately (সত্বর) সংগ্রহ করা লাগে। অবশ্য এটা খুব কঠিন কথা না। কতকগুলি কর্ম্মীর মাথা বেশ কয়েক ইঞ্চি লম্বা হ'য়ে গেছে। বুঝ যেমন বেড়েছে, তেমনি যদি পরিশ্রম করে, তাহ'লে হয়। লোকচর্য্যী লালসা থাকলে মানুষ কর্ম্মোদ্দীপ্ত না-হ'য়েই পারে না, নইলে শত বুঝ থাকলেও আলস্য ঘোচে না। ..... একটা কথা সবার মাথায় ভাল ক'রে ঢুকিয়ে দেবেন—দীক্ষা বাড়াতে গিয়ে যেন এক-পেসে রকমে না-চলে। সব শ্রেণী ও সব স্তরের মধ্যে যদি সমান তালে দীক্ষা না-হয়, তাহ'লে কিন্তু balance (সমতা) থাকবে না। অনুন্নত যারা তারা যদি উন্নতদের

সংসর্গ না-পায়, তাহ'লে কিন্তু educated (শিক্ষিত) হয় না।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সৎসঙ্গীরা যে কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে, তার ঠিক নাই। কয়েকজন বলছিল, সাইগন রেডিও থেকে মাঝে-মাঝে 'জয়গুরু' বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শুনে হাসতে-হাসতে বললেন—তাই নাকি ?

কেষ্টদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রোহিণী চৌধুরী লোক কেমন দেখলেন ?

কেষ্টদা—ভিতরটা খোলামেলা, আর মাথাও ভাল। কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ আছে। আসামে খুব influence (প্রভাব)। যেমন আগ্রহসহকারে দীক্ষা নিলেন, তাতে মনে হয়, ওঁর সাধ্যমত করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চক্রপাণি সঙ্গে থেকে যজন, যাজন, ইষ্টভৃতিটা অভ্যাসে আনিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে হয়।

কেষ্টদা—Formation of right habits (সদভ্যাস গঠন)-ই তো কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামশঙ্করের release-এর (মুক্তির) ব্যবস্থা ক'রে ভোলানাথদা কিন্তু একটা মস্ত কাজ করেছে। আর এই ব্যাপার নিয়ে বাংলা, বেহারের সরকারী কর্ম্মচারী-মহলে সৎসঙ্গ-সম্বন্ধে জানাজানিও কম হয়নি।

কেষ্টদা—তা' খুব হয়েছে। ভোলানাথদা বলেনও খুব convincing (প্রত্যয়-সন্দীপী) রকমে।

কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নজর রাখতে হবে tactful, intelligent, resourceful with forestalled adjustment of affairs (পূর্ব্ব হ'তে ব্যাপার বা বিষয়ের সুনিয়ন্ত্রণী ব্যবস্থায় সক্ষম, সুকৌশলী, বুদ্ধিমান্, সঙ্গতিশীল) এমনতর গুণসম্পন্ন worker (কর্ম্মী) recruit (সংগ্রহ) করার দিকে, এদিকে initiation (দীক্ষা) তো চলবেই।

কোন একটা নূতন জায়গায় গিয়ে যদি কয়েকজন বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দীক্ষা দিয়ে কাজ সুরু করা যায়, তাহ'লে কাজের পক্ষে খুব সুবিধা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে-পথে চলে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন যারা, তাদেরও সেই পথে চলতে আগ্রহ হয়। তবে কোন-কোন লোক স্বার্থের খাতিরে বিশেষ-কাউকে খুশি করবার জন্য দীক্ষা নিতে পারে। ঐ রকম দীক্ষা কিন্তু টেকসই হয় কমই। তাই, যে যেভাবেই দীক্ষা নিক-না কেন, সে যাতে direct (সরাসরি) ইষ্টে interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠে, তা' করাই লাগে। প্রত্যেকটা দীক্ষিতের পেছনে খাটতে হয়, তাকে নিয়ে ওঠাবসা

করতে হয়। এখানে নিয়ে আসতে হয়, আর আনন্দবাজার ও guest house-এর (অতিথিশালার) atmosphere (আবহাওয়া) এমন তরতরে ক'রে রাখতে হয় যে মানুষ আসলেই যেন charged (অনুপ্রাণিত) হ'য়ে যায়। শুধু ওখানে নয়, সারা আশ্রমে যাতে একটা সেবামুখর যাজনোন্মাদনা চারিয়ে যায়, তার ব্যবস্থা করতে হয়। বাইরে থেকে কর্ম্মীরা খুব উদ্দীপনার সৃষ্টি ক'রে লোক পাঠাল, কিন্তু এখানে এসে মিলে-মিশে, ঘুরে-ফিরে তাদের সেই উদ্দীপনা যদি আরো পুষ্ট না-হ'য়ে ওঠে, তাহ'লে কিন্তু কাজ এগোয় না। সেইজন্য এখানেও একদল কর্ম্মী রাখা লাগে যাতে তারা বাইরে থেকে যাবা আসে এবং আশ্রমে যারা আছে সবাইকে সেবা ও যাজনে মাতিয়ে রাখতে পারে। ঘর যদি ঠিক না-করেন, তাহ'লে বাইরে যত কাজই করেন-না-কেন, তা' কিন্তু দানা বেঁধে উঠবে না। তবে বাইরে যদি ভাল কাজ হ'তে থাকে, তাতেও কিন্তু এখানে একটা নূতন সাড়া জাগে।

কেষ্টদা—যারা ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা ও স্বার্থকেই বড় ক'রে দেখে, তাদের মধ্যে সাড়া জাগান কঠিন ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আন্দোলন যদি বেড়ে যায়, তাহ'লে প্রত্যেকেই লাভবান্ হবে, তাই সাড়া আপনা থেকেই জাগবে। Worker (কর্ম্মী) হ'লেই হয়। বাইরে থেকে যাদের এখানে পাঞ্জা নেবার জন্য পাঠাবে, তাদের খুব দেখে-শুনে select (নির্ব্বাচন) করা প্রয়োজন। Right type (ঠিক ধরন)-এর worker (কর্ম্মী) না-হ'লে কিন্তু movement (আন্দোলন)-এর progress (অগ্রগতি) affected (ব্যাহত) হ'য়ে যাবে। তাছাড়া deviation (ব্যতিক্রম)-ও আসতে পারে। দেখে-শুনে অনেক-গুলি সহ-প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়া লাগবে। তাদের মধ্যে wholetime (পূর্ণ-কালিক) যত হয়, ততই ভাল। তাদের আবার বিভিন্ন জেলায় পাঠান লাগবে। নতুন worker (কর্ম্মী)-দের এমন worker-এর (কর্ম্মীর) সঙ্গে যুতে দিতে হবে, যাতে field work (বাইরের কাজ)-এর ভিতর-দিয়ে তারা properly educated ও trained up (যথাযথভাবে শিক্ষিত ও সুগঠিত) হ'য়ে উঠতে পারে। আর, যাদের দীক্ষা দেওয়া হবে, তাদের মধ্যে মোড়ল ধরনের যারা, তাদের influence (প্রভাব) যেখানে-যেখানে আছে সেখানে-সেখানে দীক্ষা চালাতে হবে। শুধু মোড়ল ব'লে নয়, প্রত্যেকটি মানুষকে কাজে লাগাতে হবে। যা' হাতে আছে তার উপর দাঁড়িয়ে আরোতে যেয়ে পেঁছাতে হবে। অতন্দ্র ধ্যান ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্ম চাই। চিন্তার রাজ্যেও বিক্ষেপের প্রশ্রয় দিলে কাজের ক্ষতি হবে। ভাল ক'রে লাগতে পারলে এক-এক দলের গড়পড়তা দৈনিক ২।৩ শত দীক্ষা হওয়া অসম্ভব নয়। এক জায়গায় গ্যাঁট

হ'য়ে ব'সে থাকলে huge initiations (প্রভূত দীক্ষা) হবে না। ঘুরতে হবে—বিশেষতঃ চর্য্যাবুদ্ধি নিয়ে। দুষ্টু লোক যারা আছে, তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে স্ফূর্ত্তি দিয়ে তাদেরও কাজের সহায়ক ক'রে নিতে হবে। মিনমিনে ধরনের অনেক ভাল লোক যা' না-পারে, ডানপিটে ধুরন্ধর লোক অনেক সময় তাদের থেকে ঢের বেশি কাজ করতে পারে। শ্যেনদৃষ্টি রাখা লাগবে—কাকে দিয়ে কখন কেমন ক'রে পরমপিতার কাজ কতখানি হাসিল করা যায়। With facts and figures (তথ্য ও সংখ্যাসহ), mathematically (গাণিতিক-রকমে), exactly (যথাযথভাবে) ভাবা লাগবে, কোন aspect (দিক্) কোন factor (উপাদান) বাদ যাবে না। Pros and cons, favourable, unfavourable (অনুকূল ও প্রতিকূল যা-কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে) সব দিক্ চিন্তা ক'রে চলতে হবে। অভাবনীয় কোন পরিস্থিতির সম্মুখে প'ড়ে ঘাবড়ালে চলবে না, তখন আবার বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ফন্দী আঁটতে হবে—কিভাবে কী করা লাগবে। এইভাবে দীক্ষাকে ভিত্তি ক'রেই জমি ইত্যাদি যা-কিছু সব করতে হবে। ইষ্টার্থী উদ্দেশ্য-সাধনের ব্যাপারে নিজেদের মনকে মাতাল ক'রে তুলতে হবে, নাচিয়ে তুলতে হবে। নিজেদের সব সময় নাচিয়ে রাখতে তো হবেই, অন্যকেও সব সময় নাচিয়ে রাখতে হবে নিত্যনূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও রকমারির ভিতর-দিয়ে—প্রত্যেকের tendency (প্রবণতা) দেখে ও বুঝে।

উৎসবের অর্থ্য-সম্বন্ধে বললেন—টাকা আসবেই, মুড়ি-মুড়কির মত আসবে, ভাবতে হবে না যদি আপনারা initiation (দীক্ষা) ঠিক-ঠিক ক'রে যেতে পারেন।

কেষ্টদা বললেন—এবার নববর্ষের আশীর্ব্বাণীর সঙ্গে দশহাজার লোককে মহাপ্রসাদ পাঠান হবে। এইগুলি পেলে সৎসঙ্গীরা খুব খুশি হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ব্যবস্থা খুব ভাল। এরপর যদি সুবিধা হয়, আগ্রার কুমড়ো মিঠাই যোগাড় ক'রে পাঠাবেন। সুশীলদাকে পাঠিয়ে আগ্রার কারিগর আনিয়ে করিয়ে নিতে হবে এবং কাঠের বাক্সে সুন্দর ক'রে পাঠাতে হবে।

কেষ্টদা—বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে যাজন করতে গেলে কর্ম্মীদের চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা, কথাবার্ত্তা খুব dignified (মর্য্যাদা-সম্পন্ন) হওয়া দরকার। কোন রকম inferiority (হীনম্মন্যতা), timidity (ভীরুতা) বা pauperism (দারিদ্র্যব্যাধি) থাকলে পাত্তাই পাবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মীরা যেখানে যাবে, যাবে like angels (দেবদূতের মত), যাতে মানুষ সম্ভ্রম না-ক'রেই পারে না। Conviction (প্রত্যয়)-এর জেল্লায় মানুষের চেহারার মধ্যে এক নূতন দ্যুতি ফুটে ওঠে। মনের রুচিও বদলে যায়। আচার-

ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ সব-কিছুর ভিতর একটা দৈন্যমুক্ত সহজ সৌন্দর্য্যের ছাপ ফুটে ওঠে। ব্যক্তিত্বের আকর্ষণী শক্তিই বেড়ে যায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে বেরিয়ে মাতৃমন্দিরের পিছনে আশ্রম-প্রাঙ্গণে গাছের ছায়ায় এসে বসলেন। বসার পর অনেকেই এসে অর্ঘ্যাদিসহ প্রণাম করতে লাগলেন। রত্নেশ্বরদা একখানি ময়লা কাপড় প'রে এসেছেন। তাই দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা ঋত্বিক্-মানুষ, আপনাদের কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা লাগে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সদাচারেরই অঙ্গ। খাওয়া-দাওয়ায় খুব বাছবিচার করলেন, অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেন না, তাতে কিন্তু সদাচার পালন করাই হ'ল না। আবার, বাহ্যিক সদাচার পালন করলেন, মানসিক সদাচার পালন করলেন না, তাতেও কিন্তু সদাচার বজায় থাকে না।

কালিদাসদা (মজুমদার)—মানসিক সদাচার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদাচার মানেই হ'ল বাঁচাবাড়ার আচরণ। মনে মনে এমন চিন্তা করা লাগবে, এমন ভাব পোষণ করা লাগবে যাতে বাঁচাবাড়ার সহায় হয়। কুচিন্তা বা অপবিত্র চিন্তা বা সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা—যা' মনকে দুর্ব্বল ক'রে তোলে, তাও মানসিক সদাচারের বিরোধী। আবার, অন্যের প্রতি দ্রোহবুদ্ধি, অন্যের অমঙ্গল কামনা, অন্যের ক্ষতি করার চেষ্টা, পারস্পরিক প্রীতি ও ঐক্যের পরিবর্ত্তে বিরোধ ও বিচ্ছেদের কল্পনা—এসবও মানসিক অসদাচার ব'লে গণ্য। এককথায়, ইষ্টনিষ্ঠ চিন্তা ও চলনই মানসিক সদাচার, আর, তার উল্টো যা-কিছু তাই-ই মানসিক অসদাচার।

নেপালদা (পাল)—আপনি তো পারস্পরিক বান্ধবতা ও মানুষ-সম্পদ্ বাড়াবার কথা বলেন, কিন্তু এটা তো একতরফা ব্যাপার না। তাই তো ঠেকে পড়তে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যে তোমার সঙ্গে বান্ধবের মত আচরণ করুক বা না-করুক, তুমি যদি তাদের সঙ্গে বান্ধবের মত আচরণ করতে থাক, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে পারস্পরিক বান্ধবতার সূত্রপাত হ'তে পারে। এটা ধ'রেই রাখতে হবে যে তুমি বান্ধবের মত আচরণ করলেও অনেকে তোমার সঙ্গে তা' করবে না। তা' সত্ত্বেও তোমার কিন্তু তা' চালিয়েই যেতে হবে। সেইজন্য নিজের অনেকখানি ক্ষমতা থাকা লাগে, যাতে স্বার্থ-প্রত্যাশা বাদ দিয়ে নিজ-অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখে অপরের ভাল করতে পার। তবে, মানুষের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করতে গিয়ে কার instinct (সংস্কার) কেমন, তা' বোঝা চাই। এমন-এমন মানুষ আছে, যাদের ভাল করতে গিয়ে তুমি নিজে বিপন্ন হ'য়ে পড়তে পার। তাদের জন্য শত ক'রেও তুমি তো তাদের ভাল করতেই পারবে না, বরং তারা তোমাকে ডোবাতে চেষ্টা করবে। তাই বুঝে-শুনে

হিসাব ক'রে চলা লাগে। কিন্তু বাক্যালাপ ও ব্যবহার প্রত্যেকের সঙ্গে এমন ক'রে করা ভাল, যাতে সে সুখী হয় এবং তার ভিতর ভাল যা' আছে তা' সন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে। সেইজন্য, পারস্পরিক বান্ধবতা ও মানুষ-সম্পদ বাড়াতে গেলে তার ভিত্তি হওয়া চাই ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা। ঐদিকে যদি লোককে interested (অন্তরাসী) ক'রে তোলা না-যায়, তবে ফুটো কলসীতে জল ঢালার মত সব service (সেবা)-ই নিরর্থক হ'য়ে যায়।

নরেনদা (মিত্র)—সেবা দিলে তার নাকি ফল হয়ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেবা যেমনভাবে দেওয়া হয়, তার তেমনতর ফল তো হয়ই। যত সেবাই দেওয়া হোক, তার সঙ্গে সেই সেবা দেওয়া চাই যাতে লোকের complex (প্রবৃত্তি) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। আর, তার জন্যই লাগে যাজন বা ইষ্ট-প্রতিষ্ঠা।

শ্রীভূষণদা (মিত্র)—অনেকের ধারণা, কারও কোন ক্ষতি না-করলেই হ'ল, তাই নিজে নাম-ধ্যান ও ইষ্টভৃতি করে, সৎপথে চলে, কিন্তু যাজন তেমন করে না এবং তা' যে অবশ্য করণীয় তাও ভাল ক'রে বোঝে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের করণীয় করায় যে-দিক্-দিয়ে ত্রুটি থাকে, সেই দিক্-দিয়েই কিন্তু দুঃখ এসে ঘিরে ধরে। শরীরের ধর্ম্ম যদি পালন না-করি, তাহ'লে শরীর ভাল থাকে না, রোগ-ব্যাধি এসে আক্রমণ করে, পরে জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে ওঠে। জ্ঞানানু-শীলন যদি না-করি, তাহ'লে মূর্খ হ'য়ে থাকি। অলস হ'য়ে যদি থাকি, তাহ'লে কোন দিকেই উন্নতি হয় না। এইরকম প্রত্যেকটা ত্রুটির জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যাজন না-করলে, তার জন্যও তেমনি প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশকে যদি সম্ভাবে ভাবিত ক'রে না-তুলি, তাদের যদি যথেচ্ছ চলনায় চলতে দিই, তাহ'লে কিন্তু তার জন্য যে দুর্ভোগ ভোগার, তা' থেকে রেহাই পাই না। পরিবেশকে বাদ দিয়ে যদি জীবন চলত তাহ'লে হয়তো যাজন না-ক'রে পারা যেত। কিন্তু পরিবেশের ভালমন্দের সঙ্গে যতদিন আমরা জড়িত, ততদিন যাজন বাদ দিয়ে পারার উপায় নেই। তাই যাজন যে মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের পক্ষেই অপরিহার্য্য, সেইটেই ভাল ক'রে যাজন ক'রে বুঝিয়ে দিতে হয়। আবার, যাজন যেমন করতে হয়, মঙ্গলবুদ্ধি নিয়ে অসৎ-নিরোধও তেমন করতে হয়। যাজন ও অসৎ-নিরোধ সমানতালে চালাতে হয়। তাহ'লে সপরিবেশ অনেকখানি ঠিক থাকা যায়। এগুলি হ'ল পরমপিতার ঈপ্সিত কর্ম্ম। না-করলে অপরাধ হয়। লক্ষ-লক্ষ কণ্ঠে এ-সম্বন্ধে অনবরত যাজন হওয়া প্রয়োজন, তবে যদি মানুষের মাথায় ঢোকে।

ময়মনসিংহ জিলা থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে বললেন—তাঁর জমিতে অনেক পাট হয়, কিন্তু সব-সময় পাটের উপযুক্ত দাম পান-না। ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে তা' থেকে যথেষ্ট লাভ করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-এলাকায় পাট প্রচুর পরিমাণে হয়, সেখানে যদি লিমিটেড কোম্পানী ক'রে ছোটখাট পাটের কল করা যায়, তাহ'লে তা' থেকে প্রচুর পয়সা আয় হ'তে পারে। খুব বড় jute-mill (পাটকল) করা অনেক টাকার ব্যাপার। ছোটখাট mill (কল) করা খুব শক্ত কথা নয়। আমার এ-সম্বন্ধে ভাল ক'রে জানা নেই। তবে এইটুকু বুঝি, যা' বৃহদাকারে হ'তে পারে, তা' ছোট-আকারে করা যাবে না কেন? তেমন যন্ত্রপাতি খোঁজ-খবর করলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে। আর, তা' যদি করা সম্ভব না-ও হয়, নিজেরা organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হ'য়ে বিদেশে সরাসরি পাট রপ্তানি করা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তা' যদি করা যায়, তাতেও আয় অনেক বেশি হয়। ছেলেপেলেরা শিক্ষিত হ'য়ে পরের চাকরীর দিকে নজর না-দিয়ে যদি স্বাধীন ব্যবসায়ের দিকে নজর দেয়, তাতে কিন্তু খুব উন্নতির সম্ভাবনা থাকে। বিদেশের পয়সা যাতে আমাদের ঘরে আসে, তার ব্যবস্থা করতে হয়। আমাদেরও এমন প্রস্তুতি চাই যাতে তাদের অসময়ে আমরা সাহায্য করতে পারি। বড় জিনিসের কল্পনা করতেও আমরা ভুলে যাচ্ছি, এ কিন্তু ভাল নয়। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করতে হবে, তা' না-হ'লে দেশের দুঃখও ঘুচবে না, নিজেদের দুঃখও ঘুচবে না।

ভারতদা (পাট্টাদার)—ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে একদিন আমরা সব-দিক-দিয়ে কতবড় ছিলাম। একদিন এ-দেশের ঢাকাই-মশলিন বিদেশে চালান হ'ত। আমাদের কর্ম্মকারদের যে দক্ষতা ছিল, তার তুলনা হয় না। শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রবিদ্যার যে-সব নমুনা যাদুঘরে দেখা যায়, তা' দেখলে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্যকলা সব-দিকেই একদিন আমরা অসামান্য কৃতিত্ব লাভ করেছিলাম। ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, বলি, সুমাত্রা, মালয়, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, চীন, ইন্দোচীন, মিশর, পারস্য, আফগানিস্থান, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা এখনও সবার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আগের কালের তো কথাই নেই, ধাতুশিল্প, কাষ্ঠশিল্প, মৃৎশিল্প ও নানারকম কুটিরশিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন এখনও গ্রামে-গ্রামে পাওয়া যায়। হাতীর দাঁত ও মহিষের শিং-দিয়ে এখনও কত কাজ হয়। কত ভাল-ভাল শাঁখারী, কাঁসারী ও তাঁতী এখনও দেশে আছে। রেশমশিল্প আমাদের দেশের একটা বিশিষ্ট জিনিস। আরো কত কী ছিল ও আছে, উৎসাহ-

উদ্দীপনা ও সংগঠনের অভাবে কত জিনিস নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্যই তো লোকের ভিতর আদর্শপ্রাণতা চারিয়ে তাদের একগাট্টা করা লাগে।

ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী)—কোন মেয়ের যদি স্বামীর ঘরের থেকে বাপের বাড়ির প্রতিই টান বেশি হয়, তা' কি ভাল এবং তার প্রতিকার কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ের পর প্রথমটা বাপের বাড়ির প্রতি বেশি টান থাকা অস্বাভাবিক নয়। এতে বোঝা যায়, বাপের বাড়ির প্রতি তার কৃতজ্ঞতা ও স্নেহমমতা আছে। ঐ সম্পদ্ যদি না-থাকে, তাহ'লে শ্বশুর-বাড়িকেও আপন ক'রে নিতে পারে না। তবে শ্বশুরবাড়ির গৌরবে যদি গৌরবান্বিত না-হয়, এবং শ্বশুর-বাড়িকেই যদি আপন ব'লে বোধ না-করতে শেখে, সেটা কিন্তু ভাল নয়। এসব নিয়ে শ্বশুর-বাড়ির তরফ থেকে যদি বেশি বোঝাতে-পড়াতে যায়, তাতে কিন্তু তেমন কাজ হয় না। তাদের উচিত এমনভাবে ব্যবহার করা, যাতে ঐ বৌয়ের শ্বশুর-কুলের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ বাড়ে এবং সে তাদের কুল-সংস্কৃতি-অনুযায়ী শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে। আর, মেয়েদের' বাপের বাড়ির তরফ থেকে সব-সময় চেষ্টা করা উচিত যাতে মেয়ে শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে শ্বশুর-বাড়িকেই আপন ক'রে নেয় এবং সেখানে কোনরকম প্রতিকূলতা থাকলেও সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়-সহকারে তা' মানিয়ে নেয়। শ্বশুর-বাড়ির শাসন যে-মেয়েরা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে আত্মনিয়ন্ত্রণ করে না, তারা লক্ষ্মীবউ হ'তে পারে না। কষ্ট ও পরীক্ষার ভেতর-দিয়ে উতরে যায় যারা, তারাই কিন্তু কালে-কালে সংসারে সম্রাজ্ঞী হ'য়ে ওঠে। তবে বিয়েটা ঠিকমত হওয়া চাই, তা' না-হ'লে স'য়ে-ব'য়ে চলার প্রবৃত্তি ক্ষীণ হ'য়ে আসে।

সুরেনদা (সেন) একখানা বড় গামলা নিয়ে চলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেই সোল্লাসে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী ব্যাপার ?

সুরেনদা—আজ শরৎদার বাড়িতে সব কর্ম্মীদের নিমন্ত্রণ, তাই আনন্দবাজার থেকে এই গামলা নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তাই নাকি ? কতলোকের আয়োজন ?

সুরেনদা—দেড়শ'র বেশি ছাড়া কম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—ওরে বাবা ! কাণ্ড তো বাধাইছিস একখান !

অবিনাশদা (ভট্টাচার্য্য) একজনের একটা কোষ্ঠীর ছক এনে দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে-শুনে বললেন—ভালই, তবে মনে হয় পরাক্রম কম।

কয়েকজন আজ সহ-প্রতিঋত্বিকের পাঞ্জা নেবেন। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-অন্তে

কেষ্টদা তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন। কেষ্টদা এক-একজনের পাঞ্জা শ্রীশ্রীঠাকুরের হাতে তুলে দিচ্ছেন এবং এক-একজনকে ইঙ্গিত করতেই তিনি এসে প্রণাম ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের হাত থেকে পাঞ্জা গ্রহণ ক'রে প্রণাম করছেন।

সকলেই উন্মুখ হ'য়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এই শুভমুহূর্ত্তে কী বলেন।

তিনি গম্ভীরভাবে বললেন—ঋত্বিকতার মত এত বড় মহৎ কাজ আর নেই। এ হ'ল ঋষির কাজ, দেবতার কাজ, ব্রাহ্মণের কাজ। ঋত্বিক্-ই জাতির আশা, ভরসা, প্রাণ। তোমরা এই পাঞ্জার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একবার সুপুরি চেয়ে খেলেন।

একটি মা কাতরভাবে বললেন—বাবা! সংসার ও ছেলেপেলের প্রতি টানই তো ষোল আনা মন অধিকার ক'রে আছে, তার মধ্যে আপনার জায়গা খুঁজে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতা তো চান যে তোরা সংসার ও ছেলেপেলে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিস। কিন্তু পরমপিতার চাইতে যদি সংসারকে বড় ক'রে তুলিস, তাহ'লে কিন্তু ভাল ক'রে সংসার করার কায়দা পাবি না। মাথা ও বুদ্ধি-বিবেচনা ঠিক থাকবে না, বিপাকে প'ড়ে যাবি, খেই হারিয়ে ফেলবি। মনে রাখবি—সংসার, ছেলেপেলে, ধনসম্পদ্‌, যা-কিছু পরমপিতার জন্য। এইটুকু মনে থাকলে আর কোন ভাবনা নেই। চেষ্টা ক'রে বার বার মনের উপর এই ভাব আরোপ করবি, এই ভাব যাতে পুষ্ট হয়, করা-বলাও তেমনি ক'রে চালাবি। তখন ধীরে-ধীরে ঐটে অভ্যাস ও সংস্কারে পরিণত হবে।

প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী)—ভাগ্য জিনিসটা কি অস্বীকার করা যায় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাগ্য অস্বীকার করা যায় না, তবে ভাগ্য পরিবর্ত্তন করা যায়। আমার ভাগ্য যা'ই থাক, সে আমারই রচনা। এবং আমিই ইচ্ছা করলে তার রূপ বদলে দিতে পারি। তবে খুব কঠোর চেষ্টা চাই। ভাগ্য মানে, ভজনার ফল। ধর, তুমি এমনভাবে চলেছ যাতে তোমার শরীরটা খারাপ হ'য়ে গেছে। পূর্ব্বের ভজনায় খারাপ স্বাস্থ্য হয়তো তোমার বর্ত্তমান ভাগ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তুমি চেষ্টা ক'রে শরীরটাকে যদি ভাল ক'রে তুলতে পার, তাহ'লে সেইটেই তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য হ'য়ে উঠবে। তাহ'লে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন যে সম্ভব, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ?

প্রমথদা (দে)-র সঙ্গে ৪।৫ জন ভদ্রলোক এসে প্রণাম করলেন। নীচু বেঞ্চ এনে তাঁদের বসতে দেওয়া হ'ল।

বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কখন আসছেন ?

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—আমরা কাল পাবনায় এসেছি। থাকি

কলকাতায়। আজ সকালে উঠে মনে হ'ল—নববর্ষের দিন, মহাপুরুষ দর্শন ক'রে আসি। তাই আসলাম। আপনার দর্শন হ'ল, এইবার আশ্রমটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—আপনি তাহ'লে দাদাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে দেখান।

প্রমথদা ওদের সঙ্গে নিয়ে উঠে পড়লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—আবার যখন সুযোগ পান, আসবেন।

ও'রা বললেন—আচ্ছা।

২৪শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫১ (ইং ৮।৭।১৯৪৪)

কয়েকদিন আগে (৩০শে জুন, রাত্রি সাড়ে এগারটার সময়) পূজনীয়া সাধনাদি (শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথমা কন্যা) কলকাতা মেডিকেল কলেজ-হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। ক'টা দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব বিষাদমগ্ন অবস্থায় কেটেছে, নিভৃত-নিবাসে নির্জ্জনেই থাকতেন, বেরোতেন না। আজ বিকালে বেরিয়ে তাঁবুতে এসে বসেছেন এবং সহজভাবে কথাবার্ত্তা বলছেন, সম্মুখে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে কচিধানের শ্যাম-সমারোহ প্রাণমন জুড়িয়ে দিচ্ছে। ক'দিন বৃষ্টির পর আজ আকাশ উজ্জ্বল, তারপর সকলের একমাত্র বাঞ্ছিতধন পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের হাসিমুখ দর্শন, তাই প্রতিপ্রত্যেকের মন আজ খুশিতে ভ'রে আছে। আশ্রমবাসিগণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে প্রাণভ'রে দেখছেন তাঁকে।

সামনে ব'সে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), রামশঙ্করদা (সিং), বঙ্কিমদা (রায়) প্রমুখ। পূজনীয় খেপুদা, প্রমথদা (দে), নরেনদা (মিত্র), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ কিছু সময় থেকে অন্য কাজে গেলেন। আরো অনেকে আসতে লাগলেন। প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ চলতে লাগল। স্বাধীনতা-সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ স্বাধীনতা-স্বাধীনতা করে, অনেক সময় এর পিছনে থাকে প্রবৃত্তিমুখী ভোগলিপ্সা। ভোগলিপ্সা এক জিনিস আর becoming (বিবর্দ্ধন) আর-এক জিনিস। Becoming (বিবর্দ্ধন)-এর মধ্যে থাকে সাধনা ও তপস্যা। Becoming (বিবর্দ্ধন)-এর আগ্রহ যাদের থাকে, তারা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে ভোগমুখী হ'য়ে ওঠে না, বরং সাধনা ও তপস্যা আরো ভাল ক'রে করে, যাতে সবারই সুখ সুবিধা বাড়ে। ভিতরে ভিতরে শিশ্নোদর-পরায়ণ যারা, তারা শিশ্নোদর-পরায়ণতার পরিপোষণী আগ্রহ নিয়ে অনেক বড়-বড় কথা বলে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য

থাকে ভোগোপকরণ বাগানো, সেখানে কমই থাকে চারিত্রিক অভিনিবেশ। মানুষ যা'ই করুক, মূল জিনিস কিন্তু অমৃতত্বলাভ—সাধনা ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-উদ্ভাবনের ভিতর-দিয়ে জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, স্মৃতিবাহী-চেতনা লাভ করা। এর তুলনায় আর-সবই সহজ ও অতি নূ্যন। এটা বাদ দিয়ে কোনটারই মানে হয় না। প্রত্যেক জীবনে যদি মানুষকে কেঁচে-গণ্ডূষ করতে হয়, পূর্ব্বজীবনের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি যদি একেবারে লোপ পেয়ে যায়, তাহ'লে প্রত্যেকের evolution (বিবর্ত্তন) অনেকখানি hampered (ব্যাহত) হয়। এর প্রতিকারের জন্যই চাই অমৃতত্বলাভ, মৃত্যু তখন হবে একটা ঘুমের মত। একই অখণ্ড-জীবনের ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর-দিয়ে। কিছুই হারাবে না, কিছুই নষ্ট পাবে না। আবার মনে রাখতে হবে, প্রিয়পরমের জন্যই কিন্তু অমৃতত্বলাভ, নচেৎ অমৃতত্বলাভেও কোন শান্তি, তৃপ্তি বা সার্থকতা নেই। আর এ-কথাও ঠিক—প্রিয়পরমকে বাদ দিয়ে এই অবস্থায় পৌঁছানও সম্ভব নয়।

রামশঙ্করদা—মহাপুরুষরা তো ইচ্ছা করলেই সব করতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের কেমন এক দোষ, না-বুঝে মহাপুরুষদের উপর গোড়াতেই ভগবত্ব আরোপ ক'রে ভগবৎশক্তিতে—অলৌকিকভাবে সব তিনি ক'রে দেবেন—এই আশায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকি। এর চেয়ে ভুল আর নেই। ভগবান্‌ হ'লেও তিনি যে মানুষ, এবং মানুষের জগতে মানুষকে যা' করতে হয় সেই মানবীয়ভাবে কার্য্যসিদ্ধি করা ছাড়া তাঁরও যে উপায় নেই, এই জেনে খেটে-পিটে তাঁর চাহিদা পূরণ করা দরকার। মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলেই অনেক-কিছু করতে পারেন। তার তাৎপর্য্য এই যে তাঁদের বিরাট পরিপূরণী ও নিয়ন্ত্রণীশক্তি, প্রেম এবং চরিত্রবল থাকে, তাই, অনেকেই তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁদের কল্যাণকর ইচ্ছাকে রূপ দিতে চেষ্টা করে এবং বহুর সমবেত ও সুসংবদ্ধ চেষ্টার ফলে অনেক অসাধ্য সাধন হয়। যাহোক, অবতার-মহাপুরুষের ভূতমহেশ্বরভাব কিন্তু তাঁকে অনুসরণের ফলেই বোঝা যায়। Man-hood to God-hood (মনুষ্যত্ব থেকে ঈশ্বরত্বে) proceed না-করলে (অগ্রসর না-হ'লে) God-hood (ঈশ্বরত্ব) বোঝা যায় না, সে-সম্বন্ধে অলীক মনগড়া কল্পনাই থেকে যায়।

কথায়-কথায় কেষ্টদা প্রশ্ন করলেন—জীবকোটী এবং ঈশ্বরকোটী কি সম্পূর্ণ আলাদা? জীবকোটী কি এক-জীবনে ঈশ্বরকোটী হ'তে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবকোটী হ'ল man of complexes, man of passions, man of desires (গ্রন্থির মানুষ, প্রবৃত্তির মানুষ, কামনাবাসনার মানুষ)।

আর, ঈশ্বরকোটী মানে man of principle, man of Ideal, man of Beloved (নীতির মানুষ, আদর্শের মানুষ, প্রিয়পরমের মানুষ)। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও সঙ্গতিশীল চলন তাঁদের স্বভাবগত। এমনতর যাঁরা, তাঁরা পরিবেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ না-ক'রেই পারেন না। ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মগ্ন থাকা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ঈশ্বরকোটী পুরুষ বিশেষ সংস্কার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য থেকেই তাঁদের রকম আলাদা। তাঁদের জীবনের যা'-কিছু শ্রেয়প্রীতির খাতিরে। প্রবৃত্তির খাতিরে তাঁরা তা' থেকে বিচ্যুত হন না। তাঁদের শরীর-মনের গঠনই অমনতর। জীবকোটীও একজন্মেই ঈশ্বরকোটীর পর্য্যায়ে পৌঁছাতে পারে, যদি খুব তপস্যা থাকে।

প্রফুল্ল—আপনি বলেছেন, 'এক ঝাঁকিতে মোড় ফিরিয়ে অভ্যাস-ব্যবহার-প্রত্যয়ের, আদর্শেতে অবাধ চ'লে বর্দ্ধনে হ' অঢেল ঢের'—তপস্যা মানে তো এই ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জীবকোটীর সাধারণতঃ এক-ঝাঁকিতে মোড় ফেরাবার ইচ্ছাটুকুই হয় না। প্রবৃত্তির সেবা করতে না-পারলে তার কাছে জীবনটাই মনে হয় নিরর্থক। তাই, ওর থেকে রেহাই-ই চায় না। ভাবে, তাহ'লে বেঁচে থেকে লাভ কী ? আর বাঁচবেই বা কী নিয়ে ? প্রবৃত্তির হুলবুলি মেটাতে তারা সত্তাকে ক্ষয় করতে ডাইনে-বাঁয়ে চায় না, কিন্তু সত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে প্রয়োজনমত প্রবৃত্তিকে sacrifice (বিসর্জ্জন) করতে নারাজ। তবে সৎসঙ্গ ও সাধুসঙ্গে মানুষের inherent will to live and grow (অন্তর্নিহিত বাঁচা ও বৃদ্ধির পাওয়ার ইচ্ছা), আরো excited (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে ওঠে, তার ফলে প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের আগ্রহও বেড়ে যায়। এই আগ্রহ যখন খুব বেড়ে যায় তখন অভ্যাস, ব্যবহার, প্রত্যয়ের মোড় ফেরাবার ইচ্ছা হয়। মোড় ফেরাবার পরও আগের অভ্যাস, ব্যবহার ও প্রত্যয় বার-বার সেইদিকে টানতে থাকে। তখন খুব হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকতে হয়। কিছুতেই ওদের কথায় সায় দিতে নেই। জোর ক'রে নিজেকে সর্ব্বক্ষণ ব্যাপৃত রাখতে হয়—ইষ্টমুখী চলা, বলা, ভাবা ও করায়। ভাল না-লাগলেও এই নিয়ে প'ড়ে থাকতে হয়। ধীরে-ধীরে এতে রস লাগে। যখন রস লাগে তখন কোন কারণে এর থেকে কিছুটা বিযুক্ত হ'য়ে পড়লেও মনের মধ্যে হাহাকার ক'রে ওঠে। কি যেন সম্পদ্ ছিল অথচ হারিয়ে গেছে—এমনতর ভাব হয়। এইভাবে ওঠানামার ভিতর-দিয়ে জীবন চলে। যাহোক conscious effort ও self-analysis (সচেতন চেষ্টা ও আত্মবিশ্লেষণ) বরাবর চালিয়ে যেতে হয়। একেই বলে তপস্যারত থাকা।

সৎসঙ্গ-আন্দোলন-সম্বন্ধে কথা উঠল। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি বুদ্ধি ক'রে ভেবে-চিন্তে কিছু করিনি। মানুষকে ভাল লাগে, মানুষের ভাল চাই, আর

পরমপিতার দয়ায় এই ভাল-সম্বন্ধে জীবনের অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে প্রত্যক্ষ বোধ যতটুকু যেমনতর লাভ করেছি তেমনতরই ভাবি, তেমনতরই বলি, তেমনতরই করি—তা' থেকে এমন কল তৈরী হয়েছে, খেলতে-খেলতে এমন জবর চাপ বেঁধে গেছে যে খুলবার জো নেই। সৎসঙ্গীদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদের মধ্যে যে আত্মীয়তা গজিয়ে উঠেছে, তার জুড়ি নেই। দু'জন সৎসঙ্গী কেউ-ই হয়তো কাউকে চেনে না, কিন্তু আলাপ-পরিচয়ের ভিতর-দিয়ে প্রথম যখন টের পায় যে উভয়েই সৎসঙ্গী, তখন তারা যে কী করবে, কিভাবে পরস্পরকে আপ্যায়ন করবে, তা' যেন ভেবে পায় না।…………এখন আর কিছু না, যা' বলছিলাম—ঐ এক-ডজন সুকেন্দ্রিক বীর্য্যবান্ ঋষি-প্রতিভূ হ'লেই হয়।

একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে কাতরভাবে বললেন—আমার কপালটাই খারাপ। মহারাজ গেল, মা গেলেন, তারপর গোপাল চ'লে গেল। আর গত ২।৩ মাসের মধ্যেই পরপর কিশোরী, মাষ্টারমহাশয় ও সাধনাকে হারালাম। কি জন্য এত কষ্ট পাচ্ছি জানিও না!

সবাই চুপচাপ আছেন।

একটু পরে রামশঙ্করদার দিকে চেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে বললেন—ও যদি মা থাকতে আসত!

রামশঙ্করদা—এত দেরী হ'ল কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রহ অর্থাৎ obsession থাকে।

কেষ্টদাকে উঠতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যান?

কেষ্টদা—একটু কাজ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আসেন।

রামশঙ্করদা—কোথাও ভাল খাবার পেলে খেতে ইচ্ছা করে না, তখনই মনে হয়—বহু গরীবকে বঞ্চিত ক'রে এই খাবার তৈরী হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরীবকে এমনভাবে তুলে ধর, সেবা দাও, যাতে সে গরীব না-থাকে। সেবা দেওয়া মানে শুধু খেতে-পরতে দেওয়া নয়। ধর্ম্মদানই শ্রেষ্ঠ দান। তার ভিতর-দিয়েই মানুষের যোগ্যতা বাড়ে। মানুষের জন্যই যতই করা যাক-না-কেন, তার চরিত্রের পরিবর্ত্তন করতে না-পারলে তার দুঃখ ঘোচে না। ধর্ম্মদান মানে ধৃতি অর্থাৎ বাঁচাবাড়ার সুলুকগুলি সঞ্চারিত করা। তদনুগ চলনই চরিত্র। নিজেরা চরিত্রের অধিকারী হও, আর অন্যের ভিতর চরিত্র চারাও। চরিত্রের মূল কথা হ'ল প্রেম। 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম

'নাম'। Ideal-centric (ইষ্ট-কেন্দ্রিক) না হ'লে প্রকৃত প্রেমের জাগরণ হয় না অন্তরে। তাই, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশও হয় না। তা' না-হ'লে কেউ ভিতর ও বাইরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়ে উঠতে পারে না। তাই, যদি কারও উপকার করতে চাও, তাকে ইষ্টপ্রেমের প্রেমিক ক'রে তোল।

প্রফুল্ল—Capitalist (ধনিক) থাকলেই তো দেশে গরীব থাকবে, Capitalist (ধনিক)-রা তো গরীবের দিকে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, সবাই capitalist (ধনিক) হোক, সবাই rich (ধনী) হোক। ধনীকে টেনে না-নামিয়ে গরীবকেও ধনী ক'রে তোল। ধনী যদি গরীবের দিকে না-তাকায়, তাদের সবদিক্-দিয়ে উন্নত ক'রে তুলতে চেষ্টা না করে, তাহ'লে বুঝতে হবে, সেটা তাদের foolishness (বোকামি)। টাকার চাইতে মানুষ অনেক বেশি মূল্যবান্, তাই যাদের টাকার উপর অধিকার আছে অথচ মানুষের হৃদয়ের উপর অধিকার নেই, তাদের ঐ টাকা কিন্তু safe (নিরাপদ) ও lasting (স্থায়ী) নয়। বাঁচাবাড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি ক'রে পরিবেশকে যারা ক্ষেপিয়ে তোলে, বিরূপ করে তোলে, পরিবেশের হাতে তাদের নাজেহাল হওয়া অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। এ হ'ল প্রকৃতির বিধান। টাকার জোরে কর্ম্মফল থেকে রেহাই পাওয়া যায়।...আবার এ-ও দেখা যায়, গরীব যারা বড়লোকের অধীনে কাজ করে, তারা তাকে লাভবান্ ক'রে তোল'র দিকে নজর না-দিয়ে নিজেদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। অনেক সময় ইচ্ছা ক'রে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ-ও কিন্তু suicidal policy (আত্মঘাতী নীতি)। যে তোর অন্ন যোগায়, তাকেই যদি মারিস, তাহ'লে তুই বজায় থাকবি কী ক'রে? এটা উভয়তঃ। তাই, বড়লোক হওয়া মানে শোষণ করা নয়, ফাঁকি দেওয়া নয়—সেবা দেওয়া, বাঁচা-বাড়ার যোগান দেওয়া। দুনিয়ার প্রত্যেকটি great man (মহৎ লোক)-ই rich man (ধনী)—কেষ্টঠাকুর, বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, রামকেষ্টঠাকুর—এঁরা হ'য়ে উঠে-ছিলেন সেবার ভিতর-দিয়ে অগণিত লোকের স্বার্থকেন্দ্র, এঁদের মত resourceful (সঙ্গতিসম্পন্ন), এঁদের মত ধনী ক'জন আছে? অর্থ এঁদের সেবায় নতজানু।

রামশঙ্করদা—পরিবেশকে সেবা না-দিয়ে, পশুবলে দাবিয়ে রেখে এবং বুদ্ধিবলে শোষণ ক'রে ও ফাঁকি দিয়ে অনেকে বড়লোক হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি অন্যকে দাবিয়ে রাখে, শোষণ করে বা ফাঁকি দেয়, অন্যেও সুযোগ খুঁজবে—তাকে দাবিয়ে রাখতে, শোষণ করতে বা ফাঁকি দিতে। তাই কোন্ সময় যে সে প্রতিক্রিয়ার চাপে প'ড়ে shattered (বিধ্বস্ত) হ'য়ে যাবে, তার ঠিক নেই। আর, মানুষের ক্ষতি করার যে যোগ্যতা সে-যোগ্যতার কোন সার্থকতা নেই,

তাতে আপাততঃ কিছুটা কাজ হাসিল হ'লেও শেষ-রক্ষা হয় না। মানুষের পাওয়াটা আসে মানুষের মাধ্যমে। পাওয়ার উৎস যারা, তাদের হীনবল ক'রে তুললে, পাওয়ার পথ তো আপনি রুদ্ধ হ'য়ে আসবে। তবে সব বড়লোকই যে একরকমের তা' কিন্তু নয়। সেবার ভিত্তিতে honestly (সাধুভাবে) গরীব থেকে বড়লোক হয়েছে—এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। তবে দারিদ্র্য-পীড়িত যারা, প্রায়ই দেখা যায়, তাদের ভিতর intelligence (বুদ্ধিবৃত্তি), activity (কর্ম্মপ্রবণতা), inquisitive serving zeal (অনুসন্ধিৎসু সেবার আগ্রহ), elating behaviour (উদ্দীপনাময় ব্যবহার), auto-initiative responsibility (স্বতঃ-প্রবৃত্ত দায়িত্ববোধ), efficiency (দক্ষতা) ইত্যাদি অত্যন্ত কম; অন্যদিকে jealousy (ঈর্ষ্যা), fault-finding habit (দোষ-দর্শনের অভ্যাস), indolence (আলস্য), selfishness (স্বার্থপরতা), ingratitude (অকৃতজ্ঞতা) ইত্যাদি সম্পদ্ প্রভূত। এর প্রতিকার করতে হবে।

রামশঙ্করদা—কিভাবে প্রতিকার হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষগুলিকে দীক্ষিত ক'রে তুলতে হবে; যজন-যাজন-ইষ্টভৃতি-পরায়ণ ক'রে তুলতে হবে। তার ভিতর-দিয়ে প্রবৃত্তিগুলির গায় হাত পড়বে। কোন মানুষকে আমি যখন দেখি যে নিজের অভাব-অভিযোগ নিয়ে খুব বিব্রত হ'য়ে পড়েছে, তখন তার কাছে অন্যের জন্য কিছু চাই। অপরের জন্য কিছু আহরণ করতে গিয়ে দেখা যায়, তার indolent selfish obsession (অলস, স্বার্থপর অভিভূতি)-টা অন্ততঃ সাময়িকভাবে কেটে যায়। এতে তার অভাব-অভিযোগের সমাধান হোক বা না-হোক, এই selfless-active run (নিঃস্বার্থ-সক্রিয় চলন) যদি বজায় রাখে, তার ভিতর-দিয়ে তার পথ খুলে যেতে পারে। সেইজন্য আমি বলেছি—অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা' জোটে দিস্, পাবিই জো।

মণিভাই (সেন) একজনের চিঠির উত্তর সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ নিয়ে গেলেন।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—বাড়ীতে অসুখ বা অশৌচ হ'লে ভিক্ষা দেয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষার ভিতর-দিয়ে রোগ, অশুচিতা বা শোকের সংক্রমণ হ'তে পারে ব'লে দেয় না। কাউকে কিছু দিতে গেলেই এমনভাবে দিতে হয়, যাতে গ্রহীতার কোন ক্ষতির কারণ না ঘটে।

সুরেশদা (মুখোপাধ্যায়)—মনের ভাবের কোন ব্যতিক্রম হবে না, সম অবস্থায় সমানভাবে চলবে, এমনতর অবস্থা কিভাবে আসতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বাভাবিক নিয়মে এবং অবস্থা ও পরিস্থিতির চাপে মনের মধ্যে নানা-

ভাবের খেলা চলতেই থাকে, ঢেউয়ের মত কখনও ওঠে, কখনও নামে। কিন্তু এগুলিতে বেশি উল্লসিতও হ'তে নেই বা খুব ঘাবড়াতেও নেই। ভাবতে হয়, যখন যে-অবস্থাই আসুক, তার ভিতর-দিয়ে ইষ্টানুকূল কী কতটা করা যায়, আর সেই দিকে মনোনিবেশ করতে হয়। ইষ্টমুখী চলনের এই ক্রমাগতি যদি বজায় থাকে, তাহ'লে মনের ওঠা-পড়ায় বা সুখদুঃখের দ্বন্দ্বে বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না। ওগুলি আসে যায় কিন্তু becoming (বিবর্দ্ধন)-কে স্তব্ধ করতে পারে না। শুধু সাবধান থাকবেন —ইষ্টাভিমুখী চলন ও করণ যেন কিছুতেই থেমে না যায়। এই গতি কখনও একটু মন্থর, কখনও একটু তীব্র হ'তে পারে, তাতে কোন ক্ষতি নেই। ওটা শেষ পর্য্যন্ত পুষিয়ে যায়। যখন ভাবছেন, কিন্তু এগোতে পারছেন না, তখনই হয়তো অজ্ঞাতে অনেকখানি এগিয়ে যাবার শক্তি সংগ্রহ করছেন। তবে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, স্তুতি-নিন্দা উপেক্ষা ক'রে ইষ্টচলন বজায় রেখে চলাই চাই।

নির্ম্মলদা (ব্রহ্ম) তার প্রতি একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীর আচরণ-সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন—পালা-পোষা, ধরা-করার ধার ধারবে না, অথচ শাসন করবে, মাতব্বরি করবে, প্রভুত্ব দেখাবে—এই ধরনের লোকের তো অভাব নেই। তুই ওতে মন খারাপ করিস না। তবে তুই যে কোন খারাপ ব্যবহার করিস নি, এইটেই ভাল করিছিস। তোর উপর খারাপ ব্যবহার করলে তুই নীরব থাকিস, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার সামনে কেউ যদি কারও উপর অসমীচীন খারাপ ব্যবহার করে, সেখানে কিন্তু ন্যায্য প্রতিবাদ করাই লাগে। অবশ্য, ভাল ক'রে বোঝা চাই, কে, কেন, কার সঙ্গে কী ব্যবহার করছে। কেউ যদি কারও সংশোধনের জন্য তাকে রূঢ় কথা বলে, অথচ তার উদ্দেশ্য, স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ না-বুঝে তুমি যদি মাঝখান থেকে প্রতিবাদ করতে যাও, তাহ'লে সেটা কিন্তু হবে বেকুবি। অনেক জায়গায় একটা ব্যবহার দেখতে বাহ্যতঃ খারাপ হ'লেও, সেইটেই হয়তো সমীচীন ও প্রয়োজন। তাতে বাধা দিলে অসৎ-নিরোধের নামে অসৎ আচরণকেই প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়ে যায়।

নির্ম্মলদা—সে কী রকম ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর, একটা ছেলে কোন অন্যায় কাজ করেছে, আর সেইজন্য তার বাবা তাকে মাত্রামত শাসন করছে। সেখানে ঐ ছেলের প্রতি সহানুভূতি-পরবশ হ'য়ে তুমি যদি বাপের শাসনে বাধা দিতে যাও, তাহ'লে কিন্তু ছেলেটিরই মাথা খাওয়া হবে। তবে যদি এমনতর দেখ যে শাসন করতে গিয়ে বাপ রাগে আত্মহারা হ'য়ে গেছে এবং শাসনের মাত্রা এমনতর পর্য্যায়ে উঠছে যা' ছেলেটির পক্ষে মারাত্মক হ'তে পারে,

সেখানে কৌশলে তার রাগ থামাতে চেষ্টা করাই উচিত। তাও এমনতরভাবে করা দরকার, যাতে ছেলেটি না-বুঝতে পারে যে তাকে সমর্থন করা হ'চ্ছে। আবার, তোমার হৃদ্য কুশলকৌশলী আচরণ দেখে ছেলেটিও যেন বুঝতে পারে, কিরকম ব্যবহার করলে তার বাপ রাগত অবস্থায়ও খুশি ও তৃপ্ত হন এবং সেও যেন সেই রকম করতে প্রবুদ্ধ হয়।

ধীরে-ধীরে বেলা প'ড়ে আসল। শ্রীশ্রীঠাকুর নিরিবিলি থাকতে চান বুঝে ভিড় সরিয়ে দেওয়া হ'ল।

২৫শে আষাঢ়, রবিবার, ১৩৫১ (ইং ৯।৭।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের সামনের বারান্দায় একটা মাদুরের উপর প্রসন্ন মনে ব'সে আছেন। মাদুরের উপর দুই-একটি বালিশ ছাড়া আর কিছু নেই। দিনটি আজও বেশ পরিষ্কার। সকালে একপশলা বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, তারপর খটখটে রোদ উঠেছে। চতুর্দ্দিকে সজল, শ্যামল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য উছলে পড়ছে। যে-দিকে চাওয়া যায়, স্নিগ্ধতায়, কোমলতায় চোখ জুড়িয়ে যায়, প্রাণ ভ'রে ওঠে পল্লীমায়ের নিবিড় সরসতায়। তৃণলতাগুল্ম, পশুপক্ষী, স্থাবরজঙ্গম সবাই যেন আত্মীয়তার আহ্বান জানায়। গোসাঁইদা, মণীন্দ্রদা (বসু), অক্ষয়দা (দেব), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), লোচনাদা (ঘোষ), মাণিকদা (মৈত্র), পদা-ভাই (দে), শশধরদা (সরকার), শরৎদা (সেন), মহেন্দ্রদা (হালদার), হারাণ-ভাই (চক্রবর্ত্তী), মনোমোহনদা (সরকার), কালীদা (ব্যানার্জ্জী), কালুদা (আইচ), অনিলদা (সরকার), যোগেনদা (সরকার), যতীশদা (কর), পঙ্কজদা (সান্যাল) প্রমুখ এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা দলে-দলে আশ্রম-প্রাঙ্গণে খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে। কয়েকটি কিশোরী নিরালায় ব'সে গল্প করছে। সর্ব্বত্র একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের প্রবাহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর গভীর আগ্রহে রামশঙ্করদাকে বলছেন—এখন idea (ভাবধারা)-গুলি খুব broadcast (প্রচার) করা লাগবে—যাত্রা, থিয়েটার, সাহিত্য, কথকতা, বায়স্কোপ, রেডিও, বক্তৃতা, যাজন ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে। পাঠ্যপুস্তকগুলি নূতন ক'রে লিখতে হবে। প্রত্যেকটা বিষয় কৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে হবে। মাথাটাই ঘুরিয়ে দিতে হবে, যাতে ইষ্টকৃষ্টির একটা গনগনে নেশা জ্বলে ওঠে। (কথাগুলির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখে-মুখেও যেন একটা বিদ্যুতের দীপ্তি খেলে বেড়াচ্ছে)। কর, ক'রে যাও, কিছুতেই থেমো না। পরমপিতার নামে balanced

(সুব্যবস্থ) পাগল হও, আর সবাইকে অমনতর পাগল ক'রে তোল, দীক্ষায় সবাইকে গেঁথে তোল। Individual (ব্যষ্টি)-গুলি এতে ঠিক হবার পথে চলবে, আবার পারস্পরিকতাও বাড়বে। সঙ্গে-সঙ্গে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ-সংস্কার ইত্যাদি যেভাবে বলছি, সেইভাবে করতে থাক। এতে সবার উপকার হবে।

রামশঙ্করদা (সিং)—এইভাবে তো ministry (মন্ত্রিত্ব)-ও হ'তে পারে, power (শক্তি) হ'লে আরো অনেক কাজ করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বললেন—Ministry (মন্ত্রিত্ব) আমাদের লক্ষ্য নয়। Ministry (মন্ত্রিত্ব) কেন, super-ministry (অতিমন্ত্রিত্ব)-ও হ'তে পারে, আবার কিছু না-ও হ'তে পারে। আর, আমাদের কিছু হওয়া ব'লে তো কথা নয়। দেশের মানুষগুলিকে যদি আদর্শপ্রাণ ক'রে তোলা যায়, consolidated (সুসংহত) ক'রে তোলা যায়, তখন তারা যা' করবে, তার ভিতর-দিয়েই সব্যষ্টি-সমষ্টির উন্নতি ও মঙ্গল হবে। Power (শক্তি) হওয়া বলতে আমি বুঝি, ঐ অবস্থাটার সৃষ্টি করা। তা' না-ক'রে artificially (কৃত্রিম উপায়ে) power (শক্তি) হাতে পেলেও তার সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা হয় না। তাই, আমাদের আদর্শ-পরিপূরণে উদ্দাম হ'য়ে উঠতে হবে—তাতে যা' আসে আসুক, আর যা' না-আসে না-আসুক। ফলকথা, living Ideal (জীবন্ত আদর্শ)-ই হবেন primary (মুখ্য), আর যা-কিছু হবে secondary (গৌণ)। আর, তাঁর জন্য যে-কোন suffering (কষ্ট) ও sacrifice (ত্যাগ)-এর জন্য ready (প্রস্তুত) থাকতে হবে। তাহ'লেই আমরা যে-কোন affair (বিষয়) properly handle (যথাযথভাবে পরিচালনা) করতে পারব। যারা সংসার, সমাজ, দেশ বা জগৎ-জগৎ করে, তারা ওর মধ্যে গুলিয়ে যায়, ভাল করতে যেয়ে অনেক সময় মন্দ ক'রে বসে। কারণ, একটা জিনিসের above-এ (ঊর্দ্ধে) না-থাকলে তা' rightly adjust (ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত) করাই যায় না। তাই, যারা দেশের কাজ করতে চায়, তাদের আমি বলি—আগে আদেশকর্ত্তা, পরে দেশ। যে-কোন প্রসঙ্গেই ইষ্টপ্রাণতার কথা বলি ব'লে অনেকে হয়তো মনে করতে পারে, ওটা আমার একটা obsession (অভিভূতি)। কিন্তু আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি—ঐ-জিনিসটি বাদ দিয়ে আড়ম্বর বহু হ'তে পারে, কিন্তু সত্তা-সম্বর্দ্ধনার কিছু হয় না।

রামশঙ্করদা—ধরেন, একটা লোক ইষ্টপ্রাণ নয়, অথচ সে যদি একটা হাসপাতাল করে, সেখানে তো অনেক গরীবলোক সুচিকিৎসিত হ'য়ে বেঁচে যেতে পারে। তাহ'লেই তো ইষ্টপ্রাণ না-হ'য়েও মানুষের বাঁচাবাড়ার ব্যাপারে সাহায্য করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু একটা মানুষকে বাঁচাতে সাহায্য করলেই হবে না। সে যাতে

সপরিবেশ সৎ, চিৎ ও আনন্দের পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি মানুষকে সেবা দিচ্ছ অথচ তার সত্তাবিধ্বংসী complex (প্রবৃত্তি)-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করছ না, তাতে শেষপর্য্যন্ত তোমার সেবায় দেশের, দশের উপকার হবে, না অপকার হবে—বলা সন্দেহ। ধর, একটা লোক treacherous (বিশ্বাস-ঘাতক), তার প্রকৃতি তুমি জান না, বা তাকে নিয়ন্ত্রিত করার কৌশলও তোমার আয়ত্তে নেই, অথচ সরল প্রাণে তাকে সব-বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা ক'রে দিচ্ছ। পরে হয়তো দেখা গেল, তোমার সুবিধা-সুযোগ নিয়ে সে অনেকের সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলল অনায়াসেই।

অনিলদা (সরকার)—সবার প্রকৃতি তো আমরা বুঝতে পারি না, তাহ'লে তো কাউকে সেবা করা চলে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—হায় রে কপাল! আমি বা কী কই, তোমরাই বা কী বোঝ? আমি বলি, সেবা দাও আর যা'ই কর, 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'—ইষ্টে যুক্ত হ'য়ে কর, আর সব-কিছুর ভিতর-দিয়ে মানুষকে ইষ্টে যুক্ত করতে চেষ্টা কর। তা' না-হ'লে তার adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবে না। চেষ্টা করলেই যে প্রত্যেকে attached (যুক্ত) ও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হবে, তার কোন মানে নেই। তবু ওর ভিতর-দিয়ে ধরা পড়ে—কে কোন্ মেকদারের মানুষ এবং কার সঙ্গে কিভাবে চলা লাগবে। একটা লোক এখানে দীক্ষা নিক বা না-নিক, সেটা বড় কথা নয়, দেখতে হয় —কে কতখানি শ্রেয়-শ্রদ্ধাপরায়ণ, নিষ্ঠাপরায়ণ, এবং ঐ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠায় সে কতখানি প্রবৃত্তির প্রলোভন উপেক্ষা ক'রে চলতে পারে। মানুষ হ'তে হবে, মানুষ গড়তে হবে —আর এর অন্তরায় যা-কিছু তা' তাড়িয়ে দিতে হবে—এই আমাদের movement (আন্দোলন)।

ব্রজেনদা (চ্যাটার্জী—এই কাজে government (সরকার) যদি আমাদের বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবারই জো নেই। Ether (সূক্ষ্ম বায়ু) যেমন wall (দেওয়াল)-এর মধ্য-দিয়ে সহজে penetrate (প্রবেশ) ক'রে যায়, wall (দেওয়াল)-এর তাতে ক্ষতি হয় না, wall (দেওয়াল) তাতে বাধাও দেয় না, বরং আত্মপোষণী উপকরণ-হিসাবে সানন্দে আত্মসাৎ ক'রে নেয়, আপনারাও তেমনি নির্ব্বিবাদে সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশ ক'রে সবাইকে আপন ক'রে নিতে পারবেন এবং অন্য সবাইও আপনাদের আপন ক'রে নেবে। কারণ, আপনাদের movement (আন্দোলন)-এর বৈশিষ্ট্যই হল—প্রতিপ্রত্যেকের being and becoming (জীবন

এবং বৃদ্ধি) accelerate (দ্রুতগতিসম্পন্ন) ক'রে দেওয়া। তাই, আপনাদের সামনে there will be no wall, no mountain, no impediment (কোন দেওয়াল, কোন পাহাড়, কোন বাধা থাকবে না)।

শ্রীশ্রীঠাকুর মধুরকণ্ঠে ললিত ভঙ্গীতে গাইছেন—

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।……

গাইতে-গাইতে হঠাৎ থেমে আবেগভরে বললেন—ভারতে এমন এক সমাজবিধান ছিল, যার ফলে ঘরে-ঘরে সর্ব্বজনপূজ্য দেবচরিত্রের আবির্ভাব হ'তে পারত, দুনিয়ার মানুষ যাদের ভালবেসে কৃতার্থ হ'ত, উল্লসিত হ'ত, কিন্তু আজ সব ওলট-পালট হ'য়ে যাচ্ছে। তবে আর ভাবনা নেই —শুভদিন এসে গেছে—India will rise, India will shine (ভারত আবার জাগবে, ভারত আবার ঔজ্জ্বল্য বিকিরণ করবে)। আর্য্যকৃষ্টি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ'লে ভারত হবে জগতের কাছে দেবলোক।

তাঁর চোখমুখ আহ্লাদে-উল্লাসে অপরূপ মাধুর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। পরম প্রীতিভরে, হাস্যস্ফুরিত অধরে সবার দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখছেন।

রামশঙ্করদা materialism (বস্তুতান্ত্রিক) ও spirituality (আধ্যাত্মিকতার) সম্বন্ধে কথা তুললেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—হয় সবটাকে বল material (জড়), না হয় বল spiritual (আধ্যাত্মিক)। দুটো আলাদা জিনিস নেই, matter (জড়) যেটাকে বল, সেটা spirit-এর (আধ্যাত্মিকতার) evolved form (বিবর্ত্তিত রূপ)।

যতীশদা (কর)—পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূল না-হওয়ায় বহু-মানুষ জীবন-ধারণের জন্য, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়। সে-সম্বন্ধে কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রত্যেকের পক্ষেই অনুকূল হয়, যদি কিনা সে অনুকূল ক'রে নিতে জানে ও চায়। আর, এর জন্যই প্রয়োজন আদর্শ। আদর্শে প্রবল নেশা থাকলে পারিপার্শ্বিকের দ্বারা otherwise influenced (অন্যথা প্রভাবিত) না-হ'য়ে, পারিপার্শ্বিককে towards Ideal (আদর্শ-অভিমুখে) influence (প্রভাবিত) করতে পারে। আর, পেটের জন্য যে আদর্শকে বিসর্জ্জন দেয়, তার কাছে আদর্শের থেকে যে পেট বড়, সে-বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে ? আদর্শের থেকে আর কিছু বড় হ'য়ে থাকলে, আদর্শকে বজায় রেখে চলা কঠিনই হ'য়ে পড়ে। আদর্শের চাইতে বড় আর-কিছু থাকবে না, তাকেই বলা যায় আদর্শপ্রাণতা।

প্রফুল্ল—পরাধীনতার জন্য বহু জিনিস আমাদের বেহাতি হ'য়ে আছে। যুদ্ধের দরুন আপনার চাহিদামত কাজগুলি করা যাচ্ছে না, আপনি যে-সব জিনিস চান, তা' আনা যাচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত যুদ্ধই থাকুক, তোমরা যদি প্রত্যেকটা department (বিভাগ)-এর লোকের মধ্যে যাজনের ভিতর-দিয়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়তে পারতে, তোমাদের মাল চ'লেই আসত এতদিনে, তারাই সাহায্য করত স্বতঃ-দায়িত্বে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শচীনদাকে (ব্যানার্জ্জী) লক্ষ্য ক'রে বললেন—ভাল কথা মনে প'ড়ে গেল। প্রমথদার কাছ-থেকে শুনে আয় তো—সিমেণ্টের যোগাড় করতে পারল নাকি।

শচীনদা শুনে এসে বললেন—চেষ্টা করছেন, পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

জিতেনদা (চ্যাটার্জ্জী)—আপনি বলেছেন, 'তুমি তোমার, তোমার পরিবারের, দেশের, দশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী।' একটা মানুষ সবার জন্য দায়ী হবে কেন এবং কেমন ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা জলাশয়ের এক কোণে যদি তুমি একটি তরঙ্গ তোল, সেই তরঙ্গ চারিয়ে যাবে সমগ্র জলাশয়ের প্রতিবিন্দু জলে। সেই রকম তোমার প্রত্যেকটি কর্ম্ম চারিয়ে গিয়ে সমগ্র পারিপার্শ্বিককে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রভাবান্বিত করছে। তাই, পারিপার্শ্বিক যা' হ'য়ে আছে, তার জন্য তুমি যে আংশিকভাবে দায়ী, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ তো গেল একদিকের কথা। তাছাড়া, ব্যষ্টি যখন পরিবেশের প্রতি করণীয় সম্বন্ধে সজাগ, সচেতন ও সক্রিয় হয়, তখনই সামাজিক বা জাতীয় সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। কারণ, ব্যষ্টি নিয়েই সমষ্টি এবং প্রতি ব্যষ্টিই প্রতি ব্যষ্টির পরিবেশ। বীরেনদার তোমার প্রতি কী করণীয় সে-সম্বন্ধে বীরেনদার সঙ্গে ঝগড়া না-ক'রে যদি তুমি বীরেনদার প্রতি যা' করণীয় তা' করতে থাক, তাহ'লে তুমি উপকৃত হবেই এবং তোমার দৃষ্টান্তে বীরেনদাও উপকৃত হবে ব'লে আশা করা যায়। তুমি সাধ্যমত করা সত্ত্বেও বীরেনদা যদি তোমার জন্য কিছু না-করে, তাহ'লে কিন্তু কোন অনুযোগ করো না, ওদিক্-দিয়ে কোন প্রত্যাশাই রেখ না, তাহ'লে ঠকবে। কিন্তু বীরেনদা যদি অন্য কারও প্রতি তার করণীয় না-করে, সেখানে কিন্তু বীরেনদাকে সজাগ ক'রে দিতে সচেষ্ট হ'য়ো। এইভাবে তোমার বেড়ের মধ্যে যতজনকে পাও, ততজনকে নিয়ে আরো-আরো কর্ত্তব্যপরায়ণ হ'তে চেষ্টা কর, কিছুতেই থেমো না, দেখতে পাবে—Ideal (আদর্শ)-কে centre (কেন্দ্র) ক'রে সারা জগৎটাই তোমার circumference (পরিধি) হ'য়ে উঠছে। আর, এ-দায় তোমারই বাঁচাবাড়ার জন্য এতখানি প্রয়োজন। এতে যতখানি ধাঁকতি থাকবে, তোমার বাঁচাবাড়াও ধাঁকতিতে চলবে

ততখানি।

বেলা প'ড়ে এসেছে। আকাশটা রঙগীন হ'য়ে উঠেছে। তারই আভা এসে ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দ্দিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখখানিও তাই খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সকলে আগ্রহ সহকারে দেখছেন।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য)—আমরা অনেক সময় একক অনেক কাজ করতে পারি, কিন্তু মিলেমিশে দশজনকে মানিয়ে-পাতিয়ে নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি না, এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা যতখানি above complex (প্রবৃত্তির উর্দ্ধে) ও নিরাশী-নির্ম্মম হবেন, ততই মিলেমিশে কাজ করতে পারবেন। আপনি দিল্লীতে থেকে যে-কথা বলবেন আর রামশঙ্কর এখানে থেকে যা বলবে, তাতে কোন ফারাক থাকবে না—উভয়ের কথার মধ্যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাবে। স্বার্থসেবী রকম থাকলেই deviation (ব্যতিক্রম) এসে পড়ে। তখন fulfilling (পরিপূরণী) না-হ'য়ে harmful (ক্ষতিকর) হয়। একজন আর একজনের প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করে। ভাবে, তাতে তার নিজের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে এবং লোকটা তার হাতে থাকবে। কিন্তু ফল হয় উল্টো। এ-সব ভাল না। আর, কতকগুলি ভাল habit (অভ্যাস) লাগে। কাজের পথে normal cabinet (সহজ মন্ত্রণাপরিষদ)-এর সঙ্গে consult (পরামর্শ) করা উচিত, তাতে mutual understanding (পারস্পরিক বুঝ) বাড়ে। তাছাড়া, মানুষ চায় appreciation (তারিফ), প্রত্যেককে appreciate (তারিফ) করতে হয়। যারা আত্মপ্রশংসা করে এবং অন্যকে appreciate (তারিফ) করে না, তারা সমালোচনারই পাত্র হ'য়ে ওঠে। তারা কখনও integrating agent (সংহতি-সন্দীপী কর্ত্তা) হ'তে পারে না। নিজের প্রশংসা ভুলেও করতে নেই, কিন্তু অন্যের ন্যায্য প্রশংসা করতে হয় প্রাণভ'রে। কারও দোষ-সম্বন্ধে যদি তাকে বোঝাতে হয়, তাও sympathetically (সহানুভূতি-সহকারে), প্রশংসার মিশেল দিয়ে এবং যথাসম্ভব নিরালায়। বাদানুবাদ ও তর্কবিতর্ক যত avoid (পরিহার) ক'রে পারা যায়, ততই ভাল। ওতে মানুষ rigid (অনমনীয়) হয়। বরং cordial, factful ও rational discussion (হৃদ্য, তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ আলোচনা) ভাল। কয়েকজন মানুষ যদি ফিঙ্গে হ'য়ে লাগে যে পরস্পরের মধ্যে মিল ছাড়া অমিল হ'তে দেবে না, তাহ'লে অবস্থার অনেকখানি উন্নতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি মাকে বললেন—তোর মুখখানা অমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

মা'টি বললেন—আমার দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণা হ'চ্ছে, মাথাটাও ধরেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—যা, ভগীরথের ওখান থেকে একটু ওষুধ খেয়ে আয় গিয়ে। মাঝে-মাঝেই এই রকম হয় নাকি ?

উক্ত মা—দাঁতের যন্ত্রণা মাঝে-মাঝেই টের পাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপাংয়ের শিকড় বা নিমের দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজা ভাল। নুন-তেল দিয়ে দাঁত মাজলেও অনেকের উপকার হয়। খাবার পর বিশেষতঃ রাত্রে শোবার আগে দাঁতটা খুব ভাল ক'রে পরিষ্কার করতে হয়। একবার প্যারীকে দেখাস, পাইওরিয়া হ'ল নাকি। দাঁত ভাল না-থাকলে ওর থেকে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি সারিয়ে ফেলতে হয়। আর, দুধ যতটা সহ্য হয়, খাওয়া ভাল। অনেক সময় পুষ্টির অভাবে দাঁত খারাপ হয়। দুধ খেয়ে হজম করতে পারলে অপুষ্টির প্রতিকার হয়।

এরপর মা'টি ডিস্‌পেন্‌সারীতে ভগীরথদা (সরকার)-এর কাছে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একে-একে অনেকের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর দাঁত ভাল আছে তো ?

প্রত্যেকে তাঁর নিজের দাঁতের অবস্থা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—দাঁত ভাল না-থাকলে, খাওয়ার সুখ থাকে না। আমারও দাঁত আগের মত শক্ত নেই। মনে হয়, আগের কালে মানুষের স্বাস্থ্য আমাদের থেকে ভাল ছিল। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত অনেকের দাঁত, চোখ, পেট ইত্যাদি ঠিক থাকত। কত বুড়োকে কড়মড় ক'রে বুট ভাজা খেতে দেখেছি, বিনা চশমায় পড়তে দেখেছি। আবার খোরাকিও ছিল বেশ রীতিসই। (চোখের ইশারায় ও হাতনাড়ায় ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন।)

সকলেই হাসছেন।

গিরীশদা (কাব্যতীর্থ)--আজকাল খাবার জিনিস আগের মত পাওয়া যায় না, তাতেও মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাঁটি জিনিসের অভাব তো আছেই। তাছাড়া, আমাদের চালচলন ও আচার-বিচারও আগের মত নেই। আবার, বিয়ে-থাওয়া ঠিকমত না-হওয়ায় দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনে অশান্তি ও অসামঞ্জস্য বেড়ে যাচ্ছে, তাতেও স্বাস্থ্য ও আয়ুর দিক্‌-দিয়ে ক্ষতি হ'চ্ছে। প্রীতি জীবনীয় সম্পদ্‌কে গজিয়ে তোলে, বিদ্বেষ গজান যা' তাকেও নষ্ট করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু পরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—টেলিভিশন কাকে কয় ?

একজন বললেন—এটা একরকম যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন বাস্তব দৃশ্যকে অবিকল্‌-ভাবে দূরে পাঠিয়ে সেখানেও তা' ফুটিয়ে তোলা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হয় কেন এবং কিভাবে হয় ?

অনিলদা (সরকার)—যে-জিনিসের প্রতিচ্ছবি দূরে পাঠাতে হবে, তার উপর আলো ফেললে সম্মুখস্থ transmitter (প্রেরকযন্ত্র)-এর মধ্যে আলোছায়ার পার্থক্য অনুযায়ী বিদ্যুতের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, এবং তা' ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ওয়েভের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রে উপস্থিত হ'য়ে অনুরূপ আলোছায়ার পার্থক্য সৃষ্টি করে। এইভাবে দূরস্থ transmitter (প্রেরকযন্ত্র)-এর সম্মুখস্থ দৃশ্যের প্রতিরূপ গ্রাহক-যন্ত্রের সামনের পর্দ্দায় ফুটে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mental tuning (মানসিক একতানতা) হ'লেও দূরের দৃশ্য মনের পর্দ্দায় ফুটে উঠতে পারে। অবিকল ও অবিকৃতভাবে দেখা যায়।

২৬শে আষাঢ়, সোমবার, ১৩৫১ (ইং ১০।৭।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হ'য়ে মাতৃমন্দিরের সম্মুখে উপবিষ্ট। ভক্তি-ভালবাসা-সম্বন্ধে আবেগ-বিহ্বল হ'য়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। তাঁর সারা অঙ্গ-দিয়ে যেন স্নেহপ্রীতিকরুণার সুধাধারা ক্ষরিত হচ্ছে। মনের যত কাঠিন্য, যত কর্কশতা, যত মালিন্য—সব যেন গ'লে যেতে চায় পরম-প্রেমময়ের সর্ব্বদ্রাবী দিব্যস্পর্শে। সবাই তাই তন্ময় ও বিভোর হ'য়ে শুনছেন তাঁর মধুর-কথন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—ভালবাসার কাছে অসম্ভব ব'লে কোন কাজ নেই। যাতে প্রিয় খুশি হবেন, তা' না-করলেই নয়। করতেই হবে—তা' যেমন ক'রেই হোক। পারবে না—এমন কথা সে আমলই দেয় না। না-পারলে তার চলবে কি ক'রে ? প্রিয়কে খুশি করতে না-পারলে যে তার প্রাণ বাঁচে না। এ তার কাছে জীবন-মরণের প্রশ্নের সামিল। তাই, সে না-পারার কথা ভাবতেই পারে না। এই প্রচণ্ড আগ্রহই তার ভিতর অফুরন্ত শক্তি, বুদ্ধি ও কর্ম্মকৌশল জাগ্রত ক'রে তোলে। ভক্ত হনুমানের জীবনটা দেখলে এটা খুব ভাল ক'রে বোঝা যায়। পদে-পদে সে অসাধ্য-সাধন করেছে। শ্রীরামচন্দ্রের নাম নিয়ে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য সে না-পারে এমন কাজ নেই। এত পেরেও, এত ক'রেও তার বিন্দুমাত্র অহঙ্কার নেই। প্রতিটি ব্যাপারেই সে দেখছে প্রভুর দয়া। ভক্তি-ভালবাসার সঙ্গে-সঙ্গেই থাকে এইরকম দুরন্ত কর্ম্মসম্বেগ ও অভিমানশূন্যতা। তাই, ভক্তের জীবনেই ঘটে বীর্য্য ও মাধুর্য্যের শুভ-মিলন। ভক্তের সঙ্গ পাওয়া অনেক ভাগ্যের কথা। তাতে মন-প্রাণ পবিত্র হ'য়ে যায়। কোন ভক্তিমান্ মানুষ দেখলে তার চৌদ্দ-পুরুষকে আমি অন্তরে-অন্তরে শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানাই। ভজনাবেগসন্দীপ্ত কৃতিসম্বেগই ভক্তি। আর, ভজন মানেই শ্রেষ্ঠ-

সেবানুরাগ। ভক্তি হ'ল সমস্ত গুণের প্রসূতি। ওর থেকেই জীবনীয় যা-কিছু গুণ গজিয়ে ওঠে। আর, ভক্তিজাত যা' তাই-ই অমৃত, তা' নিজেও যেমন অমৃত, অন্যকেও তেমনি অমৃত ক'রে তোলে।

রামশঙ্করদা (সিং)—ভক্তদের জীবনকাহিনী শুনতে খুব ভাল, কিন্তু ঐ রকম কষ্ট যদি নিজেদের জীবনে আসে তাহ'লে কিন্তু সহ্য করা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা যদি বল, তাহ'লে মায়ের সন্তান মানুষ করা—সেও তো এক মহা কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু সন্তানের প্রতি স্নেহমমতা থাকে ব'লে কষ্টটাকে কষ্ট মনে হয় না। উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক, আশঙ্কা—সবটা মিলিয়ে অসহনীয় কষ্ট। কষ্টের সীমা নেই। তবু সে-কষ্টকে সে এড়াতে চায় না। ঐ কষ্টের মধ্যেই তার আনন্দ। সন্তানের স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনায় তার আত্মপ্রসাদ। ভক্তের জীবনেও তেমনি beloved (প্রেষ্ঠ)-কে fulfil (পরিপূরণ) করতে গিয়ে যে দুঃখ, কষ্ট, বাধা-বিপত্তি—তাতে সে ব্যথিত বা বিরক্ত হয় না। প্রেষ্ঠ-পূরণী সব কষ্টই তার কাছে enjoyment (উপভোগ) ব'লে মনে হয়। কষ্ট মনে হ'লেই বুঝতে হবে, due to complex (প্রবৃত্তির দরুন) libido (সুরত) unattached (অযুক্ত) ও unwilling (অনিচ্ছুক) আছে। অর্থাৎ, libido (সুরত) passion-এ (প্রবৃত্তিতে) attached (যুক্ত) আছে। Beloved (প্রেষ্ঠ) যদি একমাত্র passion (প্রবৃত্তি) হন, তবে আর চিন্তা নাই। তখন তাঁর জন্য যে-কোন কষ্টই সইতে হোক, তাই-ই সুখের হ'য়ে ওঠে।

কাম-আবেশে স্ত্রী-পুরুষে
যেমন করে উপভোগ,
ইষ্টকাজে বাস্তবতায়
তেমনি হ'লে তবেই যোগ।

প্রফুল্ল—স্ত্রী, ছেলেপুলে ইত্যাদির প্রতি টান থাকা সত্ত্বেও তো মানুষ সংসারে অনেক কাজে কষ্ট বোধ করে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্য cosideration (বিবেচনা), অষ্টপাশ ইত্যাদি থাকে, তাই কষ্টের বোধ থাকে। ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত্ত টানে যেমন অনেক-কিছু করতে হয়, তেমনি তথাকথিত কর্ত্তব্যবুদ্ধির থেকে কসরত ক'রেও অনেক কাজ করতে হয়, তাই কষ্টের বোধ ছাড়ে না। যেমন বৌকে একখানা ভাল কাপড় দিতে চাও, সেটা তোমার কাছে প্রীতিকর, কিন্তু ভাবছ, বোনকে যদি না-দিই, ভাল দেখায় না, তাই বুদ্ধি ক'রে খেটে-পিটে সংগ্রহ ক'রে তাকেও একখানা দিতে হয়। তাই কষ্টবোধ। আর, সংসারের

প্রতি যে-ভালবাসা তা' জীবনের সবখানিকে ভ'রে তোলে না, তার মধ্যে জীবনের অনেকখানি বাদ প'ড়ে থাকে, তাই তাতে সবদিকের সঙ্গতি হয় না, আর অসঙ্গতি থাকলেই কষ্ট থাকে। কিন্তু ইষ্টানুরাগের আবির্ভাব যদি হয় জীবনে, তা' পরিপূর্ণ জীবনকেই সার্থক ও সুসঙ্গত ক'রে তোলার সামর্থ্য রাখে। তাই, স্বস্তি ও তৃপ্তির সম্ভাবনা সেখানে বেশি থাকে। তাই, ভক্তির মত জিনিস নেই। গীতার মধ্যেও ভক্তির কথা খুব আছে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—সম্পূর্ণ গীতার মধ্যেই ভক্তির কথা ছড়িয়ে আছে, আর ভক্তিযোগের মধ্যে তো বিশেষ ক'রে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তিযোগটা একবার প'ড়ে শোনান না? আপনার মুখের সংস্কৃত পড়াটা খুব ভাল লাগে।

কেষ্টদা বাড়ি থেকে গীতা আনিয়ে দ্বাদশ অধ্যায়ের গোড়া থেকে পড়তে সুরু করলেন। দ্বিতীয় শ্লোকের নিত্যযুক্তা কথাটা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভক্তির লক্ষণ হ'ল সর্ব্বদা যুক্ত থাকা। ইষ্টকে বাদ দিয়ে ভক্তের একটা মুহূর্ত্তও ভাল লাগে না। সে হাগা, মোতা, শোয়া, খাওয়া যা' নিয়েই থাক, তার মধ্যেও ইষ্টকে নিয়ে চলে। ইষ্টবিস্মৃতি হ'লে তার প্রাণ হাহাকার ক'রে ওঠে। তাই ইষ্টমনন ও ইষ্টকর্ম্ম সে ছাড়তেই চায় না। এই-ই তার জীয়ন-সূত্র।

চতুর্থ শ্লোক পড়তে-পড়তে কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—ভালমন্দ সবার প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন কি ক'রে হওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর পরের লাইনেই আছে দেখেন—সর্ব্বভূতহিতে রতা। তার মানে যে যেমনই হোক, প্রত্যেকের প্রকৃত মঙ্গল যাতে হয় তাই করতে হবে। প্রত্যেকের প্রতি সমবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া মানে প্রত্যেকের প্রতি মঙ্গলবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া। এই মঙ্গল করতে যেখানে, যেমনভাবে, যা' করতে হয়' তাই করতে হবে। তাতেই লাগে বৈশিষ্ট্যানুগ-চলন। এ বৈশিষ্ট্য উভয়তঃ—যার প্রতি আচরণ করা হ'চ্ছে, তারও যেমন, আর যে আচরণ করছে, তারও তেমনি।

কেষ্টদা এরপর পড়লেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই পরমপিতাকে পেতে গেলে, তাঁর ব্যক্তরূপে আসক্ত হ'তে হয়। যাঁকে দেখি না, শুনি না, বুঝি না, যাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোন আদান-প্রদান নেই, ভাব-বিনিময় নেই, যিনি আমাকে শাসন-তোষণ-পোষণ করেন না, যাঁকে আমি বাস্তবভাবে

সেবা-যত্ন, আদর-আপ্যায়ন করতে পারি না, তাঁর সঙ্গে কোন গভীর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে না।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শ্লোক পড়ার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভক্ত যে, সে সবার প্রতি দ্বেষহীন, মৈত্রীভাবাপন্ন ও সদয় হবেই। কারণ, সে জানে, প্রতিটি সত্তার মধ্যেই পরম-পিতার অধিষ্ঠান। কিন্তু তাই ব'লে কারও ভিতর সত্তাক্ষয়ী যদি কিছু থাকে, তা' কিন্তু সে বরদাস্ত করে না। তার নিরাকরণকল্পে যা' করণীয়, তা' সে না-ক'রে ছাড়ে না। তাই, কোমলতা ও কঠোরতা দুইয়েরই সমাবেশ ঘটে তার চরিত্রে। আর, সন্তোষ তার চরিত্রগত স্বভাব হ'য়ে দাঁড়ায়। কারণ, হীনত্বপ্রসূত কাম-কামনার বালাই তার থাকে না। জীবন-চলনার জন্য যৎসামান্য যা' পায়, তাতেই তৃপ্ত থাকে। অযথা প্রয়োজন সে বাড়ায় না। নিজের ভিতর এমন একটা আনন্দের উৎস সে আবিষ্কার করে যে তাতেই বিভোর হ'য়ে থাকে। ভাবে ভরপুর থাকে ব'লে অভাবের বোধটাই জাগতে পারে না, তাই অসন্তোষের অবকাশ থাকে না। নিজের জন্য বিশেষ কোন চাহিদার তাড়না না থাকলেও, ইষ্টের লোককল্যাণকর অফুরন্ত চাহিদা পূরণে সে কিন্তু সদাই উদ্ব্যস্ত থাকে। তাঁর লাখ চাহিদা পূরণ ক'রেও ভাবে, কিছুই তেমন করা হ'ল না, আরো ভাল ক'রে করতে হবে। তাই, সন্তুষ্টির জন্য তার যে কর্ম্মশক্তি রহিত হ'য়ে যায়, তা' কিন্তু নয়, তা' বরং দিন-দিন বাড়তে থাকে।

তারপর পড়া হ'ল—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।
অনপেক্ষঃ শুচির্দ্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বাংলা তর্জ্জমাটা শুনে নিয়ে বললেন—ভক্ত সাধারণতঃ অন্যের উদ্বেগের কারণ হয় না, সে যথাসম্ভব অন্যের ভাবে ব্যাঘাত না-ক'রে তার ভাবের ভিতর-দিয়েই তাকে উন্নতি-প্রগতিপন্ন ক'রে তুলতে চেষ্টা করে, আর এই-ই হ'ল যাজনের প্রধান তুক। আর, লোকে তার উদ্বেগের কারণ হ'লেও সে তাতে উদ্বিগ্ন হয় না, কারণ, সে জ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখতে পায়, কে কোন্ অবস্থায় কেন কী করে। এতখানি তার চোখে পড়ে ব'লে সে অযথা উদ্বেজিত না হ'য়ে বলিষ্ঠ হৃদয়ে প্রতিকারের কথাই ভাবে। মানুষ হিসাবে তার যে আনন্দ, নিরানন্দ ভয় ও উদ্বেগ থাকে না, তা' কিন্তু নয়। এর কোনটাতেই সে unbalanced (সাম্যহারা) হয় না। সবসময় তার লক্ষ্য থাকে সমস্যা সমাধানে আর স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সহকারে তাই ক'রে চলে। অনপেক্ষ

বলতে আমার মনে হয়, সে কিছুরই বা কারও অপেক্ষায় ব'সে থাকে না। টাকা-পয়সা, তারিফ-তোয়াজ বা সুযোগ-সুবিধা, সহযোগিতা পেলে সে ইষ্টের কাজ করবে, নইলে করবে না, এমন কথা নয়। যে-কোন অবস্থা বা যে-কোন পরিস্থিতিই আসুক, তার ভিতর-দিয়েই সে কাজ ক'রে চলবে। অমুক করলো না, অমুক এই অসুবিধার সৃষ্টি করলো, আমি করব কেন বা আমি করব কিভাবে—এমনতর অনুযোগ তার থাকে না। সে কোন রকম অপেক্ষা বা প্রত্যাশা না-ক'রে ইষ্টকর্ম্মে রত থাকে—যা'-কিছু unfavourable (প্রতিকূল) তাকে favourable (অনুকূল) করতে-করতে। সর্ব্বারম্ভ মানে, স্বার্থপর কাম-কামনাজনিত যাবতীয় কর্ম্ম। Out of ambition (গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত হ'য়ে) মানুষ অনেক-কিছুই করতে চায়, কিন্তু ভক্তের কাছে ওগুলির কোনই মূল্য থাকে না। শুনেতে পাই, হনুমান প্রথম যখন রামচন্দ্রের কাছে এসেছিল, তখন তার অনেক রকম স্বার্থপর মতলব ছিল—রাজা হবে, সুন্দরী বৌ বিয়ে করবে—আরো কত কী! কিন্তু রামচন্দ্রের উপর যেই তার টান প'ড়ে গেল, অমনি সে-সব ভুল হ'য়ে গেল। ভাবল—খামাকা ওসব ভূতের বেগার খেটে লাভ কী? তার চাইতে প্রভু যাতে খুশি হন, তাই করাই ভাল। টান হ'লেই এমনতর হয়।

এরপর বাকী আর চারটে শ্লোক পড়া হ'ল।

কেষ্টদা—মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ সবই যদি একাকার হ'য়ে যায়, সে তো একটা জড় অবস্থার মতন! এর তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলির পার্থক্য যদি না-বুঝতে পারা যায়, তাহ'লে তাকে বলতে পারেন জড় অবস্থা। কিন্তু সে-বোধ খুব টনটনে থাকে। তবে কোন-কিছুই মূলে থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। তার বুদ্ধি থাকে সবটাকেই ইষ্টার্থে profitable (উপচয়ী) ক'রে তোলা। ঐ ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধি সব-অবস্থার মধ্যেই persist করে (লেগে থাকে)। সমবুদ্ধি বলতে ঐ একবুদ্ধি। তাতে কোনটাই মানুষকে আত্মহারা ও বিভ্রান্ত করতে পারে না। সমস্ত বৈপরীত্যের ভিতর-দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে একই তপস্যা। এতে খুব nerve (স্নায়ু) লাগে। এটা প্রতিকূলতার কাছে আত্মসমর্পণ করা নয়, বরং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হওয়া। ধরেন, এমন শীত পড়ল যে জীবন বাঁচে না, সেখানে এমন ব্যবস্থা করা লাগবে যাতে ঐ শীতে জীবনের কোন ক্ষতি করতে না পারে, বরং তাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। শীত বলেন, গরম বলেন—সব বেলায় ঐ একই কথা। লক্ষ্য হ'ল ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা, অন্য কথায় সপরিবেশ সত্তাসম্বর্দ্ধনা। তাই, ধর্ম্ম আপনা থেকেই ডেকে আনে যাবতীয় জীবন-বর্দ্ধনী লওয়াজিমা ও আত্মনিয়ন্ত্রণী সাধনা।

কথা উঠল, মানুষের পক্ষে আদৌ নিষ্কাম হওয়া সম্ভব কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিষ্কাম হওয়া বলতে আমি বুঝি ইষ্টপ্রীতিকাম হওয়া। ইষ্ট যাতে খুশি হন, একমাত্র সেই কামনা নিয়ে চলা, অন্য কামনার ধার না-ধারা। একমাত্র তাঁর খুশিতেই খুশি থাকতে হবে। তিনি যদি তোমাকে অনাদর করেন এবং তুমি যার প্রতি বিরূপ তাকে আদর ক'রে ও দিয়ে-থুয়ে খুশি থাকেন, তাতেও তোমার খুশির ব্যত্যয় হ'লে চলবে না। তিনি যদি অন্যকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে রেখে এবং তোমাকে দুরবস্থার মধ্যে রেখে খুশি থাকেন, তাতেই তোমার খুশি থাকতে হবে। Beloved (প্রেষ্ঠ) তোমাকে কতটুকু ভালবাসেন, তার হিসাব-নিকাশ তুমি করতে পারবে না, সে-দিকে তুমি নজরই দেবে না, কিন্তু তাঁর জন্য তোমার যা' করার তা' প্রাণ ঢেলে ক'রে যাবে এবং এই করা নিয়েই তৃপ্ত থাকবে। একেই বলে নিষ্কাম।

এরপর কেষ্টদা উঠে গেলেন এবং (বীরেনদা) ভট্টাচার্য্য প্রমুখ কয়েকজন আসলেন। রামশঙ্করদা (সিং) পরাধীনতা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইংরেজ তাড়াবার বুদ্ধি না-নিয়ে আমি যা' বলেছি তাই যদি ক'রে যাও, অর্থাৎ যাজনের ভিতর-দিয়ে তাদের Christ-centred (খ্রীষ্টকেন্দ্রিক) ক'রে তোল, এবং নিজেরা Ideal-centred (আদর্শকেন্দ্রিক) হ'য়ে সব দিক্-দিয়ে organised (সংগঠিত) হও, তবে ইংরেজ আস্তে-আস্তে একেবারে তোমাদের কী বলে—

রামশঙ্করদা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—Asset।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Asset (সম্পদ্) কি, একেবারে child (সন্তান)-এর মত হ'য়ে যাবে। সে-প্রীতির বন্ধন কিছুতেই শিথিল হবে না। ক্রমে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশও বন্ধু হ'য়ে উঠবে। তারই sparks (ঝলক) আমরা পেয়েছি ইউরোপীয়ানদের সংস্রবে। Grace সাহেব ছিলেন educated (শিক্ষিত) পাদ্রী, আমাকে খুব ভালবাসতেন, তিনি এস-ডি-ও হালিম সাহেবের কাছে বলেছিলেন—সৎসঙ্গ যদি successful (কৃতকার্য্য) হয়, তবে আমরা without any opposition, without any grievance, without any complaint (কোন বাধা না-দিয়ে বা অনুযোগ, অভিযোগ না-ক'রে) bag and baggage (তল্পীতল্পা গুটিয়ে) এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হব।

একটু পরে আবেগভরে বললেন—থেকে-থেকে আমার মনে হয়—Rise of Satsang means rise of Bengal, rise of India, may rise of the world (সৎসঙ্গের জাগরণ মানে বাংলার জাগরণ, ভারতের জাগরণ তথা জগতের জাগরণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে পিঠের একটা জায়গা দেখিয়ে চুলকিয়ে দিতে বললেন।

প্যারীদা (নন্দী) চুলকিয়ে দিলেন।

কোন একজন কর্ম্মী-সম্বন্ধে কথা উঠতে বঙ্কিমদা (রায়) বললেন—দাদাটি খুব emotional (ভাবপ্রবণ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Emotional (ভাবপ্রবণ) হওয়া খুব ভাল যদি নিষ্ঠা থাকে ও active (কর্ম্মঠ) হয়। তা' না হ'লে শুধু emotion (ভাব)-এর কোন দাম নেই। তা' মানুষকে যেমন ভালর দিকে নিতে পারে, তেমনি মন্দের দিকে নিতে পারে। এক ধরনের মানুষ আছে, তাদের ভাবের উচ্ছ্বাস খুব থাকে কিন্তু কোন কাজের দায়িত্ব দিলে পিছিয়ে যায়, সে কিন্তু ভাল নয়। তবে চারিত্রিক সম্পদের সঙ্গে যদি emotion (ভাব) থাকে, তাহ'লে লোককে inspire (প্রবুদ্ধ) করার পক্ষে সুবিধা হয়।

চারুমা বললেন—ছেলেটা এত দুরন্ত হয়েছে যে কিছুতেই ওকে বাগ মানাতে পারি না, একটুও ভয়-ডর নেই প্রাণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তাহ'লে সে তো মস্ত অপরাধের কথা। কোন দৌরাত্ম্য করবে না, হাবাগোবার মত জুজুর ভয়ে এক জায়গায় ব'সে থাকবে, তাহ'লেই তো তোমার পক্ষে ছেলে মানুষ করার সুবিধা ছিল। কিন্তু ও কোন কাজের কথা নয়। ছেলে দুরন্ত ও নির্ভীক—এইটেই আশার কথা। পরমপিতা তাকে যে সম্পদ্ দিয়েছেন, তা' নষ্ট ক'র না। এই নিয়ে সে যাতে ভালর দিকে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে, তাই করা লাগে। তুই চেষ্টা করবি যাতে ওর বাপের 'পর টান বাড়ে, আর ওর বাবা চেষ্টা করবে যাতে তোর উপর টান বাড়ে। আর, তোরা উভয়ে এমনভাবে চলবি যাতে তোদের গুরুভক্তি ওর ভিতর সঞ্চারিত হয়। ছেলেকে ভাল করবার এই হ'ল মোক্ষম তুক। বেশি উপদেশ না-দিয়ে নিজেদের আচার-আচরণ দিয়ে যত এইদিকে আকৃষ্ট করা যায়, ততই ভাল। ছেলেপেলেদের সামনে নিজেরা যদি ঝগড়াঝাঁটি কর, তাহ'লে কিন্তু সর্ব্বনাশ।

উপেনদা (বসু)—কোন ছেলে যদি অঙ্ক না-বোঝে, তবে তাকে অঙ্ক বোঝান যায় কী ক'রে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈনন্দিন জীবনে সে কোথায় কিভাবে অঙ্কের প্রয়োগ ক'রে, কোথায় যোগ করে, কোথায় বিয়োগ করে, কোথায় গুণ করে, কোথায় ভাগ করে—তা' ধরিয়ে দিতে হয়। বাস্তবতার ভিতর-দিয়ে যদি place (উপস্থাপন) কর, তাহ'লে ছাত্ররা বুঝতে পারবে যে জিনিসটা কত সহজ ও স্বাভাবিক। এইভাবে interest (অনুরাগ)

গজিয়ে দিয়ে অজস্র করাতে হয়। প্রথমে এমন কতকগুলি করাতে হয় যা' সহজে পারে, তা' থেকে আস্তে-আস্তে কঠিনের দিকে যেতে হয়। ধাপে-ধাপে করিয়ে গেলে তখন অসুবিধা বোধ করে না। যারা ক্লাসের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না, তাদের পিছনে আলাদা ক'রে খাটতে হয়। সব সময় উৎসাহ দিতে হয়, পারগতার বোধটা ফুটিয়ে দিতে হয়। খেলার মত ক'রে পড়াতে হয়। না-পারলে অসহিষ্ণু বা বিরক্ত হ'তে নেই। কোন ছেলে হয়তো comparatively slow in understanding (তুলনামূলকভাবে বোধের ব্যাপারে কিছুটা মন্থর) কিন্তু তাই ব'লে তাকে যদি গঞ্জনা কর বা মনে ব্যথা দাও, তাহ'লে সে কিন্তু ঘাবড়ে যাবে। যে যেমন তাকে তার মত ক'রে nurture (পোষণ) দিয়ে টেনে তুলতে হবে, তার ভিতর আত্ম-প্রত্যয় গজিয়ে দিতে হবে। তোমার প্রতি টান যদি হয়, তাহ'লে তুমি যে-বিষয় পড়াও, তাতেও আস্তে-আস্তে টান হবে। প্রত্যেকটা বিষয় আয়ত্ত করার মূলে থাকে তদনুগ চিন্তা, চলন, অভ্যাস, ব্যবহার—এককথায় তদনুগ চরিত্র ও মনোভাব। অঙ্ক যদি তুমি ঐ ভাবে চরিত্রগত ক'রে ফেল, তাহ'লে দেখবে, তোমার সান্নিধ্যে এসে ছেলেরা তাদের ও তোমার অজ্ঞাতে অঙ্ক শেখার প্রেরণা সঞ্চয় ক'রে নিয়ে যাবে। তাই, শিক্ষককে হ'তে হয় আচার্য্য অর্থাৎ, আচরণসিদ্ধ। অঙ্ক যদি তুমি অমনতরভাবে আয়ত্ত কর তখন তোমার মামুলি কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়েও অঙ্ক imparted (সঞ্চারিত) হবে। সব বিষয়-সম্বন্ধেই এমনতর। তাই, যে-কোন বিষয় পড়াতে তদনুগ দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাধারা ও অভ্যাস সঞ্চারিত করা লাগে। এই basis (ভিত্তি)-টুকু ক'রে দিলে তার উপর দাঁড়িয়ে ছাত্ররা যে কতদূর এগোতে পারে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।……আর অঙ্ক শেখাতে গেলে ধারাপাত, নামতা ইত্যাদি ভাল ক'রে শেখাতে হয়।

ঋত্বিক্-অধিবেশন আগতপ্রায়। সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা প্রমথদা (দে) জেনে গেলেন।

একটি ছেলে এসে বলল—ঠাকুর! আমি একটা ময়না পুষেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই নাকি? খুব ভাল ক'রে যত্ন করবি। আর নজর রাখবি—যা'তে বিড়াল-টিড়ালে না-ধরে।

ছেলেটি বলল—আচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথা বলতে পারে নাকি?

ছেলেটি—একটু একটু ক'রে শেখাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। আর, শেখাতে গেলে নানাজনে নানাভাবে শেখাতে নেই। তাতে শিক্ষা ভাল হয় না। পাখীরও একটি মর্জ্জি আছে, রুচি আছে। তাই

বুঝে বিরক্ত না-হয় এমনভাবে একজনের হাতে যত্ন ও শিক্ষা হওয়া ভাল। এই পাখীটাকে যদি ভাল ক'রে পুষতে পারিস, তা'হলে দেখবি, তার ভিতর-দিয়ে তোর বুদ্ধি কত বেড়ে যাবে। পাখী তো আর মনের কথা বলতে পারে না, তাই নজর ক'রে বোঝা লাগবে।

ছেলেটি চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজকাল আমরা শিক্ষা বলতেই বুঝি লেখাপড়া, কিন্তু বাস্তব কাজকর্ম্মের ভিতর-দিয়ে যে কতখানি শিক্ষা হয়, তা' আর বুঝি না। বাড়িতে গরু, বাছুর, কুকুর, বেড়াল, পাখী ইত্যাদি যা' থাকে, ছেলেপেলেরা যদি সেগুলির আদর-যত্ন করে, তাহ'লে তার ভিতর-দিয়ে কিন্তু অনেকখানি বোধ বাড়ে। কোন অতিথি বা আত্মীয়স্বজন আসলে নিজেরা সঙ্গে থেকে ছেলেপেলেদের দিয়ে তাদের সেবাযত্ন করাতে হয়। পাড়ায় হয়তো কোন বাড়িতে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হ'চ্ছে ছেলেদের সেখানে পাঠিয়ে দিতে হয় সাধ্যমত সাহায্য করতে। বাড়িতে হয়তো একটা বাগান আছে, তরিতরকারি, শাকসব্জি হয়। সেখানে ছেলেপেলেদের সঙ্গে নিয়ে নিজেরা কাজকর্ম্ম করতে হয়। বাজারে যাচ্ছি, ছেলেটা সঙ্গে গিয়ে হয়তো বাজার করা শিখল। একটা রোগীকে সেবাশুশ্রূষা কিভাবে করতে হয়, তা' হয়তো হাতে-কলমে ক'রে শিখল। ঘরটা হয়তো ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার করল। একটা পিঁড়ি থেকে একটা লোহা উঠে গেছে, বললাম লোহাটা ভাল' করে পিটিয়ে দে, যাতে না-ওঠে। বইটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, বললাম, ভাল ক'রে সেলাই ক'রে মলাট দিয়ে রাখ। বেড়াটা ভেঙ্গে গেছে, বললাম, আয়! একসঙ্গে বেড়াটা বাঁধি! এইভাবে খুঁটিনাটি কাজ যত করান যায়, ততই ভাল। হাত, পা, চোখ, কান, মাথা যত মজবুত হয়, তত self-confidence (আত্মবিশ্বাস) বাড়ে। Active habits (সক্রিয়তার অভ্যাস), self-confidence (আত্মবিশ্বাস) ও inquisitive serving tendency (অনুসন্ধিৎসু সেবাপ্রবণতা) যদি থাকে, তাহ'লে মানুষ বেকার হয় না। পুঁথি পড়াটাকে আমরা যেদিন শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ক'রে নিয়েছি, সেদিন থেকেই প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে স'রে যাচ্ছি। আগের কালে ছাত্রদের আচার্য্যের গৃহে না-করতে হ'ত এমন কাজ নেই। শ্রদ্ধার সঙ্গে করত আর শিখত, আর জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনপূরণী কর্ম্মগুলি যাতে ভাল ক'রে করতে পারে, তার জন্য লেখাপড়ার চর্চ্চা করত। পরের চাকর হবার জন্য লালায়িত হ'ত না। তাই, ছেলেপেলেদের মানুষ করতে গেলে, তাদের Ideal-centric (ইষ্টকেন্দ্রিক) ক'রে সেবাবুদ্ধি ও যোগ্যতা-অর্জ্জনে প্রবুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। আর, এ-শিক্ষার গোড়া হবে প্রত্যেকের নিজ-নিজ বাড়ি।

সবাই মুগ্ধ হ'য়ে শুনছেন তাঁর কথা।

কথার শেষে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা' বলি, তার কিছু-কিছুও যদি তোমরা কর, তাহ'লে কিন্তু আবহাওয়া বদলে যায়।

বেলা প'ড়ে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এইবার উঠে পড়লেন।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার, ১৩৫১ (ইং ১৫। ৭। ১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে আশ্রম-প্রাঙ্গণে বাবলাতলায় একখানি বেঞ্চিতে ব'সে আছেন। ২৫তম ঋত্বিক্-অধিবেশন চলছে, সেই উপলক্ষে অগণিত কর্ম্মী এসে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে উপস্থিত আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিখুশিভাবে সকলের খোঁজখবর নিচ্ছেন। এবং প্রত্যেকে প্রাণ খুলে যার-যার বক্তব্য বলছেন। দয়ালের অপার স্নেহস্পর্শে সকলের অন্তর আনন্দে উদ্ভাসিত।

সুরেনদার (বিশ্বাস) সঙ্গে কাজকর্ম্ম-সম্পর্কে কথা বলতে-বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সমুদ্রমন্থনের কথা জান তো! সমুদ্রমন্থনে বিষ, অমৃত দুই-ই ওঠে। তোমাদের আন্দোলনও সমুদ্রমন্থন-বিশেষ। এতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-চরিত্রের ভালমন্দ দুই-ই আত্মপ্রকাশ করবে। মন্দটা যদি দেবে থাকে, তাহ'লে লাভ নেই। তার Solution (সমাধান) হওয়া দরকার। তাই, নিজের বা অপরের ভিতরকার যে-মন্দেরই সম্মুখীন হও-না-কেন, তাতে অধৈর্য্য হ'য়ো না, নিরাশ হ'য়ো না, ঘাবড়ে যেও না। তার যাতে ইষ্টানুগ adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয়, সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সহকারে তাই-ই ক'রে চল। ভগবৎ-সেবার পথে ভিতরে-বাইরে শয়তান নানাভাবে মাথা তোলা দেয়। তাকে কাবেজ করার মত পরাক্রম ও কৌশল চাই! সেই পরাক্রম ও কৌশল যদি না-থাকে, তাহ'লে অস্তিত্বই কিন্তু বিপন্ন হ'য়ে উঠবে। শয়তানের সঙ্গে যতদিন আপোষ ক'রে চলা যায়, ততদিন বোঝা যায় না—শয়তান কতখানি ক্রূর, কতখানি হিংস্র। শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন সুরু হয়, তখন দেখা যায় তার আসল রূপ। তোমরা ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠার পথে আপোষরফাহীন হ'য়ে যত অগ্রসর হবে, ততই দেখবে—কত রকমের বাধা এসে হাজির হয়। বাধা আসবেই, কিন্তু সেই বাধাকে বাধ্য করার মত শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। তোমরা পার সব, তোমাদের কাজ হ'ল ধর্ম্ম ও কৃষ্টির বিরোধী যা', তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান।

বিপিনদা (সেন)—শোনা যায়, ভগবানের বিধানে অসৎ যা', তা' আপনা থেকে নাশ পায়—এ-কথা কি সত্য নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে কারও অসুখ করলে ওষুধ দিয়ে তা' সারাবার চেষ্টা করেন কেন? কঠিন রোগের যদি প্রতিকার না-করা যায়, তবে রোগ তো সারেই না, বরং

রোগীকে নাশ করে। তাই, বিনষ্ট হওয়ার ইচ্ছা যদি না-থাকে, তাহ'লে নাশক যা', তাকে নষ্ট করা লাগে। অসৎ যা', তা' ভগবানের বিধানে নাশ পায়, এ-কথা বলতে আমি বুঝি—ভগবান্ জীবন-সম্বেগরূপে সবার মধ্যেই বিদ্যমান্, আর জীবন-সম্বেগের ধর্ম্মই হ'ল—জীবনকে নষ্ট করে যা', তাকে নাশ করা বা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে তা' জীবনীয় হ'য়ে ওঠে। এর জন্য যা' করণীয়, তা' করতেই হয়। না-করে কিছু হয় না। আর আমরা চুপ ক'রে ব'সে থাকব, আমাদের কিছু করা লাগবে না, divine miraculous intervention-এ (ঈশ্বরীয় অলৌকিক হস্তক্ষেপে) যা' ভাল তা' ঘ'টে যাবে, এ কোন কাজের কথা নয়। এর ভিতর আছে ফাঁকিবাজি—করণীয়কে এড়িয়ে চলা। ফাঁকি দিলে ফাঁকিতেই পড়তে হয়। নিজের দুর্ব্বলতার সমর্থনে বিকৃত তত্ত্বকথার আমদানি না-ক'রে দুর্ব্বলতাকে দুর্ব্বলতা বলা স্বীকার করাই ভাল।

বঙ্কদা (পাল)—জীবনে প্রাচুর্য্য আসে কিসের ভিতর-দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাজন ও সেবায় যে যত প্রচুর হয়, তার জীবনে প্রাচুর্য্যও তত সহজ হ'য়ে ওঠে। মানুষকে একটুখানি sincerely (আন্তরিকভাবে) ভালবেসো, তার যাতে ভাল হয়, তেমনতর সেবাচর্য্যা ক'রো—স্বার্থ-প্রত্যাশা বাদ দিয়ে, তাহ'লে দেখো, মানুষ যে তোমার জন্য কী করবে, তোমাকে কোথায় রাখবে, তা' ভেবে ঠিক পাবে না। তাই কই, মানুষ উপায় কর, টাকা উপায় করার কথা তোমাকে ভাবতেই হবে না। তোমরা এত জিনিস নিয়ে আস যে বড়-বৌয়ের ঘরে ধরে না। কেন দেও ? দিয়ে ভাল লাগে, তাই তো দেও !

সতীশদা (চৌধুরী)—যাজন ক'রেও তো অনেকের দুঃখ ঘোচে না !

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে রাখতে হবে যে আমরা যা' যাজন করি, তা' যেন যথাসম্ভব আমাদের চরিত্রে ফুটে ওঠে। আমাদের চরিত্র ও আচরণ যদি আমাদের মৌখিক যাজনের প্রতিবাদ করে, তাহ'লে মৌখিক যাজন কিন্তু অনেকখানি নিষ্ফল হ'য়ে যায়। যাজন যে সপরিবেশ তোমাদের আশানুরূপ উচ্ছল ক'রে তুলছে না, তার কারণ—কথায়-কাজে অসঙ্গতি। আর, প্রত্যাশাপীড়িত যাজন-সেবা নিজেই দৈন্যদুষ্ট, তাই তা' দৈন্য দূর করতে পারে না।

প্রিয়নাথদা (বসু)—ইষ্ট-বিষয়ক আলাপ-আলোচনা তো অনেকেই আগ্রহ-সহকারে শোনে, কিন্তু ইষ্টের প্রতি টান তো বেশি লোকের হ'তে দেখা যায় না, এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাপ-আলোচনা শোনা গল্প-শোনার মত। তার মধ্যে তপস্যার ব্যাপার নেই। আর, তপঃ-প্রাণতা সবার মধ্যে থাকেও না। কিন্তু তপঃ-প্রাণতা না-থাকলে টানটা maintained (রক্ষিত) হয় না। তাই, তপঃ-প্রাণতা imparted

(সঞ্চারিত) হয়—এমনভাবে বলা লাগে। সেটা impart (সঞ্চারিত) করতে গেলে, নিজের ভিতর তা' স্বভাবগত ক'রে তোলা লাগে। Active attachment (সক্রিয় অনুরাগ) জিনিসটাই আলাদা, তার প্রকৃতি হ'ল how to fulfil the beloved (কেমন-ক'রে প্রিয়ের পরিপূরণ করতে হবে)। এ-থেকে যে আলাপ-আলোচনা আসে, তা' শুনে মানুষের করার বুদ্ধি বেড়ে যায়। ইষ্টের জন্য করার বুদ্ধি যত বাড়ে, তার ভিতর-দিয়ে টান ফুটে ওঠে। আর, টান গজাল কিনা, তার লক্ষণ হ'ল—করার সম্বেগ কতখানি সৃষ্টি হ'ল।

ননীদা (দে)—আপনার ইচ্ছাগুলি আমরা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পারি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার না, তা' নয়। কর না, তাই পার না। যতটুকু কর, ততটুকু পার। পারা-না-পারার প্রশ্ন মনে না-তুলে করতে লেগে গেলেই হয়।

শিবরামদা (চক্রবর্ত্তী—করি না কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্য টান থাকে, তাই করতে দেয় না।

ক্ষিতীশদা (দাস)—মানুষের উপর সত্যিকার প্রভাব হয় কিসের ভিতর-দিয়ে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলন-চরিত্র যত ইষ্টকেন্দ্রিক ও সঙ্গতিশীল হয় ও বিহিত সরঞ্জাম, লওয়াজিমা ও প্রস্তুতিসহ বাস্তব সেবা যত গভীর ও ব্যাপক হয়, ততই মানুষের উপর প্রভাব হয়। দুটি জিনিস চাই—একটা হ'চ্ছে মানুষের প্রয়োজন-পূরণের ক্ষমতা, আর-একটা হ'চ্ছে তাকে ইষ্টপ্রাণ ক'রে তোলা—যাতে পরিবেশের সেবার ভিতর-দিয়ে সে ইষ্টার্থ-পূরণে উদ্দাম হ'য়ে ওঠে। মানুষকে শুধু বাঁচাবাড়ার যোগান দিলে হবে না, সে যাতে সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হ'য়ে ওঠে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে নানাভাবে সেবা দেবার জন্য তেমনতর individuo-environmental adjustment, organisation ও equipment (ব্যষ্টি ও পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ, সংগঠন ও প্রস্তুতি) সৃষ্টি করা দরকার। শুধু একক ইষ্ট-পথে চললে ও সেবা দিলে হবে না, পরিবেশকেও সেই পথের পথিক ক'রে তুলতে হবে। যে যত বৃহত্তর-পরিবেশকে এইভাবে গ'ড়ে তুলতে পারে, তার প্রভাবও হয় তত বিরাট। আর, সেবা দিতে গেলে fine perception (সূক্ষ্ম বোধ) চাই। কার ব্যথা কোথায়, বেদনা কোথায়, কষ্টের মূল কারণটা কী, চাহিদা কী, তা' যথাযথভাবে অনুভব করা চাই, এবং অনুভব ক'রে, যাকে যেমন প্রয়োজন, তাকে তেমনি সেবা দেওয়া চাই, যাতে সে জীবনে উন্নতি করতে পারে ও দশজনকে উন্নত ক'রে তুলতে পারে। এই দরদী সেবা-সহানুভূতি যার কাছ থেকে পায়, মানুষ সাধারণতঃ তাকে ভুলতে পারে না। আপনারা প্রত্যেকে ইষ্টনিষ্ঠায় অটুট হ'য়ে মানুষের কাছে তাদের মা, বাপ, ভাই, বন্ধুর মত হ'য়ে দাঁড়ান।

আপনারা প্রত্যেকের আপন হ'য়ে উঠুন, প্রত্যেকে আপনাদের আপন হোক। সবার বুকে বল বেড়ে যাক। প্রভাব হওয়া মানে আমি বুঝি এই। প্রভাবের অর্থ প্রকৃষ্ট-ভাবে হওয়া। নইলে মানুষকে বাগিয়ে স্বার্থসাধন ক'রে পরে তাদের দিকে ফিরে না-চাওয়া কিন্তু প্রভাব হওয়া নয়।

ব্রজেনদা (দাস) দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ হ'ল অজ্ঞতা, যার পেছন-পেছনই হাঁটে স্বার্থান্ধতা—ব্যক্তিত্বের পরিপোষণাকে খর্ব্ব ও ক্ষুন্ন করতে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই যত নিজের ও অপরের ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে অবহিত হবে ততই দেখতে পাবে, সবারই এক দাঁড়া—সাত্বত ব্যাপারে বিভেদ কিছু নাই, তার ব্যতিক্রমই বিভেদের কারণ। ঈশ্বর এক, ধর্ম্ম এক, প্রেরিতগণ একবার্ত্তাবাহী, আর তাঁদের প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। তাই, প্রত্যেক অবতারই সবার অবতার। ইসলাম-প্রসঙ্গের মধ্যে যে ভাবধারা আছে, তা' যদি হিন্দু-মুসলমান সবার মধ্যে চারিয়ে দাও, তাতে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহনশীলতাই বৃদ্ধি পাবে। ধর্ম্মের সমন্বয় হ'য়েই আছে, চাই যাজনের ভিতর-দিয়ে লোকের মাথায় তা' ধরিয়ে দেওয়া। এই কাজে যে-সব বাধা-বিঘ্ন আসতে পারে, তাও ভেবে দেখতে হয়। পরিস্থিতি বিবেচনা ক'রে সাবধান হ'য়ে না-চললে, বিপদ ঘটা অসম্ভব নয়। চতুর চলন চাই, যাতে বিপদকে এড়িয়ে চলা যায়। তা' সত্ত্বেও যদি বিপদ এসে পড়ে, তাতে ঘাবড়াতে নেই। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে কে কতখানি মাথা ঠিক রেখে চলতে পারে, তাই দেখে বোঝা যায়, তার normal character (স্বাভাবিক চরিত্র) কেমন।

গ্রামের একজন গরীব মানুষ এসে তার অভাব-অভিযোগের কথা নিবেদন করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর অজিত ভাইকে (গাঙ্গুলী) কিছু যোগাড় ক'রে দিতে বললেন।

একটি দাদা বললেন—সৎসঙ্গীদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যারা উপনয়ন নেন, তাঁরা আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে গিয়ে নিজেরা রান্না ক'রে খান, এই নিয়ে অনেক কথা ওঠে। লোকে এতে মনে করে—সৎসঙ্গীরা বড় বেশি গোঁড়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোঁড়ামি বাদ দিয়ে যত ক্ষতি হয়, গোঁড়ামিতে তত ক্ষতি হ'তে পারে না। নিষ্ঠা থাকলে কিছুটা গোঁড়ামি এসে পড়ে। কিন্তু সে-গোঁড়ামি আত্মরক্ষার জন্য, সদাচারের জন্য। তার মধ্যে ঘৃণা বা অবজ্ঞা ব'লে কিছু থাকে না। মানুষের যদি ভাল চাও, তাহ'লে যাতে ভাল হয় তা' নিজেরা করবে এবং অন্যকেও সেই আচারে আচারবান্ ক'রে তুলবে। তা' না-ক'রে সবশুদ্ধ যদি আচারভ্রষ্ট হ'য়ে চল, তাতে কারও ভাল হবে না। ব্রাত্য-দোষ খণ্ডন ক'রে যারা দ্বিজ-সংস্কারে সংস্কৃত হয়েছে,

তাদের শুদ্ধাচার অবলম্বন ক'রে চলাই তো শ্রেয়। তারা যদি ঐ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে না-চলে, তবে অন্যকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করবে কিভাবে? আদর্শ ও কৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দিয়ে যে মিল করার কায়দা, ওতে মিল হয় না। ওতে প্রবৃত্তি এমন ক'রে মাথা তোলা দেয়, যে তাই-ই মিলনের অন্তরায় হ'য়ে ওঠে।

যতীনদা (নাথ)—ঠাকুর! নামধ্যান করতে বসলে তো ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও পারিবেশিক নানা কথা মনে তোলপাড় করতে থাকে, তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো স্বাভাবিক, এর জন্য মন খারাপ করার কী আছে? আমরা যে-সব সমস্যা নিয়ে জড়িত, নামধ্যানের সময় সেগুলি তো মাথা চাড়া দেবেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক বা পারিবেশিক কোন সমস্যাই পরমপিতার এলাকার বাইরের জিনিস নয়। ঐ-সব চিন্তা আসলে চাপা দিতে বা তাড়াতে চেষ্টা না-ক'রে ঐগুলির ইষ্টানুগ সমাধান কিভাবে হ'তে পারে, তাই ভেবে দেখতে হবে এবং বাস্তব চলনায় সেই অনুযায়ী চলতে হবে। তবেই সেগুলি ইষ্টীপূত হ'য়ে উঠবে। এইভাবেই সবকিছু ধীরে-ধীরে ইষ্টে অন্বিত হ'য়ে উঠতে থাকবে।

যতীনদা—কথাটা ঠিক ধরতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন, নামধ্যানের সময় অর্থ-সমস্যা আপনার মনকে পীড়া দিচ্ছে। আপনি যদি তখন ভাবেন—কিভাবে মানুষকে সুষ্ঠুভাবে সেবা দিতে পারেন, কীভাবে বহুলোকের প্রয়োজন-পূরণ করতে পারেন, কিভাবে তাদের সুখ-সুবিধা ক'রে দিতে পারেন—তার ভিতর-দিয়ে কিন্তু আপনার অর্থ-সমস্যার ইষ্টানুগ সমাধান আপনার ভিতর গজিয়ে উঠতে পারে। এতে সমস্যাটা আপনাকে ইষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে পারল না, বরং আপনার ইষ্টীচলনকে আরো উদাত্ত ক'রে তুলল। সেইজন্য আমি বলেছি, অভাব যখন মারবে ছোঁ, যা' জোটে দিস পাবিই জো। পাওয়ার ধান্ধা যখন পেয়ে বসে, তখন যা' সম্ভব দিতে হয়। এই রকম ক'রে obsession (অভিভূতি)-গুলি কাটিয়ে-কাটিয়ে তবে সমাধানে দাঁড়াতে হয়। আর, অনুরাগের সঙ্গে নাম চালাতে থাকলে একটা vital nourishment (জীবনীয় পোষণ) পাওয়া যায়, তার বলে সমস্যা-সমাধানের পথ বোঝাও যায় ভাল ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরেনদাকে (ভদ্র) জিজ্ঞাসা করলেন—যা' কইছিলাম, করিছিস তো?

হরেনদা—না! এখনও করা হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেটা করণীয়, তখন যদি তা' না-করিস, তাহ'লে কিন্তু suffering (দুর্ভোগ)-এর ভিতর প'ড়ে যাবি, আর সে-suffering (দুর্ভোগ) তোর শুধু একার নয়, কার্য্য-কারণ-সম্পর্কে অনেকেরই। আর, তোরা যদি suffering

(দুর্ভোগ)-এর ভিতর পড়িস, আমিও তা' থেকে রেহাই পাই না।

হরেনদা লজ্জিত হ'য়ে বললেন—আমি অতখানি ভাবিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাবা লাগে। নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে কখনও ক্ষমা ক'রো না। তোমাদের যখন ঢিলে চলনে চলতে দেখি, তখন আমি বড় বিপন্ন বোধ করি।

বিষ্টুদা (বিশ্বাস)—আপনি তো প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী তার সঙ্গে চলার কথা বলেন, কিন্তু কার বৈশিষ্ট্য কী, তা' যদি ধরতে না-পারা যায়, তাহ'লে কোন্‌ভাবে চলতে হবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তুমি বুঝতে পার আর না-পার, এটা ঠিক জেন যে, প্রত্যেকে তার সত্তাকে ভালবাসেই। সে বেঁচে থাকতে চায়, সুখে থাকতে চায়, প্রশংসা চায়, ভালবাসা চায়, প্রিয়জন যারা তাদের ভাল চায়। এগুলি সবারই চাহিদা। তাই, প্রত্যেকের সত্তা-পোষণের প্রতি লক্ষ্য রেখে যত চলতে পারবে, ততই কৃতকার্য্য হবে। এইখানেই দরকার বৈশিষ্ট্যানুগ সেবার। আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য অল্প-বিস্তর তোমার কাছে ধরা পড়বেই। প্রধান জিনিস হ'ল—আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা। ওর থেকে চোখ ফুটে যায়। মানুষকে স্বস্তি ও তৃপ্তি দেওয়ার লক্ষ্য যদি থাকে, তাহ'লে চলনা ঠিক হ'য়েই আসে।

মনোরঞ্জনদা (আচার্য্য) বললেন—অনেক মানুষ আছে এমন অহঙ্কারী যে, তারা ধর্ম্ম ও কৃষ্টির কথা শুনতেই চায় না। সেখানে কেমন-ক'রে যাজন করতে হয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা শুনতে না-চায়, তাদের জোর ক'রে শোনাবার কী দরকার ? তারা যে-প্রসঙ্গ পছন্দ করে ও শুনতে চায়, সেই প্রসঙ্গ দিয়েই সুরু করলে হয়। যে-কোন প্রসঙ্গের মাধ্যমে যদি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে পরিবেষণ না-করতে পার, তাহ'লে যাজন তো হবে imposition (উপর থেকে চাপান)। তাতে কাজ হয় না। ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সম্বন্ধে বোধ তোমাদের যত সত্তাসঙ্গত হবে, ততই সব প্রসঙ্গের ভিতর দিয়ে তা' পরিস্ফুট ক'রে তুলতে পারবে। কোন্ বিষয়ের মধ্যে যে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি নেই, তা' তো বুঝতে পারি না। বেঁচে থাকা ও বেড়ে চলার আকুতি কিন্তু সবারই আছে। যে যেমন—সমীচীনভাবে তার তেমনি। আর, মানুষের সব প্রচেষ্টার মূলেই আছে ঐ চাহিদা। মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু ভুল তার সত্তার কাম্য নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর শৈলেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—তুই আজকাল লিখিস না ?

শৈলেনদা—মাঝে-মাঝে লিখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখা ভাল। লেখার ভিতর-দিয়েও যাজন হয়। Healthy ideas (সুষ্ঠু ভাবধারা) যত চারায়, ততই মঙ্গল।

মিহীলাল এসে প্রণাম করতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে, কী খবর ?

মিহীলাল—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার ধান কেমন হ'ল ?

মিহীলাল—তত ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে ভাল হয়, তেমনি-ক'রে দেখাশোনা করা লাগে। যারা ভাল ফসল ফলায়, তারা কিভাবে কী করে, দেখে-শুনে জেনে নিতে হয়।

বিরাজদা (ভট্টাচার্য্য)—কর্ম্মসন্ন্যাস বলতে কেউ-কেউ বোঝেন কর্ম্মত্যাগ, তা' কি ঠিক ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মত্যাগ ক'রে মানুষের জীবনই চলে না। সমস্ত কর্ম্ম যখন ইষ্টার্থে নিয়োজিত ও সংন্যস্ত হয়, তাকেই বলে কর্ম্মসন্ন্যাস। কর্ম্মসন্ন্যাস মানুষকে সক্রিয়ভাবে ইষ্টে যুক্ত ক'রে তোলে। অমনতর কর্ম্ম ইষ্টানুরাগেরই অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাই, তা' ত্যাগ করার কথা ওঠে না। আর, জীবনে কৃতকার্য্য হ'তে গেলেই চাই, ইষ্টস্বার্থী হ'য়ে কর্ম্ম করা। কারণ, আত্মস্বার্থী হ'য়ে কর্ম্ম করতে গেলেই মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, নিজেরই জালে নিজে জড়িয়ে যায়, তাতে শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় না।

বিনয়দা (বিশ্বাস)—অনেকে যথেষ্ট পরিশ্রম করে, কিন্তু খাটুনির তুলনায় লাভ করে সামান্য, আবার অনেকে কম পরিশ্রম ক'রেও বেশ লাভবান্ হয়—এর কারণ কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু করলেই হয না, বিধিমাফিক করা চাই, অর্থাৎ যেমন ক'রে করলে হয়, তেমনি ক'রেই করা চাই। যে যত adjusted (নিয়ন্ত্রিত), তার কাজও তত সুশৃঙ্খল ও নিখুঁত হয়। আর, কাজ যত নিখুঁত হয়, সুফলও ফলে তেমনি। করার পথে অনেক বাধা আসতে পারে, কিন্তু বাধাগুলিকে যে সুকৌশলে বিন্যস্ত করতে না-পারে, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া কঠিন হ'য়ে পড়ে। তুমি হয়তো একটা ব্যাপারে খুব খাটলে, কিন্তু এমন জায়গায় হয়তো temper lose করলে (রেগে গেলে) যে তোমার সমস্ত খাটুনিটাই পণ্ড হ'য়ে গেল। এইভাবে নানা complex (প্রবৃত্তি) intervene ক'রে (মাঝখানে এসে) কাজের ফল হ'তে আমাদের বঞ্চিত করে। আবার, সময়মত কাজ করা চাই। সময় ছাড়িয়ে শত পরিশ্রম করলেও সুবিধা হয় না। কাজের প্রস্তুতিও ঠিকমত চাই। রান্না করবে, কড়াইতে তেল চাপিয়ে যদি ফোড়ন আনতে

দোকানে দৌড়াও, তাহ'লে তেল পুড়ে যাবে। সময়, অর্থ ও পরিশ্রম সবটারই অপব্যয় হবে। তাই, কী করতে কী লাগে সম্যক্‌ভাবে ভেবে নিয়ে সাধ্যমত আগে থাকতে প্রস্তুত হ'তে হয়। অনুধ্যান না-থাকলে পদে-পদে হয়রান ও নাজেহাল হ'তে হয়। কারও motor nerve (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু) active (সক্রিয়), sensory nerve (বোধপ্রবাহী স্নায়ু) active (সক্রিয়) নয়, আবার কারও sensory nerve (বোধপ্রবাহী স্নায়ু) active (সক্রিয়), motor nerve (কর্ম্মপ্রবোধী স্নায়ু) active (সক্রিয়) নয়। এ দুটোই কিন্তু deficiency (খাঁকতি)-র লক্ষণ। চাই harmonious co-ordination (সমন্বয়ী সংগতি)। তাই, কাজ করার সংগে-সংগে নিরখ-পরখ করতে হয়—নিজের ভিতর ত্রুটি কোথায়। আর, যখনই যেটা ধরা পড়ে, তখনই সেটা সেরে ফেলতে হয়।...জীবনে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) থাকলেও সাফল্যের পথে বহু অবান্তর অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ওটাকেও ঝেঁটিয়ে তাড়াতে হয়। আর, করতে গিয়ে এমনভাবে কারও উপর নির্ভর করা ভাল নয়, যাতে কাজ পণ্ড হ'তে পারে। তুমি হয়তো অনেকখানি ক'রে আর একজনের উপর নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর ক'রে থাকলে যে সে তা' করবেই। কিন্তু খোঁজ ক'রে দেখলে না, সে করল কিনা। এই ফাঁক দিয়ে হয়তো তোমার করাটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল। তাই, শুধু নিজে ঠিক হ'লেই হয় না, পরিবেশকেও যথাসম্ভব ঠিক করতে হয়। আর, অন্যকে দোষ না-দিয়ে সবসময় দায়ী করতে হয় নিজেকে। জীবনের কুরুক্ষেত্র কেবলই আমাদের আহ্বান ক'রে বলছে —কর, কর, কর।

নিবারণদা (বাগচী)—সামনে উৎসব আসছে, বহু টাকা সংগ্রহ করতে হবে। এই সময় খেপুদা বা কেষ্টদা সদলবলে যদি বিভিন্ন জিলায় গিয়ে হাউড় দিয়ে আসেন, তাহ'লে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—তোর যেমন বুদ্ধি !

নিবারণদা—কেন, তাতে অসুবিধা কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কি কিছু বলা যায় ? আমার কলকাতায় যাওয়ার কথা হ'চ্ছে। আমার যদি যাওয়া হয়, কেষ্টদার আমার সংগে যাওয়া লাগবে। আর, আমি না-থাকলে খেপুর এখানে থাকা দরকার। তোরা কারও প্রত্যাশা না-ক'রে যা' করার নিজেরাই করবি। নিজেরা full responsibility (পূর্ণ দায়িত্ব) নিয়ে কাজ না-করলে efficiency (দক্ষতা) বাড়ে না।

রামশঙ্করদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোর লোকেদের জন্য টচে'র কথা বলে দিচ্ছি। কলকাতা থেকে শীগগিরই এসে যাবে। তুই কিন্তু লক্ষ্য রাখিস, যাতে না-

হারায়, নষ্ট না-হয়। কতবার কত জিনিস যোগাড় করি, কিন্তু কাজের সময় কিছুই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তুই যদি এবার ঠিক ক'রে রাখতে পারিস।

রামশঙ্করদা—আচ্ছা।

৯ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৫১ (ইং ২৬। ১০। ১৯৪৪)

রাত্রি আন্দাজ সাড়ে সাতটা। শুক্লা নবমীর চাঁদ তার শুভ্র হাসিটুকু ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। শ্রীশ্রীঠাকুর আশ্রম-সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে চৌকীতে ব'সে অনুপম ভঙ্গীতে দরদবিগলিত কণ্ঠে আলাপ-আলোচনা করছেন। সামনে ব'সে আছেন রামশঙ্করদা (সিং), আশু ভাই (ভট্টাচার্য্য), দেবী ভাই (চক্রবর্ত্তী), জিতেনদা (চ্যাটার্জী) প্রমুখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বলছেন—কোন সত্যিকার movement (আন্দোলন) করতে গেলে চাই দেবঋত্বিক্—they are the life of the nation (তারাই জাতির প্রাণ), কারণ, তাদের আদর্শপ্রাণ জীবন, ব্যবহার ও চর্য্যামুখর চারিত্রিক অভিব্যক্তির সংস্পর্শেই জাতির জীবনে আদর্শপ্রাণতা গজিয়ে ওঠে। আর, ঐ আদর্শপ্রাণতা বা ইষ্টপ্রাণতাই হ'ল সর্ব্বতোমুখী বাস্তব মঙ্গল ও অভ্যুদয়ের উৎস। আদর্শহীন দেশ-প্রেমের ধুয়ো complex-এর (বৃত্তির) কলরোল ছাড়া আর কিছু নয়। দেশের সেবা করা মানে, দেশের মানুষের সেবা করা। আর, মানুষের সেবা করতে গেলেই চাই, তার অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন করা, তার character (চরিত্র) adjust (নিয়ন্ত্রিত) করা। এইখানেই লাগে আদর্শ। শুধু বাইরে থেকে দিয়ে ও ক'রে মানুষকে শক্তিমান্ ও সমর্থ করা যায় না। আর, দেশ কথার সঙ্গেও জড়িত আছে আদেশকর্ত্তা, the leader (নেতা)। নেতা আবার ইষ্টপরায়ণ হওয়া চাই, সুনীত হওয়া চাই, তা' না-হ'লে সে কিন্তু লোককে mislead (বিপথে পরিচালিত) করবে। যে সরষেকে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সেই সরষেকেই যদি ভূতে পেয়ে বসে, তাহ'লে ভূত ছাড়ান কঠিন ব্যাপার হ'যে পড়ে। নেতা, যে মানুষকে বাঁচাবাড়ার পথে সুনিয়ন্ত্রিত করবে, সেই যদি অনিয়ন্ত্রিত হয়, তাহ'লে মানুষের সুনিয়ন্ত্রণ প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর রামশঙ্করদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বল তো চুরি করাটা দোষ কেন ?

রামশঙ্করদা—এতে নিজের ও পরিবেশের ক্ষতি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতে psychical (মনোগত), individual (ব্যক্তিগত) ও social (সামাজিক) তিনটে factor (দিক্) আছে। এতে মানসিকতা বিকৃত হ'য়ে যায়,

পাওয়ার প্রয়োজন হ'লে করার কথা মনে হয় না। মনে হয় ফাঁকি দেওয়ার কথা। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেও এইরকম বিপরীত বুদ্ধি পেয়ে বসে। একটা বিকৃত outlook (দৃষ্টিভঙ্গী) হয়। তদনুপাতিক philosophy (দর্শন) সৃষ্টি ক'রে তারা আবার অন্যকেও দলে টানতে চায়। নিজের লেজ কাটা গেছে ব'লে সবার লেজ না-কাটতে পারলে ভাল লাগে না। তাছাড়া, কিছু পেতে ও রক্ষা করতে গেলে বুদ্ধি-বৃত্তি ও কর্ম্মশক্তিকে যেভাবে পারিপার্শ্বিকের স্বার্থানুকূলে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং তার ফলে যে বোধ, জ্ঞান ও দক্ষতার উন্মেষ হয় এবং সপারিপার্শ্বিক আত্মোন্নতি অটুট ও স্থায়ী হয়, তা' এতে ব্যাহত হয়। তাই এটা অন্যায়। আর, এটা খুব কমই দেখা যায় যে কেউ চুরি ক'রে বা অন্যায়ভাবে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে বেশিদিনের জন্য বড়লোক হয়েছে। শিবাজী হয়তো বাধ্য হ'য়ে সুরাট sack (লুণ্ঠন) করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ওটা না-ক'রে যদি তিনি তাঁর ঈপ্সিতে উপনীত হ'তে পারতেন, তবে আরো ভাল হ'ত। এ ফাঁকটুকু না-থাকলে শিবাজীর প্রচেষ্টার ফল হয়তো আরো স্থায়ী হ'ত।

প্রমথদা দে) আসলেন। তিনি কথায়-কথায় বললেন—উৎসবের তারিখ ভাদ্রমাস থেকে পৌষমাসে পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাও তো অর্ঘ্যাদি যেমন আসার তা আসছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মনে উৎসবের রং যদি ধরায়ে দিতে পারেন, টাকার অভাব হবে না। মানুষগুলিকে চাঙ্গা ক'রে দেন। আর, যাতে অন্ততঃ হাজার দেড়েক কৃষ্টিপ্রহরী দেনেওয়ালা হয়, তার ব্যবস্থা করেন। আত্মরক্ষা, কৃষ্টিরক্ষা আজকের দিনে সব চাইতে কঠিন কথা। হরেনের (ভদ্র) জীবনটা যেভাবে গেল, আমি ভাবতেই পারি না। আমরা যদি পরিস্থিতি বুঝে যা' করণীয়, তা' না-করি, তাহ'লে ভবিষ্যতে আরো দুর্ভোগ আছে। আমাদের অনেকেই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে মগ্ন আছে। যতদিন তা' থাকবে, ততদিন সংকীর্ণতা, ভীরুতা ও কাপুরুষতা যাবে না, পরাক্রম ফুটে উঠবে না ও ব্যক্তিগত অস্তিত্বও নিরাপদ হবে না। ইষ্টস্বার্থ ও সমষ্টি-স্বার্থের উপরে দাঁড়িয়ে ব্যক্তিচরিত্রের মেরুদণ্ড শক্ত ক'রে না-তুললে ঝড়-ঝাপটা সামাল দেওয়াই কঠিন হবে। মনে রাখবেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।' তাই, সব-দিক্ দিয়ে বল সঞ্চয় করতে হবে। বল সঞ্চয় করার মূলে আছে নিজেকে ইষ্টের জন্য উজাড় ক'রে দেওয়া, তাতে ভিতরের শক্তি ক্রমাগত ফুটে বেরোয়, ঠেলে বেরোয়। ইষ্টার্থী হওয়ার ঐ মস্ত সুবিধা, ওতে মানুষকে টেনে লম্বা ক'রে তোলে, অফুরন্ত প্রসারণায় প্রসারিত ক'রে তোলে, গভীরতায় অগাধ ক'রে তোলে। স্বার্থান্ধ হ'লে সংকীর্ণ

গণ্ডীর মধ্যে ঘুরপাক খেতে-খেতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। শক্তি ছাড়া পায় না—আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। আবার, পরিবেশের সঙ্গে অযথা বিরোধের সৃষ্টি করে।

প্রমথদা—অকারণ যে-সব অত্যাচার ও প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হ'তে হয়, তাতে মন মন খারাপ হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সৎ-এর প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই অসৎ-এর শক্তি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেই। তাই, সৎ-এর শক্তি যদি বৃদ্ধি না পায়, তাহ'লে তার প্রতিষ্ঠা হবে না। বাইরের নানারকম অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র জানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের কতখানি শক্তিমান্, সুকৌশলী ও সংহত হওয়া প্রয়োজন। Opposition (বিরুদ্ধতা) overcome (অতিক্রম) করার ভিতর-দিয়েই শক্তি বাড়ে। তাই, ঘাবড়ে গেলে হবে না। Boldly (সাহসের সঙ্গে) সব situation face করতে (অবস্থার সম্মুখীন হ'তে) হবে। সবরকম প্রতিকূলতাকে জয় করার অভিজ্ঞতা যদি থাকে, তাহ'লে পরে আটকাবে না। বিপদ-আপদে অবসন্ন হ'য়ে পড়াটা ক্লীবতা। ওতে কোন পৌরুষ নেই, গৌরব নেই। বীরের মত দাঁড়াম। Be an optimist (আশাবাদী হন)।

সুবোধদা (সেন)—সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'চ্ছে লোকের বিশ্বাসঘাতকতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে-কথা ঠিকই বলেছ। সেজন্য খুব সাবধান হ'য়ে চলা লাগবে। কার প্রকৃতি কেমন, সেটা জানা চাই, বোঝা চাই। এমন cautiously (সতর্কভাবে) চলতে হবে, যাতে বিশ্বাসঘাতক তোমার ক্ষতি করতে না পারে, অথচ তাকে তুমি কাজে লাগাতে পার। Fatigued (ক্লান্ত) হ'য়ে অমনোযোগী হয়েছ কি তোমাকে ছোবল মারবে। যাদের সঙ্গে কারবার তাদের মাথার চুল থেকে আরম্ভ ক'রে পায়ের ডগাটা পর্য্যন্ত সব সময় তোমার নজরে থাকা দরকার। তাহ'লে যেখানে, যখন, যার জন্য যতটুকু করা দরকার, তা' করতে পারবে। আমাদের সাধারণতঃ নজর পড়ে, যখন একটা মানুষ বেহাতি হ'য়ে যায়। কিন্তু এই হওয়াটা একদিনে হয় না। এর symptom (লক্ষণ) দেখামাত্র তখন থেকে যদি treatment (চিকিৎসা) সুরু করা যায়, তাহ'লে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হ'তে পারে না। A stitch in time saves nine (সময়ের এক ফোঁড় নয় ফোঁড় বাঁচিয়ে দেয়)।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদাকে বললেন—রোগীচর্য্যালয়টা যাতে ভালভাবে খাড়া হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। ওর জন্য টাকা-পয়সা যা' লাগে, তা' নিজেরাই সংগ্রহ করবেন। ফিলানথ্রপির মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকবেন না। টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র, মানুষজন সংগ্রহ থেকে আরম্ভ ক'রে দৈনন্দিন যা-কিছু করণীয় সব করার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে যেখানে যেমন প্রয়োজন, করতে হয় ও করিয়ে নিতে হয়।

রামশঙ্করদা সৎসঙ্গ যুবসঙ্ঘ সম্পর্কে বড়দার ব্যাপক পরিকল্পনার বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। তোমরা যদি এইভাবে তৈরী হও, তাহ'লে কাজের সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রবিদাকে (ব্যানার্জী) জিজ্ঞাসা করলেন—কাজলকে কেমন দেখলি ?

রবিদা—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারের মস্ত গুণ, রোগীর মনে ভরসার সঞ্চার করা। রবির সে-গুণ আছে। রবিকে দেখলেই মানুষ আশ্বস্ত হ'য়ে ওঠে।

অবিনাশদাকে (ভট্টাচার্য্য) দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর রহস্য ক'রে বললেন—আপনি আমার গ্রহশান্তির জন্য এত যজ্ঞ করলেন, কিন্তু ভাল তো কিছু বুঝি না।

অবিনাশদা—এখন থেকে ভাল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—যাক, আশায় থাকা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে (মৈত্র) বললেন—নানারকমের কুটিরশিল্প কী-কী হ'তে পারে, যদি একটা জায় ক'রে ফেল, তাহ'লে ভাল।

সুধাংশুদা—এক-এক পরিবেশে এক-একরকম সুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গ্রাম্য পরিবেশে যেখানে ইলেক্‌ট্রিসিটির সুবিধা নেই, সেখানে বা কী-কী হ'তে পারে এবং শহরে যেখানে ইলেক্‌ট্রিসিটির সুবিধা আছে, সেখানে বা কী-কী হ'তে পারে, ভেবে দেখতে হয়।

সুধাংশুদা—আমার নিজের এ-সব বিষয় ভাল লাগে। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না-হ'লে তার জীবন অনেকখানি পঙ্গু হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেদনার্ত্ত কণ্ঠে শ্রীশদাকে বললেন—আপনাকে ও চুনীকে দেখলেই আমার সুকুমারের (রায়চৌধুরী) কথা মনে পড়ে। বড় ভাল ছেলে ছিল। আমার কপালে টিকল না।

শ্রীশদা—ওর প্রকৃতি খুব ভাল ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনাদের বংশের ছেলে যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ছিল। (এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন)।

প্রফুল্ল—সাড়াপ্রবণতা তো খুব ভাল জিনিস। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের ধাক্কায় যে-সব ব্যথা, বেদনা, আঘাত আসে, সাড়াপ্রবণতা থাকার দরুন সে-সব তো দুঃসহ হ'য়ে ওঠে, তার উপায় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীতিভরে মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন—কথা তো কইছ ঠিক, কিন্তু শুধু সাড়াপ্রবণতা থাকলে তো চলবে না। সাড়া যথাযথভাবে গ্রহণের ক্ষমতা থাকা

চাই, তবেই হয় অভিজ্ঞতা। তাই, যেমন নাম করতে হয়, তেমনই ধ্যান করতে হয়। মস্তিষ্কের সাড়াপ্রবণতা বাড়ে নামে আর গ্রহণক্ষমতা বাড়ে ধ্যানে। মস্তিষ্কের গ্রহণ-ক্ষমতা যার যত বেশি, বিষয় বা ব্যাপারকে সে তত uncoloured perspective-এ (অরঞ্জিল পরিপ্রেক্ষায়) দেখতে পায়, কেন কী ঘটে তা' সহজেই বুঝতে পাবে, আর এই জন্য সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে তাড়াতাড়ি। মনে কর—আমি তোমাদের সঙ্গে গভীর বিষয়ে আলাপ-আলোচনায় মগ্ন আছি। সেদিকে লক্ষ্য না-ক'রে একজন হয়তো এসে মাঝখানে বাধা দিয়ে জানাল, তার ঘরে খাবার নেই, বাড়িতে অসুখ ইত্যাদি। তখন হঠাৎ মাথার উপর পট ক'রে যেন একটা চোট লাগে, তার উপর বিরক্তি হবার উপক্রম হ'তে থাকে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাথায় আসে—thy necessity is greater than mine (তোমার প্রয়োজন আমায় প্রযোজনেব চাইতে বড়), আর বিবক্তিব ভাব তিরোহিত হ'য়ে যায়, তখন-তখনই brain (মস্তিষ্ক) adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়, নিজের কোন অসুবিধা হয় না। একটা জলাশয়ে একটা ঢিল ছুঁড়লে যে জলটা সেখান থেকে স'রে যায়, তা' পূরণ করার জন্য যেমন সমগ্র জলাশয় উঠে-প'ড়ে লেগে যায়, তখনই জল এসে শূন্য স্থান পূরণ করে; এও তেমনি। উপস্থিত ঘটনার সংঘাতে মস্তিষ্কে ক্ষণিক যে-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়, মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানমুখী গ্রহণমুখরতা তড়িৎ-বেগে তা' মিলিয়ে দেয়, এবং যেমনভাবে বিষয়টিকে ধারণ করবার, তা' করতে সাহায্য করে। মানুষ যত ধ্যানসিদ্ধ হয়, ততই তার normal tendency (স্বাভাবিক প্রবণতা) হয় প্রত্যেকটি জিনিসকে কার্য্যকারণ-সম্পর্কসহ সম্যক্‌ভাবে দেখা ও প্রয়োজনমত তার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাকরণ কবা। তাই, সে বিব্রত বা বিভ্রান্ত হয় কম। ব'সে ধ্যান করাটাই সব নয়। তা' তো করতেই হবে। তাছাড়া, কাজকর্ম্মের মধ্যেও ২৪ ঘণ্টা ধ্যানমুখী অনুশীলন বজায় রাখতে হবে। আর, ধ্যান মানে ধ্যেয়ের বিষয়ে যে-সমস্ত চিন্তা-স্রোত বইতে থাকে, সেগুলিকে মিলিয়ে গোছগাছ ক'বে সমাধান-সংশ্লিষ্ট ক'রে তোলা। তাই, ধ্যানের মধ্যে আছে, মনন-চিন্তনের ভিতর-দিয়ে একটা, শিষ্ট সমাধানে উপনীত হওয়া—বিষয়ের সব-কিছু দিক্‌ নিযে। যে-অবস্থাই আসুক সেই অবস্থাকেই শুভপ্রসূ ক'রে তুলতে হবে। যে নিজেকে পুরোপুরি অন্যের অবস্থায় ফেলে ভাবতে পারে—তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও অবস্থাকে নিজের ক'রে নিয়ে,—সাধারণতঃ অন্যের ব্যবহারে তার ঘৃণা, রাগ, দুঃখ বা বিরক্তি কমই হ'য়ে থাকে। দরদী চিকিৎসক রোগীর সম্পর্কে যেভাবে চলে, মানুষের সঙ্গে চলতে গিয়ে তার কতকটা সেই রকম ফুটে ওঠে।

রবিদা (ব্যানার্জ্জী)—স্নায়ুর দুর্ব্বলতা বা শক্তিসম্পন্নতা শারীরিক না মানসিক

ব্যাপার ? এটা কি বংশানুক্রমিক নয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা psycho-physical (মানস-শারীরিক)। Libido (সুরত)-ই এর মূলে। এটা সম্পূর্ণভাবে বংশানুক্রমিকতার উপর নির্ভর করলে তো মানুষের কোন আশা ছিল না, সবই predetermined (পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত) হ'য়ে যেত। টান বাড়াতে চাইলেই বাড়ান যায়, সেই সঙ্গে-সঙ্গে স্নায়ুও শক্তিমান্ হ'য়ে ওঠে। টানের আবার পোষণ চাই, তার মধ্যে আছে ভাবা, বলা ও করা। তুমি হয়তো ইষ্টকে লক্ষ্য ক'রে ভাবের আবেগ নিয়ে বলছ—'ঠাকুর! তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না, তুমিই আমার সব। তোমাকে বাদ দিয়ে একটা মুহূর্ত্তও আমার অচল। তোমার তৃপ্তিই আমার তৃপ্তি, তোমার সুখই আমার সুখ, তোমার জীবনই আমার জীবন, তোমার ইচ্ছাপূরণই আমার জীবন-ব্রত।' এইভাবে বলতে-বলতে হয়তো চোখে জল এসে যাবে, গায় কাঁটা দেবে। এই রকম ভাবা-বলার সঙ্গে-সঙ্গে কাজের বেলায়ও করবে তদনুপাতিক, দেখবে কী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—কী জানি একটা কথা আছে তো!

প্যারীদা—Love is incompatible with ignorance, selfishness and disease (অজ্ঞতা, রোগবালাই ও স্বার্থপরতার সঙ্গে ভালবাসার কোন সামঞ্জস্য নেই)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এলেক্সিস ক্যারেলের এ-কথা একেবারে বাস্তব কথা। এমনতরই হয়। প্রিয়কে পূরণ করবার আকুতিই অজ্ঞতা, স্বার্থপরতা ও অসুস্থতা দূর ক'রে দেয়। হাড়ভাঙ্গা টানে শরীরের curative force (আরোগ্যকারী শক্তি) পর্য্যন্ত বেড়ে যায়। তার মানে অবশ্য এ নয় যে 'কোমা ব্যাসিলি' খেলে তার কলেরা হবে না। কলেরা হ'তে পারে, কিন্তু curative force (আরোগ্যকারী শক্তি) থাকার দরুন সে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, আর সাধারণতঃ ইষ্টের দরদে সে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে এতখানি হুঁশিয়ার হ'য়ে চলবে যাতে রুগ্ণ হ'তে না হয়। প্রিয়ের কিসে ভাল হয়, কিসে মন্দ হয়, কোন্‌টা তার অনুকূল, কোন্‌টা তার প্রতিকূল, কোন্‌টা ধরা লাগবে, কোন্‌টা ছাড়া লাগবে,—এ-সম্বন্ধে তার জ্ঞানের অভাব থাকে না। একটা দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে সে সারা দুনিয়াটাকে বিচার ক'রে দেখে। তাই, তার জ্ঞান বা বোধ ধার-করা জ্ঞান বা বোধ হয় না। তার মধ্যে বাস্তবতা থাকে। আর ভালবাসার জনকে বাদ দিয়ে তার তো আলাদা কোন স্বার্থই থাকে না, স্বার্থবোধ যা' থাকে, তা' তাঁকে জড়িয়ে। বৌ-ছেলেপেলে-সম্বন্ধে আমাদের কিরকম হয়, সেইটে ভেবে দেখলে হয়। টাকাকড়ি, বিষয়-আশায় যা' চাই, তাদের জন্যই চাই।

কয়েকজন মা ব'সে ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আলুর সিংড়ি করা যায় না ?

গৌরীমা বললেন—আলুর সিংড়ির কথা তো শুনিনি কোনদিন।

এই প্রসঙ্গে কিছু সময় ঘরোয়া কথাবার্ত্তা চলল। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর পাশ ফিরে ব'সে উপস্থিত দাদাদের দিকে চেয়ে গভীর স্নেহে অন্তরঙ্গ সুরে বললেন—এই যে তোমরা আমার কাছে কথাগুলি শুনছ, তোমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে-মিলিয়ে নিচ্ছ, একেই বলে উপাসনা। উপাসনা মানে, কাছে বসা। অনেক সময় তোমরা আমার কাছে আস না, আমাকে যা' বলার তা' বল না, আমাকে avoid (পরিহার) ক'রে চল, নিজেদের মত একটা philosophy (দর্শন) ক'রে নাও—'ঠাকুরকে disturb (বিরক্ত) ক'রে কী হবে ?' এতে বুঝতে হবে, তোমরা যত কাজই তখন কর-না-কেন, আমাকে sacrifice ক'রে (বিসর্জ্জন দিয়ে) কোন প্রবৃত্তির হিল্লেয় ঘুরছ, তাই আমার কাছে আসতে সঙ্কোচ বোধ করছ। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে একটু soothe (তৃপ্ত) করার প্রলোভনও কি মানুষের হয় না ? তাকে আনন্দ দেবার জন্যও তো তার কাছে যাওয়া দরকার হয়। তাকেই তো বলে পূজা—পূজা মানে বর্দ্ধনা। যেদিন তোমার ইষ্টকে তুমি সাধ্য ও সম্ভবমত সুখ ও স্ফূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করলে না, সেদিন তোমার পূজা বাদ পড়ল।...অনেকে আছে, হঠাৎ কোন অন্যায় ক'রে ফেলে খুব অনুতপ্ত হয়, ছুটে এসে তা' স্বীকার ক'রে ফেলে, স্বীকার না-ক'রেই পারে না। এমন ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, তাদের সে-দোষ শীঘ্রই চ'লে যাবে। টানের মত টান থাকলে গলদ জমতে পারে না, অবসাদ বাসা বাঁধতে পারে না। অবসন্নতা তখনই পেয়ে বসে, যখন conviction (প্রত্যয়)-এর urge-এর (আকুতির) চাইতে complex (প্রবৃত্তি) বড় হ'য়ে ওঠে। ইষ্টপ্রাণ যে, তার স্ফূর্তি কমে না, সে খায়দায়, কাজকাম করে, আর, নির্ভাবনায় বুক পুরু ক'রে দুনিয়ার বুকে চলে। যার ইষ্ট বা ইষ্টপ্রাণতা নাই, তার হোঁচট খেতে-খেতেই জান অন্ত।

অমর ভাই (ঘোষ)—ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কারও সম্মুখে তার আচরণের সমালোচনা করতে হয়, এবং তাতে যদি সে বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন কী করণীয় ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুণগ্রহণমুখর আলাপ-আলোচনা হ'ল মনের খোরাক। একটা মানুষকে তুমি যদি বাধাও দাও, এবং সে যদি বোঝে যে তুমি তার স্বার্থে স্বার্থান্বিত এবং তার প্রতি সশ্রদ্ধ গুণগ্রহণমুখর, তবে সে-বাধায় বিরোধ আসবে না। বিরোধ আসলে সাধারণতঃ বুঝতে হবে error of egoistic application (অহঙ্কার-প্রসূত প্রয়োগের ভুল)। তুমি খুব তীব্রভাবেও বাধা দিতে পার, বকতে পার, কিন্তু তার

সত্যিকার স্বার্থ ও মঙ্গলের দিক্ লক্ষ্য রেখে যদি কথা বল, দেখবে, সে হয়তো কেঁদে ফেলে তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে। অভ্যাস করতে-করতে হয়।

হরেনদা (বসু)—মানুষের দোষ-দর্শন অন্যায়, কিন্তু পারিপার্শ্বিকের যে-দোষের দরুন আমাদের বাঁচাবাড়া আহত ও ব্যাহত হয়, তা' কি উপেক্ষা করা ভাল? না, তা' উপেক্ষা করা সম্ভব? যদি উপেক্ষা ক'রে আমার উপকারও হয়, তবে তার দোষ তো র'য়েই গেল, এবং তাতে সমাজের যে ক্ষতি তা' তো হয়ই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দোষদর্শী হওয়া ও দোষের প্রতিকার করা এক কথা নয়। যখন তুমি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে জ্ঞানচর্চা হিসাবে science of sexology (যৌন-বিজ্ঞান) পড়, তখন তোমার মনের যে-অবস্থা, আর প্রবৃত্তিবশে sexual topics (যৌন-বিষয়ক) আলোচনা যখন কর, তখনকার মনের অবস্থা কি এক? বিষয় হয়তো একই। কিন্তু নিজের ও পরিবেশের মনের উপর দুটোর প্রভাবের পার্থক্য কতখানি? তাই, পারিপার্শ্বিকের দোষের স্বরূপ ও কারণ এবং তার নিরাকরণ-সম্বন্ধে যখন তুমি বৈজ্ঞানিকভাবে সন্ধানে প্রবৃত্ত হও, তখন তুমি দোষদর্শীর মত carried (প্রভাবিত) ও coloured (রঙ্গিল) হও না। বাস্তবতা তখন তোমার উপলব্ধির মধ্যে আসে, যে যা' করে, তা' কেন করে বুঝতে পার, তাই তোমার অনুযোগ থাকে না, অভিযোগ থাকে না, মন উৎক্ষিপ্ত হয় না। তখনই তুমি তাকে শোধরাতে পার। আমার মত sufferer (ভুক্তভোগী) বোধহয় দুনিয়ায় কম আছে। কত অবিচার আমার উপর হয়েছে, হ'চ্ছে, কিন্তু সবটার কারণ জানা আছে ব'লে মনে ক্ষোভ নেই।

প্রশ্ন—সমাজের কল্যাণের দিকে চেয়ে বিশ্বাসঘাতককে নাকি হত্যা করার বিধান দেওয়া আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমনতর কথা আমার ভাল লাগে না। বিশ্বাসঘাতকের কাছে তার জীবনটা কম প্রিয় নয়। তাই, চেষ্টা করতে হয়, তাকে বাঁচিয়ে রেখে ভাল করা যায় কিনা। যদি তেমন একজন ফেরে, সে হয়তো শত-শত লোককে ফেরাতে পারে। আর, তাকে ভালবাসব ব'লে যে তার দোষটা ভালবাসব, তা' তো নয়!

কিরণদা (মুখার্জ্জি)—ঠাকুর! আপনার কাছে যখন কথাগুলি শুনি, তখন তো কিছুই কঠিন মনে হয় না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কঠিন লাগে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হবেই। এখন তো শুধু নিচ্ছ, মাথায় ভরছ, কিন্তু সেগুলি কাজে ফলাতে গেলে ভিতর বাইরের যে-সব অন্তরায় আছে, তা' কাবেজে এনে অনভ্যস্ত যা' তা' অভ্যাসে পরিণত ক'রে অগ্রসর হ'তে হবে, এই তো সাধনা। Uphill task-এ (শক্ত কাজে) ক্রমাগত energy (শক্তি) ব্যয় করতে হয়, আর তার জন্য চাই energy

(শক্তি) সঞ্চয়। এই সামগ্রিক চেষ্টার ভিতর-দিয়ে তাপের সঞ্চার হয়। আর, তাকেই বলে তপস্যা।

২৪শে কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৫১ (ইং ১০।১১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর বাঁধের পাশে নিরালায় ছিলেন। এমন সময় অনুসন্ধিৎসু সভার কাজ সেরে সুধাংশুদা (মৈত্র), অনিলদা (সরকার), অমূল্যদা (ঘোষ) প্রমুখ কয়েকজন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অনুসন্ধিৎসু সভার আলাপ-আলোচনার বিবরণ শুনলেন। ধীরে-ধীরে দাদারা ও মায়েরা আসতে লাগলেন।

একজন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বললেন—বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর-দিয়ে একটা জিনিস আমার কাছে সমস্যার মত লাগে। আপনি বলেন, মানুষ সম্পদ্, আমি তো দেখি, মানুষ বিপদ্। যে পারিপার্শ্বিকের জন্য তার সাধ্যমত কিছু-কিছু করে, তার প্রতি এত মানুষ আশা পোষণ ক'রে ব'সে থাকে যে সে তাদের সবাইকে পূরণ করতে তো পারেই না, শেষটা বরং দুর্নামের ভাগী হয়। আর, যারা তার সেবায় পুষ্ট হয়, তাদের মধ্যেও খুব কম লোক তার সম্পদ্ হয়। তাদের কর্ত্তব্যবোধের চাইতে প্রত্যাশা দিন-দিন বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় করণীয় কী ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যাকে service (সেবা) দিচ্ছ, উপযুক্ততা-অনুসারে তাকে দিয়ে যদি অন্যের service (সেবা) না-দেওয়াও, তবে তো এ-সমস্যা হাজির হবেই। ঐ জায়গায় আমাদের খাঁকতি থেকে যায়। তোমার সেবা এতখানি ও এতদূর পর্য্যন্ত চালাতে হবে, যাতে সেও সেবাপ্রাণ হ'য়ে ওঠে। সেদিকে লক্ষ্য না-রাখলে তোমার সেবা কল্যাণ প্রসব করল না, অফুরন্ত সেবার সংক্রামক স্রোত জগতে ব'য়ে আনল না, একান্ত-ভাবে নিষ্ফল হ'ল। সেবা-উৎসারিণী গভীর সেবাকে বলে ধর্ম্মদান, তাই ধর্ম্মদান শ্রেষ্ঠদান। যে যেমনই হোক না-কেন, তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক হল—He will take advantage of your goodness and you will cxploit his badness for your purpose and principle (সে তোমার ভালত্বের সুযোগ নেবে এবং তার ভিতর খারাপ যা-কিছু, তা' তুমি তোমার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিপূরণে লাগাবে)। আর, এটা না-করতে পারলে তারও ভাল হবে না। পিছনে লেগে থেকে ঐভাবে অভ্যস্ত ক'রে তুলতে হবে। এক-একটা মানুষের পিছনে অনেক খাটতে হয়। চালালে চলার মত mobile (চলনক্ষম) লোক বহু আছে, কিন্তু নিজের তাগিদে চলে ও চালায়, এমনতর motile (চলৎশীল) লোক কিছু না-হ'লে মুশকিল। আগে আমি প্রয়োজনমত নিজে ছুটোছুটি করতে পারতাম, তখন সুবিধা ছিল। এখন আমি

স্থবির হ'য়ে পড়েছি, কিন্তু তোমরা যদি motile (চলৎশীল) হ'য়ে ওঠ, কোন ভাবনা থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমাদের কাজটা একপেশে হ'য়ে গেছে, সাধারণের মধ্যে দীক্ষা যেমন হয়েছে, বিশিষ্টদের মধ্যে তদনুপাতিক হয়নি। এখন বিশিষ্টদের মধ্যে initiates (দীক্ষিতের সংখ্যা) না-বাড়লে balance (সমতা) থাকবে না। তাছাড়া সব রকম resource (সম্পদ্) অফুরন্তভাবে বৃদ্ধি করা দরকার। তা' না-হ'লে বৃহত্তর পরিবেশের সেবা, শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য যা'-যা' করণীয় তা' করা যাবে না। আর, এই পরিবেশের কোথাও ইতি নেই। যত এগোন যাবে, ততই দেখা যাবে, আরো অনেক বাকী আছে। কিন্তু পরিবেশের মধ্যে যতগুলি যা' বাঁচাবাড়ার অন্তরায়ী হ'য়ে থাকবে, তাতে কিন্তু আমরা নিজেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হব ততখানি।

এরপর কৃষ্টিপ্রহরী-সম্বন্ধে কথা উঠল।

সুবোধদা (সেন)—আপনার বিভিন্ন চাহিদায় বহু লোক সাড়া দেওয়া সত্ত্বেও পরিকল্পনাগুলি যথাযথভাবে মূর্ত্ত হয় না কেন? এটা কি আমাদের কর্ম্মব্যবস্থার ত্রুটি নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কাজগুলি তোমরা কর। তোমরা খাটও হয়তো খুব। সব দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও আমার ইচ্ছা পরিপূরণ করতে চেষ্টা কর। কিন্তু তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত খেয়াল আছে, opinion (মত) আছে, interest (অনুরাগ) আছে। সেগুলি তোমাদের কাছে এতই প্রিয় যে সেগুলিকে অটুট ও অক্ষত রেখে দাও, আমারটার সঙ্গে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতেও হয়তো চেষ্টা কর না। তাই পরিপূর্ণ অখণ্ড মন দিয়ে কাজ হয় না। অনিচ্ছা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব নিয়ে কাজ কর ব'লে কাজের ভিতর ভ্রম, প্রমাদ, শৈথিল্য আসে। আমারও তোমাদের সঙ্গে বুঝে-বুঝে হিসাব ক'রে চলতে হয়। তাছাড়া উপায় থাকে না। জোরে টানলে হয়তো ছিঁড়ে যাবে। আবার, তোমাদের ঐ personal factor (ব্যক্তিগত দিক্)-ও দুরতিক্রম্য। তোমাকে কাজ করতে গেলে—তোমার দেহ, মন, বুদ্ধি, অভ্যাস ও সংস্কার নিয়েই করতে হবে, তার মালিন্য তুমি সহজে এড়াতে পারবে না। অবশ্য কঠোর ইষ্টপ্রাণতায় অসম্ভব কিছুই নয়। তবে এটা ঠিক, যাকেই এ-কাজ দাও, perfectly in tune (সম্পূর্ণ একতান) না-হ'লে ভুল করবেই, কিন্তু আগ্রহসহকারে করার তালে থাকলে ভুল-ত্রুটির ভিতর-দিয়েও grow করবে (বেড়ে উঠবে)। আবার, আমার পরিকল্পনাগুলি মূর্ত্ত করতে গেলে—শুধু একক চেষ্টা করলেই হবে না। অনেক ব্যাপার আছে যা' বহুলোকের active co-operation (সক্রিয় সহযোগিতা)-ছাড়া হবার নয়। সেইজন্য যারা আগ্রহশীল,

তারা নিজেরা তো সাধ্যমত করবেই, সঙ্গে-সঙ্গে অন্যকেও অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করবে। সপরিবেশ এই সমবেত সাধনাটাই কঠিন ব্যাপার। তোমরা পরিবেশকে নিয়ে ইষ্টার্থী চলনে যত tremendous (প্রচণ্ড) হ'য়ে উঠতে পারবে with continuity and consistency (ক্রমাগতি ও সঙ্গতি-সহকারে), আমার কাজগুলিও তত সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পারবে। এই অবস্থা সৃষ্টি করার দায়িত্ব কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের।

কিশোরীদা (চৌধুরী)—কর্ত্তাব্যক্তি যারা, মুখ্যতঃ এ-দায়িত্ব তো তাদেরই!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে করে সেই কর্ত্তা। আর, করার পথ সবার কাছেই খোলা। যার ইচ্ছা আছে, সে-ই সাধ্যমত করতে পারে ও করাতে পারে। আর, করনেওয়ালার প্রধান লক্ষণ হ'ল—অন্যের বিরূপ সমালোচনা না ক'রে, সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে প্রত্যেকের deficiency (খাঁকতি) make up (পরিপূরণ) করতে চেষ্টা করা। মানুষের ত্রুটিটা কখনও বড় ক'রে দেখতে নেই, ত্রুটি প্রত্যেকেরই আছে। ত্রুটি সংশোধন ক'রে নিতে হবে। আপনার ত্রুটি হ'লে যখন আমি বোধ করব যে আমারই ত্রুটি হ'য়ে গেল, তখন আপনার ত্রুটি সংশোধন করবার ক্ষমতা হবে আমার। তখন অনুযোগ করার প্রবৃত্তি হবে না, অভিযোগ করার প্রবৃত্তি হবে না, আপনাকে খাটো করার প্রবৃত্তি হবে না, আঘাত দেবার প্রবৃত্তি হবে না। নিজের গায়ের ঘা পরিষ্কার করতে যেমনতর ব্যথার বোধ নিয়ে করি—ঠিক তেমনতর দরদ নিয়ে আপনার যা'-কিছু খুঁত ও ক্ষত সারিয়ে তোলার প্রবৃত্তি হবে। ভগবান্ প্রত্যেকটি মানুষকেই কর্ত্তা ক'রে পাঠিয়েছেন দুনিয়ায়। কারণ, না-করলে কেউ কেউ বাঁচে না। এই সত্তাপালী 'করা'র range (ব্যাপ্তি) ও depth (গভীরতা) যার যত বেশি, তার কর্ত্তৃত্বও হয় তত বড়। এ হ'ল প্রকৃতির বিধান। তাই, আমি কাউকে ফেলনা মনে করি না—ভরসা রাখি প্রত্যেকের উপর। যে যেমনই হোক, সত্তাপালী নেশা যদি একবার কাউকে পেয়ে বসে, সে শ্মশানের বুকেও স্বর্গ গ'ড়ে তুলতে পারে। তার বুদ্ধি হয়—অন্যকে পড়তে না-দেওয়া, ঝরতে না-দেওয়া, মরতে না-দেওয়া। আর, তার জন্য যেখানে যা' করা লাগে, তার জন্য সে একপায়ে খাড়া। দেখেন, আমি যা' বলছি, ক'রে দেখেন! দেশ ও দুনিয়ার চেহারা যদি বদলে না যায় তবে কি বলিছি!

শ্রীশ্রীঠাকুরের আবেগদীপ্ত কথাগুলি সবার মর্ম্মমূলে বিদ্ধ হ'য়ে গেল।

৯ই অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৫১ (ইং ২৫।১১।১৯৪৪)

আজ কিছুদিন হ'ল শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে রাধারমণদার বাড়ির সামনে বাঁধান

চাতালটার ওখানে এসে বসেন। অনেক মুসলমান-সর্দ্দার, আশ্রমের মায়েরা ও দাদারা সেখানে উপস্থিত থাকেন। নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হয়। আজও তেমনি এসেছেন। কয়েকজনের সঙ্গে নিভৃতে কথা বলছেন। কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যখন মানুষ মানুষের নিন্দাবাদ ক'রে বেড়ায় তখন বুঝবে—he has become a prey to complexes (সে প্রবৃত্তির শিকার হয়েছে)। লোকের ভালমন্দ সবটা observe (পর্যবেক্ষণ) ক'রে তাকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) ও fulfil (পরিপূরণ) করবার জন্য যা' করণীয় তা' যে করতে চায়, তাকে থাকতে হবে above complexes (প্রবৃত্তির উর্দ্ধে)। নিভৃত-আলোচনা শেষ হবার পর বীরুদা (রায়), প্রমথ ভাই (বাগচী), টালার মা, সুষমা-মা প্রমুখ অনেকে আসলেন।

অনিলদা (সরকার) বললেন—সৎসঙ্গ যুবসঙ্ঘের পাঠচক্রের তরফ থেকে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করা হবে। কয়েকদিন আগে সুধাংশুদা (মৈত্র) বেতার-রহস্য-সম্বন্ধে বলেছিলেন। বলাটা খুব interesting (চিত্তাকর্ষক) হয়েছিল। অনেকেয় ইচ্ছা যে আরো এই রকম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের অনুশীলন যত বাড়ে ততই ভাল। বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং যা'-কিছুর সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ কী, তা' practical (বাস্তব) রকমে ধরিয়ে দিতে হয়। হাতে-কলমে করার বুদ্ধি যত বাড়ে, ততই ভাল। ছেলেদের মধ্যে research-spirit (গবেষণী বুদ্ধি) যাতে গজায়, তেমনতর ইঙ্গিত দিয়ে-দিয়ে যেতে হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যে কোথাও থেমে নেই, আরোর possibility (সম্ভাবনা) যে সর্ব্বদাই আছে এবং আমরাই যে পারি তা' উদ্ঘাটন করতে—সে-বিষয়ে একটা প্রত্যয় ও স্পৃহা সৃষ্টি ক'রে দিতে হয়। একজনের মনে যেই তুমি আত্ম-প্রত্যয় এনে দিলে, সেই তুমি একটা নূতন সৃষ্টির পথ খুলে দিলে। বাকই ব্রাহ্মণের অস্ত্র। আবার বলে শব্দ-ব্রহ্ম। আচরণ-সমন্বিত কথার বিহিত প্রয়োগে যদি কেউ সিদ্ধ হ'য়ে ওঠে, সে মানুষের অশেষ উপকার করতে পারে। এইভাবে লাগাও, দেখ, কোথার জল কোথায় গড়ায়।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। আকাশের তারায় দিকে চেয়ে কোন্টা কোন্ তারা সেই বিষয়ে গল্প করতে লাগলেন। তার থেকে জ্যোতিষের কথা উঠল।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পৃথিবীর ছোটবড় প্রত্যেকটি জিনিসই আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। এর মধ্যে কতকগুলির ফল ভাল, কতকগুলির ফল খারাপ। এইরকম হ'তে বাধ্য। এগুলির উপর আমাদের কোন হাত নেই। কিন্তু খারাপটা minimise করার (কমানর) একমাত্র পথ হ'ল—ইষ্টকে নিয়ে thoroughly

(পুরোপুরি) engaged (ব্যাপৃত) হওয়া। ইষ্টকে নিয়ে যদি ডুবে থাকা যায়, তখন অনিষ্ট আক্রমণ করার সুযোগ পায় না। এইসব কাজকর্ম্ম নিয়ে তোমরা যদি ceaselessly active (নিরন্তর সক্রিয়) থাক, অমঙ্গলের হাত থেকে অনেকখানি রেহাই পেয়ে যেতে পার।

কী খবর ইয়াদালি! (ইয়াদালিকে আসতে দেখে সস্নেহে শুধালেন শ্রীশ্রীঠাকুর।)

ইয়াদালি—ভালই!

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্যে)—ভালই ক'য়ে কা'টে দিলি কি গল্প জমে? আঁ'ট হ'য়ে বয়, ব'সে গল্প ক'রে শোনা—কোনে কার কী খবর।

ইয়াদালি হেসে ফেলল। তারপর ব'সে স্থানীয় নানা খবর বলতে লাগল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জামা ও চাদরগুলি সবার পছন্দ হইছে তো?

ইয়াদালি—পছন্দ আবার হবি না! অমন দামী-দামী বাহারের জিনিস আপনি না-দিলি আমরা কি কোনদিন পরিছিলাম!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা খুশি হ'লেই হ'ল। দামী জিনিসের দাম তো ওখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারের উপর ডান পা'টি তুলে বসলেন। তারপর প্যারীদাকে কাতরভাবে বললেন—শরীরটায় যেন যুত পাই না। ক্ষিদে লাগে না, পেটটা ভার-ভার থাকে। গায় বল পাই না। শরীরটা বোঝার মত লাগে। টেনে নিয়ে বেড়াতে কষ্ট হয়।

প্যারীদা—ওষুধ তো দিচ্ছি। কেন যে কাজ হয় না, বুঝতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওষুধ ঠিকমত দেওয়া লাগে।

১০ই অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৫১ (ইং ২৬।১১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ব'সে আছেন। শীতের সকাল। তাই চাদর গায় দিয়ে একটু জড়-সড় হ'য়ে আছেন। কাছে আছেন বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), উমাদা (বাগচী), শরৎদা (সেন), হরিপদদা (সাহা), ব্রজেনদা (চ্যাটার্জ্জী) প্রমুখ। কথা উঠল—বাইরে কাজকর্ম্ম তেমন অগ্রসর হ'চ্ছে না। বহুস্থানে একটা আশা-উদ্যম-হীনতা ও অবসন্নতার ভাব। তাছাড়া একদল কর্ম্মী নানাকারণে কতকটা অসন্তুষ্ট। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী করণীয় তা' আমি বহু আগে থেকেই ব'লে আসছি। কতবার বলেছি—

"ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।"

—এমনতর মনোবৃত্তিসম্পন্ন কর্ম্মী যোগাড় কর। তা' তোমরা করনি। তা' করা থাকলে আজ এ-অবস্থার সৃষ্টি হ'ত না। জায়গা বুঝে-বুঝে কর্ম্মী রেখে, সঙ্গে-সঙ্গে এখান থেকে correspondence (পত্রালাপ) জোরসে চালালে সব-কিছু ঠিকমত চলত। আমি তো depression (অবসাদ)-এর কোন field (ক্ষেত্র) দেখি না। Depression (অবসাদ) আসবে কোথা থেকে? কাজের মধ্যে কেবল আছে elatement and more elatement (আনন্দ আরো আনন্দ)। Worker (কর্ম্মী)-রা হ'ল elating agents (আনন্দের বাহক)। তাদের মধ্যে depression (অবসাদ) থাকলে সেই depression (অবসাদ)-ই চারিয়ে যায় সবার মধ্যে। অবসাদের মূলে অনেক সময় থাকে প্রত্যাশার অপূরণ। ভিতরে যদি পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে, আর সেই প্রত্যাশার পূরণ যদি না-হয়, তাহ'লে আসে ক্ষোভ, দুঃখ, অবসাদ ইত্যাদি।

উমাদা—প্রত্যাশা থাক বা না-থাক, মানুষের প্রয়োজন তো আছে। আর প্রয়োজনের পূরণ না-হ'লে তো বাঁচাই কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন যদি গোড়া থেকেই প্রস্তুত থাকে যে তাকে দাঁড়াতে হবে লোক-সম্পদের উপর, এখান থেকে কিছুই পাবে না, তাহ'লে তার প্রয়োজন পূরণ না-হ'লেও সে ক্ষুব্ধ হবে না। সে বুঝবে যে, নিজের খাঁকতির জন্যই কষ্ট পাচ্ছে এবং নিজেকে যোগ্যতর ক'রে তুলবার চেষ্টা করবে। তাছাড়া, ইষ্ট যার কাছে primary (প্রথম), সে ইষ্টকে নিয়ে এমনই actively (সক্রিয়ভাবে) মেতে থাকে যে দুঃখ-কষ্ট তার গায় বেঁধে কম। কেষ্টদা এক সময় কম কষ্ট করেনি, কিন্তু সে কি সেদিকে খেয়াল করেছে? কি আমার কাছে কিছু বলেছে? কিংবা তার কি কোন দুঃখের বোধ ছিল? তার যা' করণীয়, ক'রেই চলেছে। বিধিমাফিক করার তালে থাকলে ঐ করাই মানুষের প্রয়োজন মেটায়। Worker (কর্ম্মী)-রা যদি liability (ভার) হয়, organisation (সঙ্ঘ) grow করতে (বাড়তে) পারে না। আর প্রয়োজন পূরণের কথা যে বলছ, তার কোন দাঁড়া নেই। আজ যে ৮০ টাকা না-পেয়ে ক্ষুব্ধ, তাকে ৮০ টাকা দিলে কিছুদিনের জন্য হয়তো elated (উদ্দীপ্ত) থাকবে, তারপরই হয়তো ভাববে—তাকে ১২৫ টাকা দেওয়া হয় না কেন? তাতে আবার depressed (অবসন্ন) হবে। চাহিদা এবং depression (অবসাদ) এইভাবে চলবে। সর্ব্বত্রই এমনতর ঘ'টে থাকে। যাহোক, যদি কেউ কারও কাছ থেকে কিছু নেয়ও, তার সব সময় নজর রাখা দরকার, যাতে তার দেওয়াটা নেওয়ার ঢের উপরে থাকে।

প্রফুল্ল—এখানকার কর্ম্মীরা সাধারণতঃ গৃহী। তাঁদের দায়দায়িত্ব অনেক, তাই অসুবিধা হয়। না-নিয়ে পেরে ওঠেন না। গৃহী না-হ'লে এমন হ'ত না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে না-ক'রে, গার্হস্থ্য আশ্রম বাদ দিয়ে যে movement (আন্দোলন), সে-movement (আন্দোলন) গৃহী-সমন্বিত সমাজের কতটুকু উপকারে আসে তা' বুঝতে পারি না। ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মকে মুখ্য ক'রে কেমন-ক'রে আদর্শ গৃহস্থের জীবন-যাপন করতে হয়, সেই দৃষ্টান্তই দেখান প্রয়োজন। সংসারের ঝামেলা বাদ দিয়ে যে সন্ন্যাসী হ'য়ে যায়, তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে গেলে গৃহী সব-দিক্ সামঞ্জস্য ক'রে চলতে পারবে না। সমাজ-সংস্থিতির মূল জিনিস হ'ল—সুবিবাহ ও সুজনন। গৃহী না-হ'লে এই দিক্‌টাই বাদ প'ড়ে যায়। তাতে অনেক ক্ষতি হয়। আবার, ধর্ম্ম, ইষ্ট, কৃষ্টি যে-সব গৃহস্থের কাছে গৌণ, তারা এতখানি unbalanced (সামঞ্জস্যহারা) হ'য়ে থাকে যে তাদের দাম্পত্যজীবন উদ্বর্দ্ধন ও সুপ্রজননে সম্যক্ সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে না। তাই সন্ন্যাস-সমন্বিত গার্হস্থ্যধর্ম্ম চাই। সৎ বা ইষ্টে যার মন সম্যক্‌ভাবে ন্যস্ত, সেই কিন্তু হ'ল আসল সন্ন্যাসী। প্রকৃত সন্ন্যাস ও প্রকৃত গার্হস্থ্যের সমন্বয় হ'য়েই আছে। আমার ইচ্ছা করে, এখানকার কর্ম্মীরা সেই সাধু-সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত হ'য়ে উঠুক। তাদের দেখে সন্ন্যাসীরাও উপকৃত হোক, গৃহীরাও উপকৃত হোক। অবশ্য, আদৌ বিয়ে করবে না, এমন ২।৪ জন যে থাকবে না, তেমনও কোন কথা নয়।

অক্ষয়দা (পুততুণ্ড)—রোগে, অনাহারে পরিবারবর্গ যদি চোখের সামনে ম'রেও যায়, এবং তার প্রতিকার করতে গিয়ে যদি ইষ্টকর্ম্মে ব্যাঘাত হয়, সেখানে সেটা উপেক্ষা করা কি ঠিক নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তাইতো করা লাগে। অতখানি মনের অবস্থা ও সপরিবার উপযুক্ত অনুচলন হ'লে সহজে মরেও না। আগে তো আশ্রমে অসুখ-বিসুখই তেমন ছিল না। মানুষের ধারণা ছিল—এখানে মানুষ মরে না। তাই, কানাই মারা গেলে কত চিঠি আসতে লাগল।

হরিপদদা (সাহা)—কর্ম্মীরা বাইরে নানা জায়গায় নানা অবস্থায় ঘোরে, এ অবস্থায় কি তাদের রোগাক্রমণের সম্ভাবনা বেশি থাকে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগেও কত জনকে ঘুরতে হ'ত, তারা সুস্থ থাকত কী ক'রে? তুমি যদি কাজ সম্বন্ধে really (বাস্তবে) interested (আগ্রহান্বিত) হও, শরীর সুস্থ রাখবার জন্য যতটুকু care and caution (যত্ন ও সাবধানতা) নেবার, তা' কি তুমি নাও না? সদাচার পালন ক'রে চললে ঘোরা-ফেরায় কোন ক্ষতি করতে পারে না।

বিজয়দা (রায়)—আপনি যা' চান তা' পারা যায় কিভাবে ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন চলছ, সে চলনে তা' সম্ভব না। বানর যেমন এক ডাল থেকে লাফ দিয়ে আর এক ডালে গিয়ে ওঠে, তাদের চার হাত-পা সমান তালে চলে, হাত দিয়ে না-পারলে, পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে, মানুষ কি তা' পারে ? সে বড়জোর দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে পারে, পা দুটো তার শক্ত হ'য়ে গেছে, তা' দিয়ে আর পারে না। তেমনি ইষ্টে যার সমস্ত complex (প্রবৃত্তি)-গুলি interested (অন্তরাসী) হ'য়ে ওঠেনি, তার brain (মস্তিষ্ক), muscles (পেশীগুলি), nerves (স্নায়ুগুলি), limbs (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) ও ইন্দ্রিয়গ্রাম যুগপৎ active (সক্রিয়) ও alert (সতর্ক) হ'য়ে ইষ্টসার্থকতায় সমান তালে চলতে পারে না। হাত চলে তো পা চলে না, পা চলে তো হাত চলে না, এই অবস্থা হয়। কোথাও হয়তো সামান্য কারণে depression-এ (অবসাদে) মুষড়ে পড়ে, আবার কোথাও হয়তো সামান্য আশা পেয়ে অযথা elated (উদ্দীপ্ত) হ'য়ে সে-স্থলে যা' করণীয় তা' করে না, পরে failure (অকৃতকার্য্যতা) ডেকে আনে। কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করলেই যথাযথ আন্তরিক প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সদভ্যাস ও সদ্‌গুণ অর্জ্জন ক'রে এমন সড়গড় ক'রে ফেলতে পার, যাতে success (কৃতকার্য্যতা) অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে।

সুরেনদা (ধর) এসেছেন দিনাজপুর থেকে। খুব পাতলা চিঁড়ে নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাতলা চিঁড়ে ভাল। কিন্তু চিঁড়ে যদি বেশি পাতলা হয় ও জল দিলে গ'লে যায়, তাহ'লে সে চিঁড়ে খেয়ে দাঁতওয়ালা মানুষের দাঁতের সুখ হয় না। খেয়েও মনে হয় খাওয়া হ'ল না।

কথা শুনে সবাই হাসছেন।

সুরেনদা—আমি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রাইভেট (গোপনীয়) নাকি ?

সুরেনদা—হ্যাঁ। প্রাইভেট হ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ফাঁকমত বিকালের দিকে কনু যেন। তাতে অসুবিধা হবে না তো ? আর তেমন দরকার হ'লি এখনই সা'রে নেবার পারেন।

সুরেনদা—বিকালে বললেই হবে।

তুই খাইছিস কিছু সকালে ?—একটি দাদা এসেছেন কলকাতা থেকে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

দাদা বললেন—জলখাবার খেয়েছি দোকানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাড়ীতে রাত্রে বোধহয় তোর ঘুম হয়নি, তাই চোখমুখ শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে। যা, সকাল-সকাল চানটান ক'রে কিছু মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে নেগা।

দাদাটি বললেন—কাল রাত্রে গাড়ীতে অত্যন্ত ভিড় ছিল। শোবার জায়গা তো দূরের কথা, ভাল ক'রে বসতেও পারিনি। তাই এখন ঘুম পাচ্ছে।

এরপর দাদাটি প্রণাম ক'রে উঠে পড়লেন।

১৩ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৫১ (ইং ২৯।১১।১৯৪৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ব'সে আছেন। পূজনীয় খেপুদা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ভারতদা (পাট্টাদার), হেমদা (শাস্ত্রী), জিতেনদা (মিত্র), নগেনদা (সেন), কিরণদা (মুখার্জ্জী), ফণীদা (মুখার্জ্জী), বঙ্কিমদা (দাস), অশ্বিনীদা (দাস) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত আছেন।

কেষ্টদা বললেন—উৎসব এসে গেল। ঋত্বিক্‌দের মধ্যে আশ্রমে যাঁরা ব'সে আছেন তাঁরা যদি এই সময় বাইরে যান, তাহ'লে অর্ঘ্যাদি সংগ্রহের সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা যেতে পারে, তাদের পাঠালেই পারেন। আর, যারা যেতে পারবে না, তারা এখানে ব'সে correspondence (পত্রালাপ) করুক। Without work (কাজ ছাড়া) ব'সে থাকলে মানুষ নষ্ট হ'য়ে যায়। আস্তে-আস্তে রোগ, ব্যাধি, অভাব-অশান্তি ঘিরে ধরে।

এরপর পাবনা থেকে একজন হাকিম শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। তাঁকে সমাদর ক'রে বসান হ'ল। তিনি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমাজ, ন্যায়, নীতি, অর্থোপার্জ্জন ইত্যাদি-সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে তাই করা, যার ভিতর-দিয়ে পরিবেশ-সহ নিজের সত্তা-সম্বর্দ্ধনা অটুট ও মুখর হ'য়ে চলে। আর, এ করতে গেলেই আচার্য্য-নিষ্ঠ হ'তে হবে, সেবাপরায়ণ হ'তে হবে, কর্ম্মঠ হ'তে হবে, যোগ্য হ'তে হবে। আমরা যার দ্বারা পরিপালিত হই, তাকে যদি maintain (পরিপালন) না করি, তবে আমাদের capacity (ক্ষমতা) ক'মে যায়, আমরা উৎসবিমুখ হ'য়ে পড়ি। এতে পুষ্টিদাতা শুকিয়ে ওঠে, ফলে আমরাও শুকিয়ে উঠি। তাই, এটা justice (ন্যায়)-এর পরিপন্থী। justice (ন্যায়)-এর বিরোধী যা', তা' নিরসন করাই আপনাদের কাজ। তাই আপনারা মানুষের অন্তরে ধর্ম্মবোধ যত সঞ্চারিত করতে পারবেন, ততই ন্যায়ের দণ্ড অক্ষুণ্ণ থাকবে। ধর্ম্মবোধ মানে, বাঁচিয়ে বাঁচার বুদ্ধি—দিয়ে পাওয়ার বুদ্ধি। মেরে

বাঁচার বুদ্ধি থেকেই—না-দিয়ে পাওয়ার বুদ্ধি থেকেই মানুষ চুরি, ডাকাতি, ধাপ্পাবাজী, জাল-জুয়াচুরি ইত্যাদির উপর দাঁড়াতে চায়। কিন্তু ধরুন, গভর্ণমেন্ট আপনাকে maintain (প্রতিপালন) করছে, আপনি যদি গভর্ণমেন্টের interest (স্বার্থ) maintain (প্রতিপালন) না-করেন, গভর্ণমেন্ট কতদিন আপনাকে maintain (প্রতিপালন) করতে পারে? আপনি যে-গরুটার কাছ থেকে দুধ চান, তাকে যদি ঘাস না দেন, সে দুধ দেয় কী ক'রে? তাই, উৎসের প্রতি করণীয় না-করাটাই অন্যাষ্য ও অন্যায়। আর, উৎস বলতে কিন্তু অনেকখানি। মা, বাবা, পরিপালক, আচার্য্য, ঈশ্বর, পরিবেশ, পরিস্থিতি সব-কিছু মিলিয়েই আমাদের স্থিতি, গতি ও প্রাপ্তির উৎস। পর্য্যায়ী সঙ্গতি নিয়ে যেখানে যা' করণীয়, তা' করাটাই ধর্ম্ম। তাই, ধর্ম্মের অঙ্গ-হিসাবে নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধান আছে। আর, টাকাপয়সা জিনিসটা কর্ম্মফল ছাড়া আর কিছু নয়। আপনি কাজ ক'রে টাকা পান, তার মানে, আপনার উপচয়ী কর্ম্ম বা পরিশ্রমের মূল্য-স্বরূপ আপনাকে কিছু দেওয়া হয়, যা'-দিয়ে উক্ত মূল্যের যে-কোন কর্ম্ম আপনার প্রয়োজনমাফিক আপনি পেতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন—আপনার কথাগুলি খুব যুক্তিপূর্ণ। এই যদি ধর্ম্ম হয়, সে-সম্বন্ধে কারও কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

সমাপ্ত